শত সুন্দরী ও এক পাইলট

বীরু চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক
সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৬৭

প্রকাশক : নিতাই দাস, চলতি প্রকাশনী
৬৭/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

মুদ্রাকর : প্রশান্ত কুমার মণ্ডল, ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

রজনীকান্ত মুখোর্টি

ও

জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী

দাছু-দিদিমার পূণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই ঃ

রণাঙ্গণের নায়িকা

দানব পাখির আজব কাহিনী (ছোটদের)

শত সুন্দরী ও এক পাইলট

অবশেষে সেই অভাবনীয় ঘটনাটা ঘটলো। সেই অনিবার্য দুর্ঘটনাটা, সত্যি বলতে কি, এটা তার অবচেতন মনে যে না উকি দিয়েছিল এমন নয়। একে তো কাজলকালো রাত তার উপর নিঃসীম প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েক হাজার ফুট উপর দিয়ে সে উড়ে চলেছিল বিপদের ঝুঁকিকে একেবারে অগ্রাহ্য করেই। বিধি বাম, ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে সর্বদিক থেকে ধেয়ে এল নিদারুণ সেই ক্ষ্যাপা সামুদ্রিক ঝড়। ছোট্ট প্লেন-এর পক্ষে সেই নিদারুণ নৈসর্গিক দানবের মুকাবেলা করা কোনমতেই সম্ভবপর ছিল না। অতএব সেই অনিবার্য সর্বনাশটি চকিতে ঘনিয়ে এল অতিদক্ষ পাইলট প্যাটার্সনের জীবনে। এবং এর পরেই শুরু হল তার অভিনব জীবনের এক চমকপ্রদ লালসা ঘন খেলা···

কালঘাম ও নোনাজলে বিপর্যস্ত দেহ, পোশাক ছিন্নবিচ্ছিন্ন, মরণক্লান্ত শরীর ও দারুণ শক্-এ বোবা-মন নিয়ে মাইক প্যাটার্সন এসে তীরভূমির বালি স্পর্শ করলো। তারপর, অবশ দেহ নিয়ে চিৎ হয়ে সেখানে পড়ে রইলো। সে এক তন্দ্রাঘন অর্ধচেতন অবস্থা। মরণ-ক্লান্তি।

ঐ চোখবোজা অবস্থায়ই একসময় সে তার মাথার উপরে ঝুঁকে পড়া বেশ কিছু নারীকণ্ঠের কলকাকলী শুনতে পেল। তার চোখ মেলে তাকাবার শক্তিও ছিল না তখন। সেইভাবেই সে পড়ে রইল। শুধু এইটুকু ধারণা হয়েছে যে সে প্লেন-ক্র্যাশ অন্তে এখনো প্রাণে বেঁচে রয়েছে।

একটা দ্বীপে, (নির্জন দ্বীপ হওয়াই উচিত ছিল) এসে সে উঠেছে, কোন দ্বীপ, কোথাকার দ্বীপ কিছু সে জানে না। উঃ এত বিদ্যুৎ গতিতে ঝড় এসে পড়লো···। হায়, তার সবেধন নীলমণি প্লেন ও তার হতভাগ্য দুজন যাত্রী বর্তমানে নিঃসীম সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। হায়ার পারচেজ-এ কেনা প্লেনের দেনা এখনো বাকি চল্লিশ হাজার টাকা। সহসা আতঙ্কিত হল সে। কোন নরখাদক অধ্যুষিত দ্বীপে এসে ওঠে নি তো সে !

এমন সময় তার অর্ধচেতন কানের খুব সন্নিকটে একটা চাবুক আস্ফালনের

শপাং শব্দ হল। চমকিত হয়েই এবার সে চোখ মেলে তাকালো। চারটি পলিনেশিয়ান মেয়ের রোষকষায়িত মুখ ভেসে উঠলো দৃষ্টির সামনে।

চার-চারটি অনিন্দ্যসুন্দর দেহ সুষমার অধিকারী যুবতী নারী ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। দেখে মনে হয় বছর কুড়ির মধ্যে বয়েস এই কুমারী মেয়েগুলে. পীনোন্নত পয়োধরা তরুণীদের দেহ আবৃত রয়েছে উজ্জ্বল রঙের লালাভা. (স্বল্পপরিসর লুঙ্গির মত পাতলা বস্ত্রখণ্ড)। তিনটি মেয়ের হাতে কালান্তক বর্শা। এদের মধ্যে বয়স্কা তরুণীর হাতে বিরাট চাবুক। সে তার চাবুক শূন্যে আস্ফালন করে চীৎকার করে বলে ওঠে:

উঠে বস! দাঁড়িয়ে পড়ো!

মাইক প্রবল প্রচেষ্টায় কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করলো, কাতর কণ্ঠে বললে, বিশ্বাস করো আমি পারছি না। আমার পা উঃ, চেয়ে ছাখো কি ভয়ানক ফুলে উঠেছে পাটা। দাঁড়াবার শক্তি আমার নেই।

বয়স্কা মেয়েটি তার তিন সঙ্গিনীর হাত থেকে বর্শা নামাবার ইা ত করে বললে, মানাইয়া উঠে দাঁড়াতে অক্ষম। একে বহন করে নিয়ে চল তো..।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে ওকে টেনে হিঁচড়ে প্রথমে এক পায়ে দাঁড় করালো। অতঃপর ওরা নিজেদের হাত ভাঁজ করে একটা চেয়ারের আকৃতি করে মাইকের মত ভ দেহকেও অনায়াসে তুলে বহন করে নিয়ে চললো। চাবুক হাতে তরুণী চললো আগে আগে পথ-প্রদর্শকের মত।

"মানাইয়া!" মাইক অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো ওকে ওরা এই ... সম্বোধন করলো শুনে। এ শব্দটির সাধারণ অর্থ হল, 'শ্বেতাঙ্গ মানুষ!' f· আরেকটি অসাধারণ মানেও আছে এর। সেটি হল "শ্বেতাঙ্গ-দেবতা। শুনেছে, অনেক দ্বীপে সাদা চামড়ার মানুষদের 'দেবতা' ভেবে পূজা ক দ্বীপবাসীরা। এও শুনেছে যে একবছর অন্তে এই দেবতাকে তারা বলি দে. ভূমির উর্বরতা আনবার মানসে। এসব স্মৃতিতে আতঙ্কিত হলেও তার করবার কিছু ছিল না। একটি পা ওর বোধ করি গেছে ভেঙেচুরে একাকার হয়ে সে এখন চলতে অক্ষম। অতএব দুর্ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া তার উপায়ই বা কি। শুধু ধৈর্য ধরে থাকা, অপেক্ষা করা। দেখা যাক কি নিয়তি লিখেছে তার বিধাতা।

আগের দিন অর্থাৎ ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে সে নিউজিল্যাণ্ডস্থ অকল্যাণ্ড বিমানঘাঁটি থেকে তার ছোট্ট প্লেন নিয়ে যাত্রা করে। সঙ্গে ছিল পাইনঅ্যাপল কোম্পানীর দুজন চীনা এক্সিকিউটিভ যাত্রী। তাদের

এক জরুরী কনফারেন্সে পরদিনই হনলুলুতে অতি অবশ্যই যোগ দিতে হবে। তারা কেবলগ্রাম যখন পেল তখন আর কমার্শিয়াল প্লেন-এর যাবার সময় ছিল না। তারা তখন বাধ্য হয়ে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে এই প্রাইভেট প্লেনটি ভাড়া করে রওনা দেয়। তাবা তখন জানতো না যে এই যাত্রাই তাদের শেষ যাত্রা।

বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর সামরিক বিভাগ থেকে ছাড়া পেয়ে তেত্রিশ বছর বয়স্ক মার্কীন যুবক মাইক প্যাটার্সন আর দেশে ফিরে গেল না। অতি দক্ষ পাইলট সে। প্রথমে কিছুকাল অস্ট্রেলিযায় থেকে কমার্শিয়াল এয়ারলাইনে কাজ নিল। দুবছর বাদে নিউজিল্যাণ্ডে এসে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে হায়ার পার্চেজ সিসটেমে এক ছোট্ট প্লেন কিনে নিজেই ব্যবসা শুরু করে দিল।

প্রচুর কাজ পেতে লাগলো সে। এত কাজ যে অনেক খদ্দেরকে বিমুখ পর্যন্ত করতে হল। হু হু করে অর্থ আসতে লাগলো তার। প্যাসিফিক অঞ্চলে অজস্র এয়ার লাইনের ছডাছডি। কিন্তু বহুলোক সেইসব প্যাসেঞ্জার বা মালবাহী প্লেনের সময়ানুযায়ী অপেক্ষা করতে রাজী না হয়ে মাইক ও তার দু-ইঞ্জিন যুক্ত প্লেনকে ভাড়া করেই তাদের জরুরী কাজ সমাধা করত।

সেদিন এক ঘণ্টার নোটিশ-এ সে পাইনঅ্যাপল কোং-এর দুজন অফিসারকে নিয়ে পাড়ি জমালো হাওয়াই-এর দিকে। অকল্যাণ্ড থেকে হনলুলু প্রায় ৪০০০ মাইল আকাশপথ। এতটা পথ ওর ছোট্ট প্লেনের পক্ষে নন্‌স্টপ চলা সম্ভব না। সুতরাং সে ঠিক করলো অকল্যাণ্ড থেকে একটানে ১১৫০ মাইল উড়ে ফিজি নামক স্থানে যাবে। সেখান থেকে পেট্রল নিয়ে নন-স্টপ বাকী পথটা পাড়ি জমাবে।

আবহাওয়া সংবাদ আদৌ ভাল ছিল না। তবু মাইক বেলা ৫-৩০ মিনিটে প্লেন নিয়ে রওনা দিল। মাঝ রাতে সে গিয়ে পৌঁছলো সুভা বিমান বন্দরে। সেখানকার গ্রাউণ্ড ক্রু দিল আর এক দুঃসংবাদ।

—চারদিক থেকে সামুদ্রিক ঝড় এগিয়ে আসছে মাইক। বজ্রবিদ্যুৎসহ পুবদিক থেকে তুফান এগোচ্ছে। এখন আবার ফিলিপাইনের ওখান থেকে আরেকটি সাইক্লোন আসছে। আজ রাত্তিরটা এখানেই কাটিয়ে যাও মাইক। কাল সকালে বা দুপুরে না হয় হনলুলু রওনা হয়ো।

মাইক গেল প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে আলোচনা করতে। তারা প্রস্তাব শুনে তো রেগেই আগুন। ওসব ছেঁদো কথায় তাদের ভোলানো চলবে না। কাল বিকেলের মধ্যেই তাদের হনলুলুতে পৌঁছে দিতে হবে, টাকা খেয়েছ ইয়ারকি

নাকি! নয়তো তারা মাইকের বিরুদ্ধে খেসারৎ-এর মামলা ঠুকে দেবে নির্ঘাৎ।

কথা শুনে অতিকষ্টে ক্রোধ দমন করলো মাইক। লোকগুলো জানে না যে খারাপ আবহাওয়ায় সুইসাইড করার জন্যে কোন আইন কোন প্লেন বা পাইলটকে বাধ্য করতে পারে না যেতে। মুখে কিছু বললো না। অবশ্য তার মনোগত বাসনাও তাড়াতাড়ি লোকগুলোকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়ে ভাড়ার টাকাটা পকেটস্থ করা। তাছাড়া দক্ষ পাইলট হিসেবে তার সুনামও আছে। কোন বিপদ আপদের তোয়াক্কা সে বড় একটা করে না। বেপরোয়া মানুষ মাইক প্যাটার্সন।

আধঘণ্টার মত সে ওয়েদার চার্ট স্টাডি করলো, এবং ম্যানিলা, ক্যান্টন, গুয়াম প্রভৃতি স্থানের থেকে বেতারে আসা 'আবহাওয়া সংবাদ' শুনে গেল। সেই রিপোর্টে একই কথা শোনা গেল পুবদিক থেকে তুফান আসছে, পশ্চিমদিক থেকে আসছে আরও জঘন্য ধরনের ঘূর্ণিঝড়। হনলুলুর পথে একটা দিকের আকাশই শুধু এখনও পরিষ্কার রয়েছে। তাও কতক্ষণ থাকবে তার কোন গ্যারান্টি নেই।

মনস্থির করে ফেললো দুঃসাহসিক পাইলট মাইক। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অন্ধকার আকাশ ভেদ করে আকাশচারী হয়ে গেল। মাত্রাতিরিক্ত পেট্রল বোঝাই করায় প্লেন যারপরনাই ভারী হয়ে উঠেছে। ঝামেলা হলে ১৫০০ মাইলের মধ্যে ল্যাণ্ড করবার কোন স্থান নেই। অন্ধকার নিঃসীম প্যাসিফিক মহাসমুদ্র নীচে কলকলধ্বনিতে উত্তাল।

সুভা ছাড়বার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঝড়ের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেল। পশ্চিমমুখী তুফানে বাতাস ক্রমশঃ ভীষণতম হয়ে উঠছে। প্লেনটা কয়েকবার প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকি খেল। অফিসাররা চমকে জেগে উঠে জিগ্যেস করতে মাইক বললে, মাভৈ সামান্য এয়ারপকেট। আপনারা ঘুমুন।

পঞ্চাশ মাইল যাবার পর পশ্চিম দিক থেকে এল পালটা তুফানের ঝাপটা। দুদিকের প্রবল ঝড়ে মাইকের প্লেন যেন স্যাণ্ডউইচ-এর চাপে পড়ে গেল। সাংঘাতিক বিপদ। যাত্রীদ্বয় ফের জেগে গেল। বিমানটি যেন প্রবল বাতাসে কাগজের টুকরোর মত উথালি-পাথালি খেতে লাগলো। দুঃসাহসী পাইলট মাইকের মনেও দারুণ খটকা লাগলো।

—আপনারা লাইফ প্রিজারভার শরীরে বেঁধে নিন, আতঙ্কে মাইক বলে উঠল।

—তাহলে···তাহলে কি প্লেন ভেঙ্গে পড়ছে? যাত্রীদের ভীত জিজ্ঞাসা।

—বলতে পারছি না কিছু। প্রস্তুত হয়ে বসে থাকুন শুধু।

পুরনো প্লেন মাঝে মাঝে মড়মড় করে উঠতে লাগলো। কঠোর হাতে অসাধারণ কৌশলে মাইক তাকে কোনক্রমে সোজা করে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকলো।

এর ঘণ্টা চারেক বাদে এল সেই চরম ক্ষণ। প্লেন থেকে একটা ইঞ্জিন ওভারলোড-এ বন্ধ হয়ে গেল। অপরটিও উদ্ভট শব্দ করে তার অন্তিম অবস্থার ইঙ্গিত দিল। তারা এখন পুরোপুরি চতুর্দিক থেকে আসা ঝড়ের মাঝখানে বেসামাল। উপরে চারদিকে তুফান, নীচে কাজলকালো উত্তাল সমুদ্র। বিদ্যুৎ চমকানোর আলোতে মাইকের নজরে এল কয়েক মাইল দূরত্বের এক ক্ষুদ্র দ্বীপের ভূমিখণ্ড। মাইক বেলি ল্যাণ্ডিং-এর আশায় প্লেনের মুখ সেদিকে ফেরালো। প্লেনকে রাখা যাবে না, প্লেন অতল সমুদ্রে ডুবে যাবে। তবে সে ও যাত্রীদ্বয় হয়ত প্রাণে বেঁচে তীরভূমিতে সাঁতরে গিয়ে উঠতে সমর্থ হলেও হতে পারে।

কিন্তু হায়, তীরভূমির আধ মাইল আগেই গোত্তা মেরে প্লেন সমুদ্রজলে ঝাঁপ দিল। মাইকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। সে চীৎকার করে যাত্রীদের বলে উঠলো, শীগগির লাফ দিন। বলে তন্মুহূর্তে সে তার আসন ছেড়ে লাফিয়ে জলে পড়ে গেল।

জলতল থেকে কয়েক সেকেণ্ড বাদে ভেসে উঠে মাইক সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে ক্ষুদ্র বিমানটির কোন চিহ্ন নেই, আর চিহ্ন নেই দুজন যাত্রীরও। বোধ করি ভয়ে দিশেহারা হতভম্ব চীনা অফিসারদ্বয় শেষ পর্যন্ত আর বের হতে পারেনি। প্লেনসহ তাদের সলিল সমাধি হয়ে গেছে নিমেষে। হায়, কি দুর্দৈব।

উথাল-পাথাল কালো সমুদ্রের অন্ধকার জলে ঢেউয়ের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে করতে সে তীরভূমির দিকে সাঁতরাতে লাগলো। প্রবল স্রোত একবার তীরের কাছে নিয়ে যায়, পুনরায় টেনে নিয়ে আসে সমুদ্রগভীরে। এইরকম যাওয়া-আসার মুখে সমুদ্রতলের কোন শিলাখণ্ডের সঙ্গে প্রবল আঘাত লাগলো তার বাঁ পায়ে। উঃ! পা যেন ভেঙ্গে গেল, উড়ে গেল, খসে গেল।

তবু জীবনপণ করে সে সাঁতরাতে লাগলো প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে। এক সময় এসে বেলাভূমি স্পর্শ করলো। সেখানেই সে মরণক্লান্তিতে শুয়ে পড়লো। পরক্ষণে মনে হল প্রবল ঢেউ এসে হয়ত তাকে ফের সমুদ্রগর্ভে নিয়ে যেতে পারে। তখন অমানুষিক শক্তি প্রয়োগ করে বুকে হেঁটে নিম্নাঙ্গ হেঁচড়াতে

হেঁচড়াতে সে বালুকাভূমির অনেকটা ভেতরে দেহটাকে নিয়ে গেল। বাঁ পা যেন কেউ আগুনে পোড়াচ্ছে, এমনি অসহনীয় অনুভূতি। ভোরের আলো ফুটলো এক সময়, বিশাল সূর্য উঠে রাঙিয়ে দিল চতুর্দিক। আধা অচৈতন্য অবস্থায় মাইক তেমনি শুয়ে ছিল চোখ বুজে।···

তারপর সেই চাবুকের শব্দে তার আচ্ছন্নভাব প্রথম ছিন্ন হল।

চারটি রূপসী তরুণী তাকে বয়ে বয়ে নিয়ে এল একটি গ্রামের মত স্থানে। পা-হাঁটুর বেদনায় মুহ্যমান হলেও তার চোখ দুটি নিয়ত সজাগ হয়ে ছিল। চেয়ে চেয়ে দেখলো, দেখেশুনে বুঝলো, সে এসে উপস্থিত হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন এক অজ্ঞাত দ্বীপে এবং যে দ্বীপবাসিনীরা সবাই মেয়ে এবং সবাই রূপসী তরুণী। ডজন ডজন প্রায় একই বয়সের সুন্দরীরা কোথা থেকে এসে ওকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়ালো। কিছু মেয়ে স্তন অবধি ঢাকা মিনি লুঙ্গি ধরনের ছাপা লাভা-লাভা পরেছে। আর কিছু কিছু মেয়ের ঊর্ধ্বাঙ্গ একেবারে নিরাবরণ, শুধুমাত্র কোমরে ক্ষুদ্রকায় বস্ত্রখণ্ড জড়ানো। এই দুঃখবেদনার মধ্যেও মাইকের মনে হল সে এসে উঠেছে এক প্যারাডাইসে, স্বর্গভূমিতে। যেখানকার বাসিন্দা বুঝি সবই অর্ধ বা প্রায় উলঙ্গ অজস্র সুন্দরী তরুণী। একি স্বপ্ন? না মায়া? নাকি মরীচিকা?

চারজন তরুণী ওকে পাতায় বেড়া ও পাতার ছাউনিওয়ালা একটি কুটিরে নিয়ে তুললো। একে এ দেশীয়রা বলে পপুই। সেখানে নিয়ে পাতায় বোনা মাদুরের ওপর শুইয়ে দিল ওকে।

মাইকের তখন আচ্ছন্নের মত অবস্থা। সে বুঝতে পারলো মেয়েরা তার প্যান্টটাকে ছিঁড়ে ফেলছে তার বাঁ পায়ের আঘাতটা পরিমাপ করার জন্য। বাঁ পাটা কলাগাছের মত দারুণভাবে ফুলে উঠেছে। অসহ্য ব্যথা। ঘিরে থাকা মেয়েদের মধ্যে সহানুভূতির গুঞ্জন উঠলো। মাইক বাধা দিল না। মেয়েরা ওর দেহ থেকে নোনাজলে চপচপে যাবতীয় পোশাক খুলে নিল ওকে পরিপূর্ণ বিবস্ত্র করে। এরপর পরমাদরে ও অতি যত্নে ওরা ঠাণ্ডা কি একটা পুলটিস মাখিয়ে ওর পাটাকে সম্পূর্ণ ব্যাণ্ডেজ করে দিল কি সব অপরিচিত পাতা দিয়ে। ওর বুক ও পেট কি এক প্রকার তরল পদার্থ দিয়ে মালিশ করে দিতে লাগলো। লজ্জাশরম করবার অবকাশও ওর রইল না। এক সময় পরম আরামে ও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল সে। কতক্ষণ এভাবে সে ছিল তা বলা মুশকিল।

তবে আবছা মনে পড়ে, ওর এরপর বোধ করি ভীষণ জ্বর হয়েছিল, ও বোধ করি প্রলাপ বকেও ছিল বেশ কিছু সময়। দুতিন দিন হয়ত এভাবে কেটে যাওয়ার পর যখন ওর পুনরায় জ্ঞান ফিরলো তখন দেখলো বাঁ পাটার ফোলা সম্পূর্ণ কমে গেছে। শরীর অনেকটা সুস্থ। মাথা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

একটি মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে, হাতে তার একপাত্র ঈষদুষ্ণ নারকেলের দুধ। মিষ্টি গলায় সে বললে, এটা খেয়ে নিন মানাইয়া।

বিনা বাক্যব্যয়ে মাইক তা পান করলো সকৃতজ্ঞ চিত্তে, হাসিমুখে। মেয়েটির বয়েস হবে বড়জোর ষোল সতের। কুমারী মেয়েটির দেহসুষমাও অপূর্ব। পীনোন্নত পয়োধর, ক্ষীণ কটি, ভারী নিতম্ব, মিষ্টি কচি মুখ। বললে, এখন একটু ভাল বোধ করছেন তো, মানাইয়া?

—বেশ ভাল বোধ করছি। আরেকটু কাভা দেবে?

মেয়েটি মগ থেকে আরেক পাত্র ঈষদুষ্ণ নারকেলের দুধ ওকে দিল, বললে, আমরা আপনার আকাশ-পাখিকে (প্লেন) সূর্যোদয়ের ঠিক আগেই পড়তে দেখেছি। তার অনেক পরে আপনাকে আমরা খুঁজে পেয়েছি।

—তোমরা আমায় বর্শা আর চাবুক নিয়ে অভ্যর্থনা করলে কেন? মাইক প্রশ্ন করে, আমার দ্বারা কোন বিপদের আশঙ্কা করেছিলে কি?

—না, না মানাইয়া, মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলে, আমরা যোদ্ধা। আমরা কখনো কোথাও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া যাই না।

পরবর্তী মিনিট পনের মাইক মেয়েটির কাছ থেকে অনেক কিছু শুনে নিল। টাফানুই হল মেয়েটির নাম। এ দ্বীপটা টোকলাউ দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ। কয়েক মাইল দূরের আটাফু নামক দ্বীপের বাসিন্দা তারা। এই নির্জন দ্বীপে প্রতি বছর আটাফুর কুমারী তরুণী মেয়েরা আসে যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে, দু মাসের জন্যে।

টাফানুই আরও বললো যে তাদের দ্বীপের অবিবাহিত মেয়েদের অবশ্যই সামরিক ট্রেনিং নিয়ে মিলিটারী বিভাগে নাম লেখাতে হয়। এর কারণ হল তাদের দ্বীপে ছেলেদের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা অনেক অনেক বেশী। তাই শুধুমাত্র মেয়েরা এই দ্বীপে চলে আসে প্রতি বছর। কোন ছেলের এখানে প্রবেশ নিষেধ।

—তাই যদি হয় তাহলে তো আমাকেও এ স্থান ছেড়ে চলে যেতে হবে। মাইক বলে।

—না না তা নয়। কিশোরী মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে ওঠে, আপনি হলেন মানাইয়া। আপনার উপস্থিতি এখানে আমাদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ।

মাইক ভেবে পেল না, এ কথার দ্বারা মেয়েটি কি বোঝাতে চায়।

এরপর বেশ কিছুদিন তাকে অতি যত্নে রেখে দিয়ে ফের চাঙ্গা করে তুললো। পা ভাল হয়ে গেল। সে এখন হেঁটে চলে বেড়াতে সমর্থ হল। তাকে ওখানে যত রকমের সুখাদ্য ছিল এমনভাবে খাওয়াতে লাগলো যে শেষ পর্যন্ত সে প্রায় করজোড়ে রেহাই প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়। যত্নআত্তির ঠেলায় প্রাণ যায় আর কি!

পপুই থেকে প্রথম বাইরে বেরিয়ে সে দেখলো দ্বীপটা অতি ক্ষুদ্রই বটে। ঘোড়ার খুরাকৃতি এর গড়ন। আধ মাইল চওড়া আর তিন থেকে চার মাইল লম্বা এ দ্বীপ। খুরাকৃতির একদিকে এদের ক্যাম্প আর মাঝখানের লেগুনের অপর পাড়ে ছয় সাতশ' ফুট উঁচু টিলাসদৃশ এক পাহাড়ে উপত্যকা।

ওর কুটির (পপুই)-এর সামনের মাঠে দেখলো আশি-নব্বুইটি তরুণী বিভিন্ন গ্রুপে দাঁড়িয়ে নানাবিধ প্যারেড ড্রিল করে চলেছে। সামনে তাদের প্রত্যেক দলের একজন করে বয়স্কা নেত্রী চাবুক হাতে তদারক করে যাচ্ছে। একপাশে জনা বারো নগ্ন মেয়ে একটা মরা শূকরকে ডামি বানিয়ে বর্শা দিয়ে খোঁচানো প্র্যাকটিস করছে। আর একস্থানে কতকগুলো মেয়ে ঘিরে বসে কুস্তি দেখছে। ষণ্ডামার্কা দুটো মেয়ে উলঙ্গ দেহে কি এক প্রকার জান্তব তেল গায়ে মেখে একে অপরের সঙ্গে কুস্তি লড়ে যাচ্ছে। মজা এই যে, মাইককে দেখেও বিবসনা তরুণীদের কেউ কোন সংকোচ বা দ্বিধা প্রকাশ করছে না। সামনের লেগুনে একদল মেয়ে ক্যানো নৌকোতে বাইচ প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে।

এক সময় কতকগুলো মেয়ে কুস্তি-ক্রীড়া অন্তে লাভা লাভা অঙ্গে জড়িয়ে মাইকের সামনে এসে উপস্থিত হল। তাদের নেত্রী শীর্ণকায়া অথচ পেশীবহুল একটি বয়স্কা তরুণী চাবুক হাতে এগিয়ে সামনে এসে বলল, এখন তো আপনি পুরোপুরি সুস্থ সমর্থ হয়ে উঠেছেন মানাইয়া, তাই না? আমার নাম হল আউনিয়া। আমি এখানকার ট্রেনার প্রধান।

মাইক সম্মান প্রদর্শনের ভঙ্গী করলো। গম্ভীরমুখে আউনিয়াও প্রত্যভিবাদন করলো। বললে, আপনি এখানে এসে আমাদের ধন্য করেছেন। আপনাকেও আরও কিছু আশীষ প্রদান করতে হবে আমাদের। আমাদের বেশ কিছু দেবশিশু দিতে হবে! যার ফলে আমাদের জাতি আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

শুনে, মাইকের বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়বার দাখিল হল। বলে কি এ মেয়ে! ভাষার গণ্ডগোলে কি সে ভুল শুনলো? না, এদের ভাষা তো সে নির্ভুল বুঝতে পারছে। এরা বলছে, এদের কিছু দেবশিশু দিতে হবে!

এখন তার বোধগম্য হল কেন এই মেয়েরা তাকে এত আদরযত্ন ভালবাসা দিয়ে সুস্থ সমর্থ করে তুলেছে। অথচ এ দ্বীপে নাকি কোন পুরুষ মানুষ আসা নিষিদ্ধ! এই যোদ্ধা যুবতীদলের যারপরনাই প্রশংসা কুড়িয়েছে তার শ্বেতচামড়া! শ্বেতাঙ্গ মানুষ এদের কাছে দেবতুল্য। এসব দ্বীপের অঞ্চলে শ্বেতকায়রা প্রকৃতই বিরল। এই মেয়েগুলো তাহলে কি তাকে প্রজনন যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করতে চায়? ওহ্ গড! এ যে অবিশ্বাস্য অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার!

এখানে প্রায় শতাবধি তরুণী বাস করছে। তারা কি প্রত্যেকে দেহদান মারফত তার কাছে দেবশিশুর জন্ম কামনা করছে নাকি? সর্বনাশ! মাইক ইতিপূর্বে এসব অঞ্চল সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী কাহিনী শুনেছে। সাউথ প্যাসিফিকের পুরুষ জনসংখ্যা অসুখ-বিসুখ বা নানাবিধ দুর্ঘটনা বা তাদের দেশান্তরে ভ্রমণের অভ্যেসের দরুন ক্রমশঃই কমে আসছে। অতএব মেয়েরা কি করে? মাইকের কাঁধ ঝুলে পড়ে আশঙ্কায়। সুযোগ সুবিধে ও মওকা পেলে দু'একটা মেয়ের সঙ্গে সাময়িক প্রেম-পিরীতি করা এককথা, আর শতাবধি মিলিটারী মেয়ের পালকে এক এক করে দেহজ ক্ষুধা মিটিয়ে দেবশিশু প্রদান করা যে এক ভয়াবহ দানবিক কল্পনা। এ যে লৌহমানবের দৈহিক শক্তিরও বাইরে।

যা ভেবেছে তাই। এ দ্বীপস্থ প্রতিটি যুবতী প্রায় তার সঙ্গ কামনা ক'রে, দেহদানে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। সুস্থ হওয়া অবধি তারা ধৈর্য ধরে ছিল, কিন্তু এখন আর সময় নষ্ট করতে রাজী নয়।

সেদিন রাত্রিতেই তার কুটিরে একটি যুবতী এল। লাজুক-লাজুক মেয়ে হলেও, যে উদ্দেশ্যে আসা সে সম্বন্ধে সে যেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ। বাধা দেওয়া নিষ্ফল। পড়েছে যখন যবনের হাতে দেহজ খানা তাকে খেতেই হবে সাথে।

প্রথমার সঙ্গে মিলন, বলাই বাহুল্য, খুবই আনন্দদায়ক হল। কিন্তু এই অভিসারিকা চলে যাওয়ার ঘণ্টা চারেক বাদে দ্বিতীয়া এক যুবতী এসে তার ঘুম ভাঙালো। চালের ফুটো দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় সে দেখলো দ্বিতীয়া কালবিলম্ব না করে তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মেয়েটার বড়জোর বছর ষোল বয়েস। বক্ষলগ্না বিবস্ত্রা মেয়েটি কাতর মিষ্টি কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে ওঠে, আমাকে একটি সন্তান দিন মানাইয়া। আমাকে একটি ছেলে দিন, যে একদিন চীফ হবে, চালাবে আকাশ পাখি।

যত দিন ও রাত্রি যেতে লাগলো ততই একই কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকলো মাইকের জীবনে। তাকে যেন নয়নের মণি করে রাখলো মেয়েগুলো। সারাদিন মেয়ের দল একেকজন এক এক প্রকার সুখাদ্য এনে সোহাগে আদরে খাওয়াতে লাগলো। পেটে ধরে না, প্রাণ যায়-যায়, তবু খেতে হবে। জাগলেই ব্রেকফাস্ট। তারপর লেগুনের স্বচ্ছ জলে কিছুক্ষণ সাঁতার, সঙ্গে ডজনখানেক মেয়ে সহচরী। তারপর বসে বসে যুবতীদলের মিলিটারী প্যারেড দর্শন। মেয়েগুলো যেন নতুন প্রাণশক্তিতে উদ্দামভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে এখন। দুপুরে ফের প্রচুর ভুরিভোজন। মেয়েগুলো ওর প্রাণশক্তি ও বলবীর্যবর্ধনের নিমিত্ত কি করবে যেন ভেবেই পায় না।

সন্ধ্যার পর শিকার করা শূকরের মাংস আর তার সঙ্গে ঈষদুষ্ণ নারকেলের দুধ। নাচ গান পিকনিক এবং সমবেত ভোজনপর্ব। উদ্দাম হুলাহুলা নাচ চলে মেয়েদের, মাঝখানে আগুন জ্বেলে।

তারপর আসে রাত্রি। যোদ্ধা মেয়েদের এটা বিশ্রামের কাল। কিন্তু বিশ্রাম নেই মাইক-এর। দুটি তো বটেই, প্রায়শঃই তাকে তিনটি যুবতীর কামলালসা মেটাতে হয় প্রতি রাতে। যেহেতু অভিসার চলতো অন্ধকার নিশীথে, তাই মাইক বুঝে উঠতে পারত না পরপর আলাদা আলাদা মেয়েই আসছে, না কি একই মেয়ে একাধিকবার এসেছে। তবে এরা যেমন ডিসিপ্লিন মানা দল তাতে মনে হয় প্রতিটি মেয়েকেই একবার করে মানাইয়া বা শ্বেতকায় দেবতার কাছে দেবশিশু কামনায় পালা করে পাঠানো হতো।

ভাবলে অবাক লাগে মাইকের, এতটা উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও তার শারীরিক ক্ষমতা কিছুকাল আশ্চর্য রকমের অটুট ছিল। হয়ত বা অতি সুন্দর জলবায়ু এবং কল্পনাতীত সুখাদ্যই এর কারণ। রাতজাগা কর্মকাণ্ডের পর দিনভোর নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামও এ ব্যাপারে তাকে বুঝি প্রভূত সাহায্য করেছে।

তবু মনের দিক থেকে সে যারপরনাই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। দেবতাই ভাবুক আর যাই ভাবুক আসলে সে তো ওদের কাছে আজ্ঞাবহ ক্রীতদাস রূপেই বন্দীজীবন যাপন করে যাচ্ছে। মেয়েগুলির কিন্তু তার প্রতি ভালবাসার কোন চিহ্নমাত্র নেই। সে শুধু একটা প্রয়োজনের যন্ত্রবিশেষ। সন্তান উৎপাদনের কল।

কিশোরী আউনিয়ার মুখে ওদের স্বজাতি সম্পর্কে আরও অনেক বিবরণ জ্ঞাত হল মাইকের! ওদের দ্বীপে মেয়ের সংখ্যা এত বেশী যে অধিকাংশেরই

এ জীবনে বিয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। সে হিসেবে এই মেয়ের দলের অনেকের কাছেই মাইকই প্রথম ও শেষ পুরুষ তাদের জীবনে। শ্বেতকায়ের ঔরসে সন্তানপ্রাপ্তি দ্বারা তাদের সমাজের মহৎ উন্নতিই সাধিত হবে। এই শ্বেতাঙ্গরাই তো পৃথিবীর অধিপতি, নয় কি? এরাই স্বর্গপথে (আকাশে) ঝকমকে পাখি ওড়াতে সক্ষম। এরাই এমন অস্ত্র তৈরি করেছে যা শত শত ফুট দূর থেকে মানুষ মারতে পারে। অতএব তাদের হাতের মুঠোয় এখন এই শ্বেতাঙ্গ দেবতা। তাকে কাজে না লাগিয়ে চরম মূর্খামি করবে না এরা।

দেহজ আনন্দেরও বুঝি একটা সীমা আছে। কালক্রমে তা ভয়াবহ বিভীষিকায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। মাইক হাঁপিয়ে উঠলো, পাগল হয়ে উঠলো মাসখানেক এই ধরনের নারীদেহময় জীবনযাপন করতে করতে। এখন শুধু একই চিন্তা, একই ধ্যান, কি করে এই যৌনক্ষুধার্ত পুরুষ-শিকারী একপাল মেয়ে নেকড়ের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কিন্তু পাণ্ডববর্জিত সাউথ প্যাসিফিকের এক অতি নিরালা দ্বীপ থেকে হাজার হাজার মাইল অম্বুরাশি পার হয়ে কিভাবে সে তার সভ্য সমাজে পাড়ি জমাবে? নারীদেহের প্রতি তার ঘেন্না ধরে গেছে। এখন উন্মুক্ত উন্নত স্তন, লোভনীয় নিতম্ব, যৌন আবেদনের ছলা-কলা কোন কিছুই তাকে আর উত্তেজিত করতে পারে না। নারী-মিলনের প্রতি পরিপূর্ণ বিগতস্পৃহ হয়ে উঠেছে সে।

অতএব পালাবার উদ্দেশ্যে হাজার চিন্তা করতে লাগলো সে। একটিমাত্র পথই খোলা আছে। সে হল যদি কোন পথচলতি বিমান উড়ে যাবার মুখে তাকে দেখতে পায়, তবেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া সম্ভব।

পরদিন সকালে যখন মেয়েরা তাদের সামরিক ড্রিল-এ ব্যস্ত মাইক প্যাটার্সন তখন অলক্ষ্যে হাঁটতে হাঁটতে খুরাকৃতি দ্বীপের অপর প্রান্তে অবস্থিত কয়েকশ ফিট টিলার উপরে উঠে এল। টিলার উপরে একটা টেনিস কোর্টের মত উঁচু সমতল স্থান আবিষ্কার করলো সে। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় তার একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

নীচে নেমে এসে নারকেল-বীথি থেকে বেশ কয়েকটা পড়ে যাওয়া নারকেল তুলে নিয়ে এল টিলার উপর। এইভাবে বার ছয়-সাত যাতায়াত করে গোটা চল্লিশেক নারকেল এনে সে ঐ টিলার সমতল স্থানে পরপর এমনভাবে স্থাপন করলো যাতে ইংরাজী এস-ও-এস (S. O. S.) লেখাটি হয় (এটা বিপদে আহ্বান সংকেত)। একদিনে তিনটে অত বৃহৎ শব্দ সাজানো সম্ভব হল না। এইভাবে দিন চারেক সে লুকিয়ে লুকিয়ে এল এবং আরও নারকেল সংগ্রহ করে পুরো

এস-ও-এস শব্দটি বিশালকায় করে অঙ্কিত করলো। এবার আকাশের যে কোন উচ্চতা থেকে এ লেখা নজরে পড়বেই পড়বে।

আর কিছু করার নেই। এখন শুধু প্রতীক্ষা করা। যদি কোন প্লেন কোন এক সময়ে এ পথ দিয়ে যায় এবং তার নজরে এই এস-ও-এস পড়ে, তা হলেই পরিত্রাণের সৌভাগ্য হবে। নয়ত···নয়ত এই নারীসঙ্গরূপ বিভীষিকার কারণেই হয়ত একদিন তার দেহ ক্লান্ত থেকে ক্লান্ততম হয়ে তার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে যাবে। কী জঘন্যপথে মৃত্যু। মাইক একথা চিন্তা করে শিউরে ওঠে বারংবার।

এই যুবতীপালের মধ্যে একমাত্র সপ্তদশী টাফান্থই-ই তার প্রিয়তমাসদৃশ। মাইক এ দ্বীপে আসবার পূর্ব পর্যন্ত মেয়েটি জানত না পুরুষসঙ্গ কাকে বলে। এই মেয়েই প্রথম এসেছিল তার অঙ্কশায়িনী হতে।

টাফান্থই আরক্তিম হয়ে সঙ্গোপনে বলে, মানাইয়া, এখন আমি আপনার সন্তান ধারণ করছি আমার গর্ভে। আমি সেই দেবশিশুর নড়াচড়া অনুভব করছি আমার জঠরে। ওর গায়ের রঙ হবে আপনার মত সাদা, আর ও হবে তালগাছের মত লম্বা, তাই না মানাইয়া?

মাইক হাসে। অতি দুঃখেই বুঝি হাসে। শুধু এই সপ্তদশী কিশোরীই নয়, বহু যুবতীই হযত ইতিমধ্যে গর্ভবতী হয়েছে তার দ্বারা। তবে টাফান্থইয়ের শরীর দেখে মনে হয় না ও গর্ভধারণ করেছে। ও হয়ত মিছে কথা বলছে বা এটা ওর কল্পনাবিলাস মাত্র। কেননা যদি গর্ভবতী হয়েও থাকে, তবে এক দেড় মাসে কিছুতেই গর্ভস্থ ভ্রূণের নড়াচড়া সম্ভব নয়! মুখে কোন প্রতিবাদ করে সে ওর সুখ-স্বপ্নকে নষ্ট করে দিল না।

টাফান্থই বলে চলে, আপনি আসবার আগে মানাইয়া আমি ভাবতাম এ জীবনে আমার কোন সন্তান হবার সুযোগ নেই। ভাবতাম আমাদের দলনেত্রী আউনিয়ার মত কুৎসিত কাঠখোট্টা হয়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হব আমি। কিন্তু এখন আপনি কৃপা করে, আমি যা আকাঙ্ক্ষা করেছি, তাই প্রদান করেছেন।

—কেন, তোমার মত সুন্দরী মেয়ে নিশ্চয়ই স্বামী পেতে আটাফুর কোন যুবককে, মাইক ওকে ভরসা দেয়।

টাফান্থই মাথা নেড়ে বলে, কক্ষনো নয়। আমাদের দ্বীপে প্রত্যেক ছেলের মাথা পিছু তিন চারটে বউ হলেও তবু বহু মেয়ে অবিবাহিত থেকে যাবে।

আমার চেয়ে আরও কত সুন্দরী মেয়েরা পর্যন্ত অবিবাহিতা অবস্থায় বুড়ী হয়ে মারা গেছে। আমরা খুব গরিব। ছেলেরা বিয়েতে আবার প্রচুর পণ এবং দানসামগ্রী দাবি করে থাকে।

—আচ্ছা টাফান্থই, তোমরা যে এত ড্রিল প্যারেড করে যোদ্ধা হচ্ছ, তোমাদের দেশ বুঝি প্রায়ই শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়?

—না না, তা নয় মানাইয়া। সরল মনে কিশোরী জানায়, আমাদের দেশ কক্ষণো কেউ আক্রমণ করেনি। এই প্যারেড ড্রিল করি আসলে আমাদের তো কিছু করতে হবে, কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবেই। এও ঠিক যদি কখনো দেশ আক্রান্ত হয় তো আমরা অনায়াসে যুঝতে পারব শত্রুর বিরুদ্ধে।

সবই বুঝতে পারে মাইক। এইসব তরতাজা কুলভাঙা যৌবনময়ী মেয়েগুলির অদম্য শক্তিসামর্থ্যকে এইভাবে ক্ষয় করে দেওয়া হয়। এদের তো আর কারুর স্ত্রী হয়ে সন্তান-সন্ততি জন্ম দেবার আশা নেই, তাই এ ব্যবস্থা। মাইক এবার প্রশ্ন করে, তবে এইসব উদ্বৃত্ত মেয়েরা কেন অন্যান্য দ্বীপে চলে যায় না, যেখানে ছেলের সংখ্যা বেশী? না, তারও নাকি উপায় নেই। ছেলেরা যেখানে খুশী যেতে পারে, কিন্তু মেয়েদের দ্বীপ ছেড়ে যাওয়া মহাপাপ। তাতে স্বজাতির সমূহ অমঙ্গল হয়।

দিন সাতেক বাদে মাইক একবার তিন মাইল দূরত্বের সেই টিলার উপর গেল দেখতে যে তার তৈরি এস-ও-এস যথাযথ আছে কিনা, না কি প্রবল বাতাসে ডাবগুলো উড়ন্ত বালি চাপা পড়ে গিয়েছে।

গত রাত্রে দলনেত্রী আউনিয়া জানিয়েছে তাদের ট্রেনিং পর্বের আয়ুষ্কাল নাকি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মনোগত উদ্দেশ্য বোধ করি প্রজনন যন্ত্র রূপে তাকে আরও কিছুকাল ব্যবহার করে যাবতীয় সৈনিক মেয়েকেই সন্তানবতী করে তোলা। মনে মনে প্রমাদ গণলো মাইক।

ভেবে হাসি পেল মাইকের যে যখন এইসব উদ্বৃত্ত মেয়েরা ফের ট্রেনিং অন্তে আটাফুতে ফিরে যাবে প্রত্যেকে কোলে নিয়ে এক একটি সাদা ফুটফুটে বাচ্চা, তখন উক্ত দ্বীপের পুরুষ বাসিন্দাদের মনোভাব কী রকম হবে! কি আর হবে? বিশেষ করে যখন জানবে যে এইসব সন্তানেরা একজন শ্বেতাঙ্গ দেবতার ঔরসের দেবশিশু! তখন হয়ত তারা সশ্রদ্ধায় এবং সানন্দে এদের গ্রহণ করবে।

সে যাই হোক, মাইকের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হয়ে উঠছে। সে আর পারে না। সে তো সামান্য রক্তমাংসের মানুষ মাত্র। এক-স্ত্রী-রূপ ঈশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করে প্রতি রাত্রে একাধিক স্ত্রী সম্ভোগ মানুষের সাধ্যের

অতীত। দেহকাণ্ড এত ধকল, এত ক্ষয় সহ্য করতে পারে না। একদা দুর্দান্ত স্বাস্থ্যের অধিকারী মাইকের এখন প্রায় হাড়-বের-করা, গালভাঙা, কোটরগত চক্ষুদ্বয় প্রভৃতিসহ এক কদাকার চেহারায় পর্যবসিত হল। অচিরে নার্ভাস ব্রেকডাউন হওয়াও বিচিত্র নয়।

টিলায় উঠে দেখলো নারকেলগুলো যথাস্থানে ঠিকই আছে এস-ও-এস রূপে। হে ঈশ্বর! একটা প্লেনকে এনে দাও মাথার উপরের আকাশে। আমায় বাঁচাও। এই নেকড়ে সদৃশ কামপ্রবণা নারীর পালের হাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ করে নিয়ে যাও! চুপচাপ আকাশপানে চাতকের মত চেয়ে বসেছিল মাইক, সহসা পেছনে শব্দ হতে চমকে ফিরে তাকালো। আরে, টাফান্নুই এসে দাঁড়িয়েছে এখানে।—আরে, তুমি এখানে এসেছ কি করতে?

মিটিমিটি হেসে টাফান্নুই বলে, আমি দেখলাম, আপনি চুপেচাপে এদিক পানে আসছেন, আমিও পেছু নিলাম দেখতে আপনি কোথায় যান।

উদ্বিগ্ন হল মাইক, বললে, তার মানে আউনিয়া তোমাকে আমার পেছনে স্পাই হিসেবে পাঠিয়েছে, তাই না? মাইকের ভয় হল তার সব প্ল্যান এবার ভেস্তে যাবে।

মাথা নাড়ে টাফান্নুই, দূর, তা কেন হবে। আমাকে কেউই পাঠায়নি। আমি নিজেই এসেছি। আপনার কাছে কাছে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে।

এরপর কিশোরী পায়ের নীচের বালি হাত দিয়ে চিলি কাটতে কাটতে যেন স্বগতোক্তির মত বলে যায়, প্রায়ই দেখি আপনি কোথায় যেন যান।

তারপর মেয়েটার চোখে আধা কৌতুক ঝিলিক দিয়ে ওঠে, আপনি এই বালির ওপর একটা নকশা এঁকেছেন। আপনি আশা করছেন অন্যান্য সাদা মানুষদের আকাশপাখি এখান দিয়ে উড়ে যাবার মুখে তাদের এ নকশা নজরে পড়বে। তাই না?

—জানো টাফান্নুই, আমি আমার দেশের মানুষদের কাছে ফিরে যেতে চাই, মাইক প্রায় করুণকণ্ঠে বলে ওঠে।

—আপনি তাহলে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন?

—হ্যাঁ। বহুদিন আমি এখানে রয়েছি। দেশের লোকের জন্যে আমার মন কেমন করে না? তুমিই বলো।

—না, আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না, মানাইয়া। করুণকণ্ঠে কিশোরী মিনতি করে।

মাইক অস্বস্তিসহ চাইল মেয়েটার পানে। দলনেত্রী আউনিয়ার কানে

ঘুণাক্ষরে কিছু পৌঁছলে তার সমস্ত পরিকল্পনার দফা গয়া হয়ে যাবে। তাকে তাহলে সতর্ক প্রহরায় ঐ কুটিরের মধ্যে বন্দী রেখেই প্রজনন ষণ্ডের কার্যাবলী চালিয়ে যেতে বাধ্য করবে।

প্রায় হাত দুটি জোড় করেই মাইক জিগ্যেস করে, টাফানুই, তুমি কি আমার এইসব পরিকল্পনার কথা আউনিয়াকে বলে দেবে নাকি ?

—এটা আমার কর্তব্য ! সে আমাদের দলনেত্রী। কিন্তু···টাফানুই মাথা ঝাঁকুনি দিতে দিতে মত পালটে বলে, যে আপনার সন্তান গর্ভে ধারণের গৌরব অর্জন করেছে তাদের পক্ষে এ কাজ করা কি সমীচীন ? তা ছাড়া যারা এখনো আপনার দ্বারা গর্ভবতী হবার সুযোগ পায়নি তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না কি আপনি চলে গেলে ? তবে আমার কথা আলাদা, আমি জানি আপনাকে আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাই, আপনি ফিরে যান আপনার নিজের লোকদের কাছে। আপনার সুখেই আমি সুখী হব।

—শুনে খুবই খুশী হলাম টাফানুই।

—বেশ, তাহলে আমি আউনিয়াকে কিছুই বলবো না, কিশোরী উজ্জ্বল মুখে বলে।

শুনে খুব ভাল লাগে মাইকের। মেয়েটা বুঝি দেহের সঙ্গে মনটাকেও প্রদান করেছে তাকে।

অকস্মাৎ কপালে হাতের পাঞ্জা আড়াল করে টাফানুই আকাশ পানে তাকিয়ে উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে, দেখুন, দেখুন, মানাইয়া। আকাশ-পাখি আসছে।

মাইক সঙ্গে সঙ্গে তাকায়। সত্যিই তো প্লেন আসছে তার চিরপরিচিত ও মধুর শব্দ করতে করতে। প্লেনটা বোধ হয় মুফুটাপুর দিকে চলেছে।

—ওরা আপনার জন্যেই আসছে, কিশোরী বালিকা বলে, ওর মধ্যে রয়েছে আপনাদের লোক।

এক মুহূর্ত ইতস্তত: করলো মাইক। প্লেনটা এই দ্বীপের প্রায় মাইল খানেকের মধ্যে এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকার মাঝখানে দৌড়ে গিয়ে উদ্বাহু হয়ে হাত নাড়তে লাগলো সমানে। এই তার শেষ সুযোগ। এ সুযোগ নষ্ট করলে তার জীবনাবসান হয়ে যাবে এই সব সুন্দরী রাক্ষসীদের কামবাসনা চরিতার্থ করবার ঠেলায়।

এবার টাফানুই এক কাণ্ড করে বসলো। দৌড়ে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে নিজদেহের একমাত্র রঙীন বস্ত্রখণ্ড লাভালাভাকে এক ঝটকায় খুলে ফেলে

উলঙ্গ অবস্থায় দুহাত দিয়ে সেটা নিশানের মত ওড়াতে থাকলো মাথার ওপরে।

প্লেনটা এখন ওদের ঠিক মাথার ওপরে এসে গেছে। একদিকে পাগলের মত উঁচু দুহাত নাড়তে লাগলো মাইক, অপরদিকে পাশে দাঁড়ানো বিবসনা মেয়ে তার লাভালাভাকে প্রবলবেগে ওড়াতে থাকলো।

—ওরা আমাদের নজর করেছে, মাইক চিৎকার করে ওঠে। ঐ তো, ওরা চক্রাকারে পাক খাচ্ছে।

সত্যিই তো, প্রায় ১৫০০ ফুট উচ্চতায় প্লেনটা পাক খেতে লাগলো দ্বীপটির চারধারে। মাইক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ককপিট-এর মানুষগুলোকে। বার তিনেক পাকখেয়ে প্লেনটা যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিক উড়ে চলে গেল।

বিষন্ন হতাশ কণ্ঠে কিশোরী বলে ওঠে, ওরা তো এল না। ওরা যে চলে গেল।

—ওরা আমাদের দেখেছে, মাইক উত্তেজনায় কম্পিতকণ্ঠে বলে যায়, এখানে ল্যাণ্ড করবার মত জায়গা নেই তাই ওরা ওদের বেস্-এ ফিরে গেল হেলিকপ্টার পাঠাতে, বলে মাইক ধেই ধেই করে নাচতে লাগলো পরমানন্দে।

কিশোরী মেয়েটার হাত থেকে লাভালাভাটা মেঝেতে পড়ে গেছে, সে তার বিবস্ত্র দেহটা নিয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে গেল। দু'চোখ বেয়ে সহসা অশ্রু নেমে এল অঝোরঝরে। শুধু দুঃখ নয়, এর সঙ্গে বুঝি মিশে আছে আনন্দাশ্রুও।

ঠিক এই মুহূর্তে প্রায় এক মাস পরে, মাইকের দেহে-মনে প্রকৃত নারী-সম্ভোগের বাসনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

দুহাত বাড়িয়ে তন্বী রূপসী কিশোরীকে মাইক প্রবল আলিঙ্গনে বুকের মধ্যে চেপে ধরলো। অশ্রুভেজা সারা মুখে অজস্র চুম্বন এঁকে দিল একের পর এক। পরে কচি কচি কাঁপা ঠোঁটে নিজের বলিষ্ঠ ঠোঁট চেপে ধরে দীর্ঘস্থায়ী এক চুম্বনে টাফানুইর সর্বাঙ্গকে শিহরিত করে তুললো! উত্তেজনায় রক্তে এসেছে চরম উষ্ণতার প্লাবন। বাঁধ ভাঙ্গা সেই কামোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে দুটি দেহই মিলনোম্মুখ হয়ে উঠেছে। সেই এস-ও-এস অঙ্কিত ডাবের সারির মাঝখানে এক সময় দুজনে ভূমিশয্যা নিল। সারা পৃথিবী কিছুক্ষণের জন্য বিস্মৃত হয়ে গেল···

কিছুক্ষণ বাদে ওরা নেমে এল টিলা থেকে। ঘণ্টাখানেক বাদে দুজনে একসঙ্গে গ্রামে ফিরতেই দেখলো রক্তচক্ষু আউনিয়া হাতে সেই ভয়াবহ চাবুক নিয়ে পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

টাফান্নুইকে দেখামাত্র সগর্জনে তাকে মারতে দলনেত্রী চাবুক তুললো। তৎক্ষণাৎ মাইক প্যাটার্সনও গর্জন করে বলে ওঠে, খবরদার! টাফান্নুইকে আঘাত কোরো না।

এই বুঝি দ্বীপে পদার্পণের পর সে কঠোর কণ্ঠে প্রথম কারুর প্রতি আদেশ হাঁকলো। চমকে থেমে গেল আউনিয়া, চাবুকটা নীচু হয়ে গেল হাতে।

—টাফান্নুই হল মানাইয়ার প্রিয় ও ভালবাসার পাত্রী, তেমনি সুগম্ভীর কণ্ঠ মাইকের, ওর যেন কোন অনিষ্ট না হয় বলে দিলাম।

—যথা আজ্ঞা আপনার, বশংবদ কণ্ঠে আউনিয়া বললো।

—তোমরা দেখেছ আকাশপথে এসেছিল আকাশপাখি, মাইক বলে যায়, আমার লোকেরা আমায় নিয়ে যেতে আসছে। আমি তোমাদের অধিকাংশকেই সন্তানদান করেছি। এখন তোমরা আমাকে বিদায় দাও।

মাইক সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলো, যে কারণেই হোক সে দুর্ধর্ষ দলনেত্রীকে দমিয়ে ফেলেছে।

সেদিন মধ্যাহ্নভোজকালে অনেকের চোখেই জল দেখলো মাইক। সবচেয়ে বিচলিত করলো তাকে স্বয়ং সজলচক্ষু কঠোর জাতের মেয়ে দলনেত্রী আউনিয়া। তার চোখেও জল। আশ্চর্য। চোখের জল ঢাকতে দলনেত্রী মুখ ঘুরিয়ে নিল। প্রকৃত সৎ দলনেত্রীর মতই সে নিজে কখনো মাইকের অঙ্কশায়িনী হতে এগিয়ে আসেনি। সে নিজে এগিয়ে দিয়েছে অল্পবয়সী মেয়েদের সুখ চরিতার্থ করতে। সবশেষে হয়ত সে আসতো। হায়, এখন কিনা তার সে সুযোগ চিরতরে বন্ধ হতে চলেছে। সে জানে তার মত কুৎসিত পুরুষালি মেয়ের পক্ষে এ জীবনে আর পুরুষসঙ্গ লাভ হবে না। তার জীবন কাটবে বিরক্তিকর মিলিটারী মহিলা হিসেবেই। অবিবাহিতা অসহনীয় ডাইনীর মত জীবনই তার বিধিলিপি।

মাইকের মন ওর কথা ভেবে প্রবল বেদনায় মোচড় দিল। একবার ভাবলো, হেলিকপ্টার আসতে কিছু দেরি হবে। এই ফাঁকে সে এই দুঃখিনী দলনেত্রীকে ডেকে নিয়ে ইহজীবনের পরম আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে দেবে। ক্ষণিকের ভালবাসায় আপ্লুত করে দেবে ওর কুলিশকঠোর দেহ আর মন। কিন্তু ও জানে আউনিয়া বড় অহংকারী ব্যক্তিত্বশালিনী মেয়ে। সে কখনোই আত্মসম্মানহানিকর করুণাভরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। কৃপা ভিক্ষা গ্রহণ তার ধাতস্থ নয়।

বেশ কয়েক ঘণ্টা পর মার্কিন সামরিক একটি হেলিকপ্টার এসে বেলাভূমে অবতরণ করলো। মুক্তির আনন্দে আত্মহারা মাইক প্যাটার্সন গিয়ে উঠলো

তাতে। তারপর হাত নেড়ে বিদায় নিল তীরে অপেক্ষমান প্রায় একশো অর্ধ-উলঙ্গ যুবতীদের থেকে। যুবতীদের প্রত্যেকের মুখ বিষাদে পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে।

হেলিকপ্টারের নাবিকগণ ঠাট্টা করে বললে, কি মজাই না তুমি লুটেছ দাদা! একশ' সুন্দরী নিয়ে তুমি একা। উঃ! স্বর্গ আর কাকে বলে!

—মোটেই স্বর্গ নয় দাদা। এ এক আনন্দঘন নরক। নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে সত্যি সত্যি আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি।

এর বছর পাঁচ ছয় বাদে মাইক নাকি তার ঘনিষ্ঠদের কাছে বলেছে, তার মনে মনে এই ইচ্ছেটা প্রবল ভাবে নাড়া দেয় যে, সে একবার আটাফু দ্বীপে যায়। গিয়ে দেখতে চায় পাঁচ বছর বয়সী কতগুলো ছেলেমেয়ে সেখানে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। আসলে তারা তো তারই সন্তান। রক্তের টানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের গর্ভধারিণীদেরও বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

অবশ্য সে আকাঙ্ক্ষা তার অপূর্ণই রয়ে গেছে আজও।

শত পত্নীর নায়ক এক আজব নাবিক

যে কাহিনীটি বলতে যাচ্ছি সেটি একধারে যেমন পরম বিস্ময়কর, তেমনি আবার অভাবনীয়ও বটে। পড়লে মনে হবে আশ্চর্য তো! এও কি সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব। কেননা এ ঘটনা কাল্পনিক নয়, বাস্তবভিত্তিক এক অতীব বিচিত্র কাহিনী।

আপনি যদি দূরপ্রাচ্যে বা সাউথ সী অঞ্চলে যান তো দেখতে পাবেন হাজার দেড় হাজার মাইল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে একই রকমের দীর্ঘকায় সুপুরুষ ধরনের বেশ কিছু মানুষ। এই মঙ্গোলীয় অনতিদীর্ঘ নরনারীর মধ্যে এদের আপনার নজরে পড়বেই, যেমন পড়েছিল কারলোভা নামক জনৈক সাংবাদিকের।

'কামুনিঙ' নামক একটি জাহাজে করে ওরা একদা ব্রিটিশ উত্তর বোর্ণিও-র সাণ্ডাকান বন্দরে পৌঁছলো। ডেকে দাঁড়িয়েছিল কারলোভা। তীরে নজর পড়তে বিরাট বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় সুন্দর সুপুরুষ এক যুবাকে দেখে বিস্ময় মানলো সে। মালয়ীদের মতো যদিও গায়ের রঙ কিন্তু উচ্চতায় ছয় ফুটেরও উপর, উন্নত ককেসিয়ানদের মত নাসা, দীর্ঘায়ত চোখ, সবার উপর আগুনের মত এক-মাথা সোনালী চুল। এ কোন্ দেশের মানুষ! চেহারায় মনে হয় ইয়োরোপীয়, গায়ের রঙে এদেশীয়, চুলের দিক থেকে স্ক্যাণ্ডানেভিয়ান। অথচ এখানকার মানুষের কেশরাশি ঘনকৃষ্ণ কালো, তবে? কাছে আসতে চোখ দেখে আরও বিস্মিত হল, কারলোভা, চোখের তারা ঠিক আকাশের মত নীল। এ অঞ্চলীয় মানুষের চোখ তো এমন নয়।

ডেক-এ সাংবাদিকের পাশেই দাঁড়িয়েছিল মালয়বাসী সেকেণ্ড অফিসার জাফর বিন ওসমান। ডক-এ দাঁড়িয়ে কুলি দিয়ে কাজ করাচ্ছিল ঐ বিচিত্র মানুষটি, কারলোভা জিগ্যেস করলো, ঐ তাজ্জব মানুষটি কোন জাতের বলুন তো?

জাফর হেসে বললে, সে কি, আপনি কখনো ইতিপূর্বে কোন 'অস্কার'কে দেখেন নি, টুয়ান?

—'অস্কার'? এ নামতো শুনেছি হলিউডের এক পুরস্কার হিসেবে।

জাফর হেসে উঠলো, না না সেটা নয়। এরা হল সাউথ সী-র 'অস্কার'। আপনি দূর প্রাচ্যের এ অঞ্চলে বহু স্থান জুড়ে এদের দেখা পাবেন।

এই সূত্রপাত। জাফর তারপর যে অদ্ভুত কাহিনীটি এইসব 'অস্কার'দের সম্বন্ধে বলে গেল তাকে প্রথমটা সাংবাদিক কারলোভা নেটিভদের কিংবদন্তী বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। কারণ এটা ঐতিহাসিক সত্য। এরা নাকি একজন মাত্র শ্বেতাঙ্গ অতিমানবের বংশধর। একটি লোকের সম্প্রদায়। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাষা কিন্তু একই ঔরসে জন্ম।

এরপর এই সাংবাদিক উত্তরে পেনাং থেকে দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর তীরস্থ থারসডে আইল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে শহরে বন্দরে এদের সন্ধান করে ফিরেছে। শত শত 'অস্কারে'র সন্ধান ও সাক্ষাৎ লাভ হয়েছে। বিচিত্র ভাষাভাষি এরা। নিউ হেব্রাইডিস-এর এরা ইংরেজীতে কথা বলে, টাহিটির ওরা বলে ফরাসী, সেলিবিস-এ ওলন্দাজ ভাষাভাষী, সিঙ্গাপুরে মালয়ী, অন্যান্য বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন পলিনেসিয়ান ভাষা। এমন কি চাইনিজ ভাষাভাষি 'অস্কার'ও রয়েছে একাধিক। এদের পুরুষরা সুন্দর, মেয়েরা রূপবতী, প্রত্যেকের সমুদ্র নীল চোখ আর একমাথা অগ্নিবর্ণ সোনালী-চুল। দীর্ঘদেহী সবাই।

এদের জন্ম ইতিহাস বড় রোমাঞ্চকর ও অদ্ভুত। সাংবাদিক জন কারলোভা বহু পরিশ্রমে বহু স্থান থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে যে চাঞ্চল্যকর আজব কাহিনী উদ্ঘাটিত করে তা হল এই :

বিগত ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ নাগাদ বিশালকায় অস্কার নিয়েলসেন নামক জনৈক মানুষ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দুর্ধর্ষ বন্দরে বন্দরে ভয় ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা ও ঘৃণার উদ্রেক করে ফিরতো। ভাইকিং গড-সদৃশ ছয় ফুট চার ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের সুন্দর পুরুষ। ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো কপাল পর্যন্ত ছেয়ে ফেলা একমাথা লাল সোনালী চুল, উন্নত নাসা, গাঢ় নীল চোখের তারা, দেখেশুনে মনে হত রোমান মাস্টার শিল্পীদের দ্বারা নির্মিত একটি অপূর্ব স্ট্যাচু বিশেষ।

পঁচিশ বছর বয়সেই লোকটি ক্যাপ্টেনের মর্যাদা লাভ করলো। সে যুগে একমুখ দাড়ি গোঁফ সমন্বিত বয়স্ক প্রৌঢ় ছাড়া কেউ ক্যাপ্টেনের যোগ্যতা লাভ করত না। নরওয়ের অধিবাসী এই বিরাটকায় যুবা পুরুষ কোন ক্রমে একটি লক্কড় জাহাজ পেলো যেটি নরওয়ে আর ব্রিটেনের মধ্যে যাতায়াত করবে।

মন ভরলো না ওর। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই যুবার চাই আরও উন্নতি, আরও অর্থ। কেননা ইতিমধ্যে হার্থা নামে এক রূপবতী কন্যার প্রেমে পড়ে তাকে বিবাহ করা স্থির করে ফেলেছে। কিন্তু মনোবাসনা মত স্ত্রীকে রানীর হালে রাখবার মত উপযুক্ত অর্থাগম হচ্ছে না।

অতএব অস্কার নিয়েলসেন তার প্রেমিকার কাছে একদা পঞ্চবার্ষিকী এক পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করল। সে অনতিবিলম্বে সম্পদশালী সাউথ-সী দ্বীপমালা অঞ্চলে চলে যাবে, সেখানে ভাগ্য ফিরিয়ে প্রচুর উপার্জন করে ফিরে আসবে দেশে। তারপর তার প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে সমুদ্র সম্রাটের সুযোগ্যা সম্রাজ্ঞীর মত অভিজাত ও প্রাচুর্যে ভরা জীবন যাপন করাবে।

পাঁ—চ বছর। উঃ কত দীর্ঘ সময়। হার্থা কাঁদো কাঁদো হয়ে যায় শুনে। তবু রাজী হতে হয় শেষ পর্যন্ত।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে একদিন প্রেমিক প্রেমিকা দীর্ঘ প্রেম মদির এক চুম্বন দ্বারা উভয়ের পবিত্র একনিষ্ঠতার অলিখিত শপথবাক্য নিঃশব্দে উচ্চারণ করে বিদায় নেয়। চলে আসে সাউথ-সী-অঞ্চলে। উভয়ে প্রতীক্ষা করবে উভয়ের জন্যে।

এরপর দু'বছর কেটেছে। বিরহের এবং কঠোর সংযমের দুটি বছর। সহস্র প্রলোভনময় বন্দরে বন্দরে কাজ করেও অস্কার কখনো তার পবিত্র শপথ বাক্য থেকে বিচ্যুত হয় নি। কেউ কখনো তার মুখে একটা খিস্তি খেউড় দূরস্থান অশোভন বাক্য পর্যন্ত শোনে নি। আর কেউ কখনো দেখেনি তাকে এক ফোঁটা সুরা জাতীয় পানীয় গ্রহণ করতে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে এমন সুন্দর যুবা পুরুষ বন্দরস্থ গণিকাবৃন্দের অনিবার্য প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করেছে সদাসর্বদা। বিশ্বের যাবতীয় দেশের সুন্দরীরা তাকে চেয়েছে কিন্তু অস্কার ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। যেজন্যে তার জাহাজস্থ নাবিকরা তার নাম দিয়েছিল "পবিত্র ক্যাপ্টেন"।

ইতিমধ্যে 'পিয়ের জোন্স' নামে একটি জাহাজের মালিক হয়ে গেছে সে। বন্দরে বন্দরে মাল উঠা নামা করিয়ে ভাল অর্থ রোজগার করে চলেছে অস্কার। সৎ ও সাধু বলে নাম কেনায় সিডনী, সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি স্থানের বণিককুলের আস্থাভাজন হয়ে উঠেছে সে।

নিজে সৎ কিন্তু তার জাহাজের ফাস্ট মেট ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফরাসীদেশীয় হেনরী ডুফ্লোজ নামক মানুষটি ছিল ঠিক তার বিপরীত স্বভাবের অর্থাৎ চূড়ান্ত বদ। সাউথ-সী অঞ্চলের নামকরা নারী-পিয়াসী চরিত্রহীন ছিল এই হেনরী। জাহাজের মধ্যে সে একজন অতি দক্ষ নাবিক কিন্তু বন্দরে নামলেই লোভাতুর দৃষ্টিসম্পন্ন নেকড়ে বিশেষ। তার সময় কাটতো এক শোবার ঘর থেকে অপর শোবার ঘরের দুরন্ত ও বেপরোয়া অভিযানে। কতবার যে অস্কার নিয়েলসেন গিয়ে হেনরীকে ক্রুদ্ধ স্বামীকুল এবং অগ্নিশর্মা পিতা বা মারমুখী গুণ্ডা ভাইয়েদের হাত থেকে ওকে বাঁচিয়ে এনেছে তার স্থিরতা নেই।

কত বোঝাতো। আমাকে দেখো। কোনো নারীর পানে মুখ তুলে চাই না। পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করছি। আমি যেদিন গীর্জায় যাব সেদিন থেকে শুরু হবে আমার নারী সান্নিধ্য।

ঠোঁট উলটে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হেনরী বলতো, বন্ধু তুমি জানো না কি তুমি হারাচ্ছ। ভাবলে দুঃখ হয় কি সাংঘাতিক অপচয় করছ তুমি দুর্লভ যৌবনের।

কিন্তু চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী।

এর পর ঘটলো সেই ভয়াবহ ঘটনাটা।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে 'পিয়ের জোল্স' জাহাজ নিয়ে সিডনী থেকে অস্কার চললো সলোমন দ্বীপপুঞ্জের দিকে। উক্ত স্থানটি যদিও বেশ লাভজনক ব্যবসাস্থল তবে অতীব বিপদসংকুল স্থান সন্দেহ নেই। অবশ্য নিউজিল্যাণ্ডস্থিত ব্রিটিশ নেভি এর কিছুসংখ্যক দ্বীপে টহল দিয়ে ফেরে বটে তবে অধিকাংশ দ্বীপেই বাস করে ভয়ংকর নরখাদক জংলীরা।

যেখানে বাঘের ভয়··· সেই বৃত্তান্ত। না হলে অস্কারের জাহাজ 'পিয়ের জোল্স' এসে এমন এক চড়ায় বজ্র আটনে আটকালো যাব লাগোয়া দ্বীপটি ভয়ংকর নরখাদক জংলীদের দ্বারা অধ্যুষিত।

রাত্তিরে এই অঘটন। সমস্ত নাবিকদল সহ অস্কার রাতভর প্রাণপণ চেষ্টা করল জাহাজকে বালির চড়া থেকে নামাতে। ব্যর্থ হল সকল প্রচেষ্টা। পরদিন সকালেই নরখাদক জংলীদের দ্বারা আক্রান্ত হল ওরা। অনিবার্য বিপত্তি।

অস্কার ও নাবিকদল যথাসাধ্য বাধা দিল। দৈত্যকায় অস্কার একাই ডজন দুই জংলীদের বধ করে ফেললো। কিন্তু শত্রুসংখ্যা অজস্র, ওরা মুষ্টিমেয়। অতএব একসময় নরখাদকদের প্রহারে জর্জরিত হয়ে জ্ঞান হারালো অস্কার ও তার সঙ্গীদল।

যখন জ্ঞান ফিরলো তখন রাত। হাত পা বাঁধা এবং শুয়ে আছে অস্কার ঘাসের উপর কতগুলো গাছের দিকে মুখ করে। পেছনে কোথাও অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, তার কাঁপা কাঁপা আলো এসে গাছপালাকে উদ্ভাসিত করে তুলছে। আর নাকে আসছে মাংস রোস্ট করা এক অদ্ভুত গন্ধ।

পাশে থেকে কে যেন ক্ষীণ কণ্ঠে ফিস ফিস করে কি বলছে। ঘাড় ফিরিয়ে অস্কার দেখলো তারই জাহাজের অস্ট্রেলীয় কেবিন বয় হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে সেখানে।

—ভয় নেই রে, অস্কার কেবিন বয়কে উদ্দেশ্য করে বলে—ওরা আমাদের থাবার ব্যবস্থা করছে মনে হয়। রোস্টের গন্ধ পাচ্ছিস না।

প্রায় কেঁদে উঠল কেবিন বয়, হায় হায় স্যার ওটা আমাদের থাবার নয়। ওরা মঁসিয়ে হেনরি ডুক্রোজকে আগুনে পোড়াচ্ছে। থাবার জন্যে।

—অঁ্যা! চরম আঁতকে উঠলো অস্কার। সর্বনাশ। এই শুরু। এই অসহনীয় ভয়াবহ ঘটনা চললো পুরো দু সপ্তাহ ধরে, একে একে তার জাহাজের প্রতিটি নাবিককে হত্যা করে, পুড়িয়ে খেয়ে ফেললো ঐ ভয়ংকর নরখাদকের দল। প্রতি রাত্রিতে চলল এই বীভৎস নারকীয় কাণ্ড কারখানা।

দিবাভাগে প্রায়শঃই নরখাদক জংলীদের সর্দার এসে আগাপাশতলা তীক্ষ্ণ নজরে দেখতো এই দৈত্যাকায় বন্দী স্বর্ণকেশী সুপুরুষ মানুষটাকে। কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো নীচু হয়ে কখনো হাঁটু গেড়ে বসে সর্দার যেন সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে দেখতো এই শ্বেতাঙ্গ অপরূপ মানুষটিকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতো এই ভাবে।

ব্যাপার কি? অস্কারের কাছে এ এক পরম বিস্ময়। তাকে রসিয়ে রসিয়ে থাবার জন্যেই কি এই ভূমিকা। সর্দার পরম আদরে তাকে থাদ্য খাওয়াবার চেষ্টা করত। কিন্তু অস্কার ভয়ে কিছু দাঁতে কাটতো না। কে জানে তারই জাহাজের কোন নাবিকের মাংস হয়ত তাকে খেতে দেওয়া হচ্ছে। ফলমূল ছাড়া আর কোন আহার্য সে গ্রহণ করল না।

অবশেষে যখন অপরাপর নাবিকদের কচমচ করে খেয়ে ফেললো জংলীরা, তখন সবেধন নীলমণি রইল অস্কার। ওকে কেন খেয়ে ফেললো না নরখাদকরা সেটা অবশ্য পরে বোঝা গেল।

এবার অস্কার-এর হাত-পা-র বাঁধন খুলে দেওয়া হল। আর তাকে করে দেওয়া হল সম্পূর্ণ বিবস্ত্র।

বিপুলকায় এই নরওয়েবাসী অস্কার মরতে ভয় পায় না আদৌ, কিন্তু তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে রোস্ট করে খাবে একথা ভাবতে গিয়েও শিহরিত হয়ে উঠলো। কি সাংঘাতিক ভয়ংকর।

এই জঘন্য মৃত্যুর কথা ভাবতে গিয়ে সহসা ক্ষেপে যায় অস্কার। তার প্রহরীকে আচমকা মারে এক ঘুষি। কিন্তু জংলী প্রহরীর হাতে ছিল গদা। তারই প্রচণ্ড আঘাতে ফের কাবু করে ফেলল অস্কারকে সে।

অর্ধচেতন অবস্থায় অস্কার টের পেল তার গলায় একসময় লোহার এক বকলস (যেটা ছিল তারই জাহাজের মাস্তুল বেষ্টনী) পরিয়ে দেওয়া হল।

লোহার চেন তাতে বাঁধা। অতঃপর এক তীক্ষ্ণ বর্শা পিঠে ঠেকিয়ে তাকে প্রথমে দাঁড় করানো হল, পরে কুকুরের মতন শেকল টেনে তাকে নিয়ে যাওয়া হল গভীর জঙ্গলের মধ্যে। সবচেয়ে অস্বস্তিকর হল তার উলঙ্গ অবস্থা। নিজ দেহপানে সে চাইতে পর্যন্ত পারছিল না।

তারপর তাকে এই শোচনীয় অবস্থায় ঘোরানো হল একাধিক গ্রামে। সে যেন একটা বিরল ও আজব জন্তু, তাকে শেকলে বকলসে বেঁধে প্রদর্শন করে নিয়ে চলেছে গ্রামে গ্রামে। আবালবৃদ্ধবনিতা জংলীর দল ভিড় করে সকৌতূহলে এই লালচুলওয়ালা শ্বেতাঙ্গ এবং বিবস্ত্র মানুষটিকে দেখতে লাগলো।

সবই বুঝি সয়ে যায়। এটি কল্পনায় ছিল যে তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় মানুষের (তা সে সভ্য বা অসভ্য যাই হোক না কেন) সম্মুখীন হতে হবে! নিদারুণ অস্বস্তির প্রথম দিককার ভাবটা ক্রমশঃ চলে গেছে। অনুভূতি যেন বোঁদা হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। যা খুশী করুক, পরোয়া নেই।

এক সময় সে এসে পৌঁছলো পাহাড়ের ওপর জংলী সর্দারের গ্রামে। তাকে একটা 'কাউই' গাছের সঙ্গে শেকলে বাঁধা হল। কিছুক্ষণের মধ্যে জনমানবশূন্য হয়ে গেল ওর চারপাশ। এগিয়ে এল ওদের সর্দার কাবাকিয়া স্বয়ং এবং সেই আগের মতো বিমুগ্ধ বিস্ময়ে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো শ্বেতাঙ্গ বন্দীর নিরাবরণ আগাপাশতলা।

এরপর এক জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে অস্কার যখন শুয়েছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে সহসা কি এক পায়ের শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কে যেন ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

ক্রমে ক্রমে মূর্তিটা যখন ছায়া ছেড়ে জ্যোৎস্নায় এসে পড়লো, চমকে উঠলো অস্কার। আরে! এ যে হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে তার পানে এগিয়ে আসছে সুন্দরী এক নেটিভ যুবতী। জংলী যুবতী!

সেই ঈষদুষ্ণ জুঁই-এর গন্ধভরা জ্যোৎস্না রাতে তার কাছে এগিয়ে এল কিনা এক সুন্দরী জংলী কন্যা। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, সেই রূপবতী কন্যার কেশরাশিতে কিছু সাদা জংলী ফুল ছাড়া আর তার দেহে কোন প্রকার আবরণ নেই। মেয়েটিও সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা। সংকোচে যেন কুঁকড়ে গেল উলঙ্গদেহী অস্কার নিয়েলসেন। একি স্বপ্ন, না সত্যি।

জংলী যুবতী একেবারে ওর কোলের কাছে এসে উপস্থিত হল। মুখে তার বিচিত্র মাদকতাময় অর্থবহ হাসি আর চোখে অবৈধ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। মদালসা কামনা ফেনিল দৃষ্টি।

প্রায় মিনিট দুই সম্মোহিত প্রাণীর মত অস্কার দেহাভ্যন্তরে রক্তের তোলপাড় চাঞ্চল্য নিয়ে তাকিয়ে রইল অদম্য যৌন আবেদনময়ী এই পূর্ণাঙ্গ যুবতীর বিবস্ত্র দেহবল্লরীর পানে। আশ্চর্য জংলী মেয়েটার কৃষ্ণকেশ জ্যোৎস্নার প্লাবনে যেন সোনালী মনে হচ্ছে। আর—আর ওর জলপাই রাঙের গাত্রবর্ণ যেন মাখনের মত হয়ে গেছে, হুবহু তার সেই জন্মভূমি নরওয়েবাসিনী প্রিয়া হার্থারের রূপ ধারণ করেই এই জংলী কন্যাটি এসেছে তার কাছে অভিসারে।

সমস্ত অতীত তার শপথবাক্য ও একনিষ্ঠতা নিয়ে প্রচণ্ড এক কামতাড়নায় ভেসে গেল। এক ঝটকায় জংলী যুবতীকে অস্কার বুকে টেনে নিয়ে গভীর আলিঙ্গনাবদ্ধ করে ফেললো। জ্যোৎস্না রাত নিমেষে মদির হয়ে গেল।

একটানা দু সপ্তাহ ধরে এই সুন্দরী কন্যাটি প্রতি রাতে এল ওর কাছে। তারপর অভিসারিকা বদল হল। এল অপর একটি রূপসী কন্যা। দ্বিতীয়া প্রথমার চেয়েও উদগ্র যৌবনা এবং সমধিক আকর্ষণীয়া।

নায়িকা বদল হতে লাগলো এই ভাবে অজ্ঞাত এক কারণে। তৃতীয়া এল। সে দ্বিতীয়ার চেয়েও মধুরা এবং কলাবতী। আবার এক সময় এল চতুর্থী, তৃতীয়াকেও হার মানিয়ে শারীরিক চাতুর্যে।

এইভাবে চললো এক, দুই, তিন, চার···নয়···বারো···

দীর্ঘ নয় মাস এইভাবে অতিবাহিত হবার পর সর্দার কাবাকিয়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট একমাথা লাল ঝাঁকড়া চুল সমন্বিত তামাটে রঙের এক বাচ্চা কোলে নিয়ে একদিন অস্কারকে দেখতে এল।

আর তখনই নরওয়েবাসী এই রূপবান অস্কারের বোধগম্য হল অবিরাম অভিসারের উদ্দেশ্য। এই জংলী উপজাতীর মধ্যে নতুন রক্ত প্রবাহিত করে নতুন সন্তান উৎপাদনের ব্যাপারে তাকে কাজে লাগানো হয়েছে এই অভিনব প্রক্রিয়ায়।

পরে সে হিসেব করে দেখেছিল যে ঐ জংলীদের গ্রামে তার দীর্ঘ পাঁচ বছরের বন্দীদশায় সে একশ'র উপর সন্তানের পিতৃত্বের অধিকারী হয়েছে।

হয়ত এই অস্কার নিয়েলসেনকে ঐ জংলীদের হাতে বকলস গলায় শৃংখলাবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু বসবাস করে যেতে হত বন্দী অবস্থায় যদি ম্যালেইটার তীরভূমিতে সেই ঘটনাটি না ঘটতো।

অভিযানকারী একদল ব্রিটিশ নৌ-সেনাদল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত দ্বীপের তীরভূমিতে অবতরণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিতে নেটিভদের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে

আক্রান্ত হয়। বহু ইংরেজ নিহত হয়, বাদবাকি কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে নিউজিল্যাণ্ডে গিয়ে এই ভয়াবহ ঘটনার রিপোর্ট করে।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আর কালবিলম্ব না করে উক্ত অঞ্চলের একনায়ক সর্দার কাবাকিয়াকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে খতম করবার উদ্দেশ্যে ম্যালাইটা অভিযানের জন্য সৈন্য পাঠায়।

বিরাট একদল নাবিক ও নৌ-সেনা পিস্তল, তরবারি, প্রকাণ্ড দা এবং রাইফেল নিয়ে অবিলম্বে সেখানে অবতরণ করে বর্শা নিক্ষেপকারী জংলী নেটিভদের পুনরায় জঙ্গলের অভ্যন্তরে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে।

অবশেষে সশস্ত্র আক্রমণ যখন পাহাড়ের উপর সর্দারের নিজ গ্রামের দিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করে তখন চতুর কাবাকিয়া সর্দার, অস্কারের গলায় বকলস থেকে শেকল খুলে তাকে মুক্ত করে, নীচে ইংরেজদের দিকে পাঠিয়ে দেয়।

তার এই চতুর কৌশল সত্য সত্যই কার্যকরী হল। ইংরেজরা এই বিশালকায় সুন্দর শ্বেতাঙ্গ যুবককে উলঙ্গ এবং কণ্ঠে লৌহ বকলস আঁটা অবস্থায় এখানে দেখে এতই বিস্ময়াভিভূত হল যে তারা অস্কারকে নিয়ে ফিরে চলে গেল নিউজিল্যাণ্ড-এ।

সেখানে বলাবাহুল্য, সীমাহীন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল এই নরওয়েবাসী যুবক। সে যেন মৃত্যুপুরী থেকে ফিরে এসেছে; তার উপর শোনা গেল প্রতি রাতে কিনা নিত্য নতুন যুবতী নিয়ে…তার দারুণ এই মুখরোচক আজব কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর নিউজিল্যাণ্ডের উইকলি জার্নালের বিরাট শিরোনামায় সংবাদ বের হল:

'নরখাদকের কবল থেকে বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট এক নাবিক ক্যাপ্টেনের নাটকীয় কাহিনী।'

সংবাদে প্রকাশ যে সলোমন দ্বীপপুঞ্জে মিলিটারীরা অভিযান চালিয়ে 'পিয়ের জোল্ম' নামক জাহাজের একমাত্র জীবিত ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করে নিয়ে ফিরে এসেছে।

ক্যাপ্টেনের নাম অস্কার নিয়েলসেন। পাঁচ বছর ম্যালাইটাতে স্থানীয় নরখাদক জংলী উপজাতিরা তাকে বন্দী করে রেখেছিল। জাহাজের অপরাপর সমস্ত নাবিকদের জংলীরা হত্যা করে খেয়ে ফেলেছে।

ক্যাপ্টেন নিয়েলসেন এই জঘন্য অপমৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছে শুধুমাত্র তার সোনালী কেশরাশির জন্য। এই জংলীরা ইতিপূর্বে স্বর্ণকেশ সম্পন্ন কোন

শ্বেতাঙ্গকে চর্ম চক্ষে দেখেনি। তারা এই অস্কারকে একজন দেবতা হিসেবে ধরে নিয়েছিল।

তার সঙ্গে খুবই সশ্রদ্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। আর জংলী উপজাতির সেরা সেরা যুবতীদের সঙ্গে তার নিয়মিত "বিবাহ" দেওয়া হয়েছিল পাঁচ বছর ধরে।

এই উল্লেখযোগ্য মানুষটাকে দেখবার জন্য অকল্যাণ্ডের বেডফোর্ড হোটেলে কাতারে কাতারে জনসমাগম হচ্ছে।

দুঃস্বপ্নই বলো আর সুখস্বপ্নই বলো, তা শেষ হয়েছে, এবার ফিরে চল আপন ঘরে। গৃহগত প্রাণ উতলা হয়ে উঠেছে অস্কারের। প্রণয়িনী হার্থার জন্য মন আকুলি-বিকুলি করছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সে নিউজিল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া রওনা হল দেশে যাবার উদ্দেশ্যে। সেখানেও সে সংবাদপত্রের এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ বিশেষ হল।

কিন্তু এক চরম শক্ অপেক্ষা করছিল তার জন্যে সিডনী বন্দরে। অস্কার যখন নরওয়ে যাবার জন্য এক জাহাজে টিকিট কেনবার ব্যবস্থা করছে তখন সেখানে স্বদেশীয় এক পরিচিত নাবিকের মুখে সেই সর্বনেশে সংবাদটি পায়। তার প্রণয়িনী হার্থা নাকি ইতিমধ্যে অন্য একজনকে বিয়ে করে বসেছে। সেকি! বজ্রঘাত হল অস্কারের মাথায়। না, না…

হার্থা, তার প্রিয়া, লাজুক নম্র সেই মেয়েটি, যে কিনা শপথবাক্যে আবদ্ধা ছিল, সেই কিনা…শোনা গেল হার্থা অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত খবরাখবর না পেয়ে ভেবে নিয়েছিল যে অস্কার আর বেঁচে নেই, মরে গেছে। তাই আর অপেক্ষা না করে তার পেছনে লেগে থাকা দ্বিতীয় এক প্রেমিক যুবককে গলায় মাল্যদান করেছে। আরেকটি সংবাদ শুনেও যারপরনাই ক্ষুব্ধ হল অস্কার। ইতিপূর্বে একটি ফার্ম কেনার জন্য পাঠানো তার টাকা নাকি হার্থা তার নতুন স্বামীর ব্যাপারে ব্যয় করে ফেলেছে।

প্রথম শক্ কেটে যাওয়ার পর অস্কারের মনে হল হার্থার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে ভালই হয়েছে। কেননা হার্থা ছিল এক অলীক স্বপ্নের মতো রক্তহীন নায়িকা। তার চেয়ে সেই নরখাদকদের জংলী যুবতী সুন্দরীরা অনেক বেশী বাস্তব অনেক বেশী মনোরম অনেক বেশী সুস্বাদু। তাদের সান্নিধ্যে সে স্বর্গীয় উষ্ণতা অনুভব করেছে।

সেই মুহূর্ত থেকে সাউথ সী'তে যাবার জন্য মন তার সাংঘাতিক ব্যাকুল হয়ে উঠল। দেশে যাওয়ার টিকেট ক্যানসেল করে দিল সে। বেশ কিছু অর্থ ঋণ

করে একটি স্কুনার জাহাজ ক্রয় করে কিছু নাবিক সংগ্রহের পর যাত্রা করল নিউ হেব্রাইডিস-এর দিকে, শুনেছিল সেখানকার তরুণীকুল নাকি যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী তেমনি লাস্যময়ী।

সত্যিই তাই। এই দুরন্ত রূপবান নরওয়েবাসী যুবক তীরে নামবার সঙ্গে সঙ্গে মধুমক্ষিকার মত পলিনেসিয়ান রূপবতী যৌবনবতী কন্যারা ওকে পাবার জন্য যেন লাইন দিল। চৌত্রিশ বছরের বলিষ্ঠ নওজোয়ান অস্কার এখন নারীঘাতী প্রেমিকে পরিগণিত হয়ে গেছে। কাউকে আর সে সজ্ঞানে ফেরালো না।

জাহাজ মালে ভর্তি হল অথচ অস্কারের ব্যবসায়ে মন নেই। সে ফের সিডনীতে ফিরে যেতে নারাজ হয়ে অধস্তন নাবিকদের দিয়ে জাহাজ পাঠিয়ে দিল অষ্ট্রেলিয়া।

সে হয়ে বসলো সুন্দরীদের আবাসস্থল মনোরম ক্ষুদ্র দ্বীপ মালেকুলা নামক স্থানের "রাজা"।

পাকা ছয় বছর অস্কার নিয়েলসেন সেই আগ্নেয় দ্বীপে অগ্নির মত দুর্দান্ত যৌন জীবনযাপন করে লাল ও সোনালী চুল সমন্বিত প্রায় ১৫০টি ছেলে মেয়ের পিতৃত্ব লাভে ধন্য হল।

সমস্ত দ্বীপটির একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে ক'বছর রাজকীয় মধুর জীবনযাপন করল এই শ্বেতাঙ্গ মানুষটি। স্থানীয় পুরুষগুলি তার পিস্তল ও ঘুষির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে কুকুরেব মত রইল। আর তাদের মেয়েদেব নিয়ে ছিনিমিনি খেলে পঞ্চশরের যৌবন ঢলঢল দিন ও রাত্রি কাটিয়ে গেল সৌভাগ্যবান অস্কার।

কিন্তু একটানা সুখ বুঝি মানুষের ভাগ্যে লেখা নেই। কুকুর-বশ্য নেটিভ পুরুষগুলি মনে মনে অনিবার্যভাবেই ঘৃণা তথা শত্রুতা পোষণ করত এই দৈত্যাকায় শ্বেতাঙ্গ পুরুষটির প্রতি। শুধু পুরুষরা নয়, অপর সুন্দরীদের জন্য অবহেলিতা কিছু নিকৃষ্টা যুবতীও তীব্র শত্রু হয়ে উঠেছিল ওর।

ঐ মালেকুলা দ্বীপে একদিন সুপ্ত আগ্নেয়গিরি সজীব হয়ে তপ্ত লাভা উদ্গীরণ শুরু করল। এবং তখনই অস্কার নিয়েলসেন-এর ভবলীলা ভয়ালভাবে সাঙ্গ করে দিল স্থানীয় কিছু নরনারী।

এ সংবাদ পাওয়া যায় রিক ভ্যাণ্ডারসন নামক জনৈক ওলন্দাজ জাহাজের ক্যাপ্টেনের লগবুক মারফৎ। অগ্ন্যুৎগীরণের সময় উক্ত ক্যাপ্টেন চারজন সঙ্গীসহ উক্ত মালেকুলা দ্বীপে উপস্থিত ছিল।

এই ক্যাপ্টেন অস্কারকে তাদের সঙ্গে ঐ দ্বীপ পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করে প্রত্যাখ্যাত হয়।

অস্কার বলেছিল, না, না, এই অগ্ন্যুৎগীরণে কোন ভয় নেই। ইতিপূর্বেও হয়েছে এবং লাভাস্রোত নীচে গ্রাম পর্যন্ত এসে আদৌ পৌঁছয়নি।

ভাল কথা।

ওলন্দাজ ক্যাপ্টেন অগত্যা নিজ জাহাজে করে ঐ দ্বীপ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়েছে। সরে গিয়ে অবশ্য সুবুদ্ধির কাজই করেছিল।

আগ্নেয়গিরি অচিরেই ক্ষণে ক্ষণে আরো উত্তাল হয়ে প্রচণ্ড অগ্নি, ছাই ও কালো ধোঁয়া উদ্গীরণ করে আকাশ বাতাস ভরিয়ে ফেললো। টানা এই ভয়াবহ অগ্নির খেলা চললো তিন দিন তিন রাত্রি ধরে। চতুর্থ দিনে থেমে শান্ত হয়ে গেল আগ্নেয়গিরি!

ওলন্দাজ ক্যাপ্টেন তখন সদলে নৌকো করে ফের সেই দ্বীপে যায়। আগ্নেয়গিরি যথেষ্ট ক্ষতি করলেও তীরভূমি অঞ্চলের গ্রামসমূহের কোন ক্ষতি করতে সমর্থ হয়নি। হতাহতও সেখানে বড় একটা কেউ হয়নি।

কিন্তু অস্কারকে সেখানে কোথাও পাওয়া গেল না। সে যেন একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করাতে নেটিভরা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে তাচ্ছিল্যের ঠোঁট উল্টে জানায় যে অগ্ন্যুৎপাতে অস্কার নাকি মারা গেছে।

কিন্তু এ কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না ওলন্দাজ ক্যাপ্টেনের। কেননা অস্কার যেখানে বাস করত সে স্থানের বহু দূর পর্যন্ত স্থানেও লাভাস্রোত স্পর্শ করেনি। এসে পৌঁছয়নি।

—বেশ তো ওর মৃতদেহই বা কোথায়?

নেটিভরা জমে প্রস্তরিভূত লাভাস্রোতের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে। ঐ লাভাগ্নির তলায় নাকি মৃতদেহ ডুবে গেছে।

কিন্তু আসল সত্য প্রকাশিত হল অস্কারের জনা কুড়ি তথাকথিত "পত্নী"দের শোকাকুল ক্রন্দনের মারফৎ। তারাই সব ঘটনা ফাঁস করে দিল।

শোনা গেল, যখন অগ্ন্যুৎপাত জোর কদমে শুরু হল তখন শত্রুভাবাপন্ন নেটিভরা সবাইকে বোঝালো এই ভয়াবহ দুর্দৈব শুরু হয়েছে একমাত্র অস্কারের পাপে। দেবতারা রেগে গিয়ে আগ্নেয়গিরিকে লেলিয়ে দিয়েছে তাদের সর্বনাশের জন্য।

অতএব দেবতাদের রুদ্র রোষ প্রশমিত করবার জন্য এই শ্বেতাঙ্গ পাতককে অবিলম্বে আগ্নেয়গিরিতে উৎসর্গ করতে হবে।

এত সব কথা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি অস্কার। সে তখন তার 'নব-পত্নী'কে নিয়ে সুখ স্বপ্নে ব্যস্ত। সে বা তার প্রণয়িনী প্রিয়া টের পায়নি কখন শত্রুরা তাদের অন্ধকার শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করেছে নিঃশব্দে।

আচমকা একটি গদার প্রচণ্ড আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো রক্তাক্ত অস্কার।

সেই অচৈতন্য অবস্থায় তাকে বয়ে নিয়ে গেল লোকগুলো আগ্নেয়গিরির কাছে এবং তাকে তপ্ত লাভাস্রোত যে পথে আসে সে পথে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল।

তক্ষুণি বুঝি জ্ঞান ফিরে এসেছিল হতভাগ্যের, বুক কাঁপা আর্তনাদ করে উঠল চরম আতঙ্কে। পরক্ষণেই টগবগে লাভাস্রোতের তরল অগ্নির মধ্যে মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তার বিপুলকায় রমণীমোহন দেহ···

এইভাবে "ক্যাপ্টেন পিউরিটি" নামে একদা খ্যাত, যে কিনা পরবর্তীকালে স্বখাত সলিল রূপ কামনার জালে আটকে গিয়ে অকল্পনীয় অপঘাতে মৃত্যুবরণ করলো, সেই অস্কার নিয়েলসেন-এর জীবনে যবনিকাপাত নেমে এল।

সে গেছে কিন্তু তার বংশধরেরা আজও বিরাজ করছে সাউথ-সীর দিকে দিকে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষাভাষি হয়ে। তার শত শত পুত্র কন্যারা তাদের পিতৃ পরিচয় "অস্কার" রূপে খ্যাত হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রের বন্দরে বন্দরে শহরে নগরে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফিরছে।

ডাক্তার বর্গের আজব ক্লিনিক

ইয়োরোপের শহর নগরের মধ্যে, জেনেভাই হল একমাত্র প্রাচীন শহর, যেখানে আভিজাত্যের প্রতি সর্বাধিক সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। ওখানকার সুখী সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত স্বাস্থ্যবান নাগরিকগণ সদাসন্তুষ্ট জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সেক্স অর্থাৎ যৌবনবিষয়ক কোন কিছু যদি বা কদাচিৎ প্রকাশ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায় তো তাকে সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে সরিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেক্স সংক্রান্ত অশোভন সবকিছুকেই এদের ভদ্র সম্ভ্রান্ত মানসিকতা কখনো বরদাস্ত করে না।

এ হেন রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন সুইস নগরী জেনেভা সেদিন প্রকৃতই চমকে উঠলো, শক্ পেল, যেদিন সেই ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের এক বসন্তকালে সেখানে এসে উদয় হল তথাকথিত "প্রফেসর" হোরেস ক্যাসপার বর্গ নামক এক ব্যক্তি। কেউ জানে না যে এই লোকটি মার্কিন দেশের প্রখ্যাত সিংসিং ও অপ: :পর কম প্রখ্যাত কারাগারসমূহের প্রাক্তন একজন কয়েদী।

শুধু এল না, এসে এই "প্রফেসর" এই ভদ্র জনাকীর্ণ নাগরিকদের মধ্যে সেক্সকে তার লুক্কায়িত গুপ্ত স্থান থেকে টেনে বের করে এদেশের যাবতীয় সংবাদপত্রের শিরোনাম করে ছেড়ে দিল।

প্রফেসর বর্গ। বয়েস বছর পঁয়ত্রিশ, মুখে ভ্যানডাইক মার্কা ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, ঈগলের মত তীক্ষ্ণ তীব্র অনুসন্ধানী দুটি চোখভরা দৃষ্টি। জোঁকের মত একজোড়া ভ্রূ। ডবল ব্রেস্ট বিজনেস স্যুট পরা এই লোকটিকে দেখলে একটি আস্ত শয়তান ছাড়া কিছু মনে হয় না।

অচিরেই এই মিঃ বর্গ এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে, একথা জানিয়ে দিল যে সে ৮নং প্লেস ডি বাগু´ইস-এ একটি অভিনব 'ম্যারেজ কাউন্সেলিং সার্ভিস'-এর অফিস খুলছে।

স্থানীয় সাংবাদিকরা বিস্মিত। এটা হবে কি ধরনের 'সার্ভিস'? বলছি বলছি, সবই খুলে বলছি মশাইরা। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে মিঃ বর্গ বলে যায়, দেখুন, সেক্সই হল দুনিয়ার যাবতীয় ঝঞ্ঝাটের মূল। তাই, আমার থিয়োরী হল, ভুয়া সতীত্ব, মিথ্যে লজ্জা সংকোচ, এবং প্রেম প্রণয় কামের প্রতি শিশুসুলভ

মনোবৃত্তি অধিকাংশ নরনারীর জীবনকে বিফল করে তোলে, ফলে তারা শারীরিক অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং সর্বোপরি তারা প্রায় ক্ষেত্রেই আত্মহত্যার জঘন্য প্রক্রিয়ায় মেতে উঠে প্রাণ বিসর্জন দেয়। বলে প্রফেসর বর্গ বিরাট এক চুরুট ধরিয়ে প্রবলবেগে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মিটিমিটি হাসতে থাকে সাংবাদিকদের পানে তাকিয়ে।

লজ্জায় কিছুটা আরক্ত, জনৈক মুখচোরা যুবক সাংবাদিক সসংকোচে বলে উঠে, মানে, মানে আপনি এই ব্যাপারটাকে অর্থাৎ এই সমস্যার কিভাবে সমাধান করবেন? এখানে প্রতিষ্ঠিত আপনার ক্লিনিক-এর উদেশ্যই বা কি হবে?

মিষ্টি বুদ্ধিদীপ্ত হাসি হেসে 'প্রফেসর' বললে, আই অ্যাম গ্ল্যাড যে আপনি এই প্রশ্নটা উত্থাপন করেছেন। এখুনি আমি মিসেস ডরোথি ওয়েনরাইটকে এখানে উপস্থিত কবাচ্ছি। তিনি আমার প্রথম রোগীণীদের অন্যতমাও বটেন। সেই সুখীতৃপ্ত ভদ্রমহিলাই আমার সুইজারল্যাণ্ডে আসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সহকারে অর্থাৎ এক প্রদর্শন মাধ্যমে সব কিছু বিবৃত করবেন আপনাদের কাছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিসেস ওয়েনরাইট এসে সে ঘরে প্রবেশ করল। বার্ন-এর এক তরুণ সাংবাদিক তো সহসা শিস্ দিয়েই উঠল মহিলাটির রূপ দর্শন করে। উপস্থিত প্রতিটি সাংবাদিকই ভদ্রমহিলার দেহসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত এবং উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ল সন্দেহ নেই।

তরুণীর বয়েস সাতাশ আঠাশ। চোখের দৃষ্টি কখনো উদাস, মাদকতাময়, কখনো শূন্য, কখনো তীক্ষ্ণ সন্ধানী। নীল সিল্কের অত্যন্ত আঁটোসাটো গাউনে শারীরিক যাবতীয় আকর্ষণ যারপরনাই পরিস্ফুট হয়েছে যুবতী দেহের। কথা শুনে, গলার স্বর শুনে সাংবাদিকরা চমকে উঠলো। এ কণ্ঠস্বর যেন সারা দেহমনে সুড়সুড়ি দেয়। তবে কি কণ্ঠস্বরেও যৌন আকর্ষণ বিদ্যমান?

—ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আজ মিসেস ওয়েনরাইটকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। বহু ফ্রিজিড (কামশীতল) মহিলার মত ইনিও আমার দ্বারস্থ হয়েছিলেন উপযুক্ত মন্ত্রণা এবং চিকিৎসার জন্য। এই পোর্টফলিওর টাইপ করা তিরিশ পৃষ্ঠার মাধ্যমে আমি ওর কেস্‌টাকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছি। এটাতে পাবেন কিভাবে আমাদের আত্মার সঙ্গে আমাদের প্রাণীজ প্রবৃত্তির সংঘর্ষ অহরহই লেগে থাকে। মাই ডিয়ার ওয়েনরাইট, এবার তুমি উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বল!

অতঃপর সেই তরুণী দ্বিধাহীন ভাষায় সেই অতি ভদ্র সংযত সুইস সাংবাদিকদের কাছে, সুনির্বাচিত ডাক্তারী শব্দ সহযোগে বর্ণনা করে যায় কিভাবে হোরেস বর্গ-এর সুচিকিৎসায় এক উদাসীন, বীতস্পৃহ, বিগতকাম তরুণী থেকে সে চঞ্চল যৌনোচ্ছলা কামনাবতী পূর্ণ যুবতীতে রূপান্তরিতা হয়ে গিয়েছে।

এরপর আরও এমন কিছু তথ্য বলে যায় তরুণী যাতে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখ চোখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। শুধু কথা নয়, অবশেষে 'প্রফেসর' হোরেস বর্গের সঙ্গে লালসাপ্লুত আলিঙ্গনাদির দৃশ্যাভিনয়ের দ্বারা সকলকে নিদারুণ বিব্রত করে তুললো এই মহিলাটি।

জনৈক সাংবাদিক আচমকা এক প্রশ্ন করে বসে যুবতীকে।

—আচ্ছা মিসেস ওয়েনরাইট, জানতে পারি কি আপনার স্বামী কোথায়?

অসংকোচে বলে গেল তরুণী, প্রফেসর বর্গের চিকিৎসার পর দেখা গেল আমার কাছে আমার স্বামী প্রকৃতই অনুপযোগী, অর্থাৎ অক্ষম। তাই স্যার, আমার শারীরিক জাগরণের রূপকার ওই মিঃ বর্গ-এর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ আমি বিবাহ বিচ্ছেদ করে আমার স্বামী, আমার সন্তানাদি সব কিছু পরিত্যাগ করে চলে এসেছি ওর কাছে। যাতে আমার মত যৌনতৃপ্তি অপরাপর ফ্রিজিড নারীরাও লাভ করে, সেই মহান কাজে ওকে সাহায্য করবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি।

সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে বর্তমানে জীবিত ৮৬ বৎসর বয়স্ক অ্যাডালবার্ট গ্রুবার-এর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। অতি বৃদ্ধ পক্ককেশ ক্ষীণদৃষ্টি মানুষটি যখন এ কাহিনী বলছিলেন মনে হচ্ছিল যেন ৬০।৬৫ বছর আগেকার ঘটনা নয়, এই সেদিনকার ঘটনা এটা, সবই তাঁর চোখের সামনে ভাসছে যেন। বলতে বলতে হের গ্রুবার এখনো লাল হয়ে উঠছিলেন।

—দেখুন, এর পর মহিলাটি সেদিন অঙ্গ থেকে অধিকাংশ পোশাক খুলে নিয়ে পরীক্ষা-টেবিলে শুয়ে পড়লেন। আমরা যেন ছাত্র, এমনিভাবে 'প্রফেসার' বর্গ বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় নরনারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও যৌনজীবনের উপর দেহ ও মনের প্রভাব এবং নরনারীর মিলন সংক্রান্ত অজস্র গোপন তথ্য উদাত্ত কণ্ঠে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করে গেলেন। ভদ্রমহিলাও বক্তৃতানুযায়ী প্রয়োজনানুসারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি হেলন ও সঞ্চালনের দ্বারা 'প্রফেসার'-কে সাহায্য করে গেলেন।

বৃদ্ধ গ্রুবারকে প্রশ্ন করা হল, আচ্ছা হের, আপনি কি প্রফেসর বর্গের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করেছিলেন সেদিন ?

বৃদ্ধের মুখ কৌতুকের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ফোকলা মুখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, তা স্যার, সেই তাজা তরুণ বয়সে একটু হয়েছিল বৈকি। পরস্ত্রীদের নিয়ে···। তবে ভদ্রলোকের শেষ পরিণাম দেখে উক্ত মনোভাব আমার নিভে গিয়েছিল। সে পরিণাম বড় ভয়াবহ। অবশ্য ওর ক্ষেত্রে ওই বুক কাঁপানো পরিণামই বুঝি সাধনোচিত ছিল।

আশ্চর্য মানুষ এই হোরেস বর্গ। সুদূর আমেরিকার দিকে দিকে হলদে হয়ে যাওয়া পুরনো কাগজের নথিপত্রে ওর ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কোর্টে কাছারিতে থানায় কারাগারের ফাইলে ফাইলে। বর্গ বিজ্ঞানী নয়, সে একজন প্রবঞ্চক মাত্র। কিন্তু ওর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল স্মৃতিশক্তি ও মেধা। কয়েকখানা ডাক্তারী বই ওর পাতার পর পাতা কণ্ঠস্থ ছিল।

সিংসিং জেলে প্রথম যায় "সাইকো-গাইরো বেল্ট কর্পোরেশন" নামক অস্তিত্বহীন ভুয়া এক কোম্পানির সৌজন্যে। এই কোম্পানির অলৌকিক "বেল্ট" পরিধান করে নাকি অজস্র ক্যানসার ও নিউমোনিয়া রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেছে—এই বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রায় ৪৫,০০০ ডলার মূল্যের তথাকথিত 'বেল্ট' বিক্রি করেছিল সে বিভিন্ন রাজ্যে।

এরপর শিকাগোতে সে সর্বপ্রথম 'ম্যারেজ কাউন্সেলিং সার্ভিস' খোলে। সে সময় থেকেই সে নারীদের কামশীতলতা এবং অপরাপর স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলে নিজেকে জাহির করত। এর জন্য অবশ্য যে প্রকার দারুণ চাতুর্য আর গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন তা এই বর্গ-এর ছিল। ওর চেহারা যদিও সুন্দর আদৌ ছিল না এবং কিছুটা নার্ভাস ধরনের মানুষও ছিল তবু অদ্ভুত বাক্-চাতুর্যেই সে তার সুদর্শন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সদাসর্বদা হার মানিয়ে দিত। বিশেষ করে নারীদের ওপরে তার প্রভাব যেন সম্মোহক প্রভাবের কাজ করত। কিছুদিনের মধ্যেই স্বনির্বাচিত ও স্বনিয়োজিত মেডিসিন, সাইকোলজি এবং ভদ্রসমাজে অনুচ্চারিত নতুন শব্দ 'সেক্সোলজি'র ডাক্তার হয়ে বসলো সে। এবং অচিরেই নাম যশ অর্থ পসার সবই হু হু করে বেড়ে গেল।

এরপর নিজেকে 'প্রফেস'র রূপে অভিহিত করল বর্গ। জনৈক সুরা কোম্পানির মালিক ওটো কেলার-এর স্ত্রী ডরোথী কেলারকে চিকিৎসা করবার পরেই বর্গের নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। উক্ত ৬৪ বৎসর বয়স্ক ওটো

কেলার নাকি স্নায়বিক দুর্বলতা জাতীয় কি সব রোগে ভুগছিল, এ হল তার ২৮ বছর বয়স্কা স্ত্রী ডরোথীর অভিযোগ। অপরদিকে বৃদ্ধ স্বামীর যুবতী স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক মিলনে ডরোথীর ছিল প্রবল অনীহা এবং সর্বোপরি চরম আতঙ্কজনিত এক ভীতিভাব।

ফলে, এই বর্গের অধীনে উক্ত ডরোথী কেলার এমন কয়েকটি পর্যায় ও প্রক্রিয়ায় চিকিৎসিত হতে লাগলো যে সম্পর্কে শহরের বিভিন্ন বার-এ ও বহু ড্রইংরুমে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসাহাসি করে ফিসফিসিয়ে আলোচিত হতে লাগলো অনেক কথা। তিনমাস চিকিৎসান্তে নবজীবন ও নবযৌনজীবন ও যৌবন লাভ করে ডরোথী একদা গিয়ে উপস্থিত হল স্বামীর গৃহে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হবার পরই পুনরায় বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি অব্যক্ত এক ঘৃণায় ডরোথীর উৎসাহ উদ্দীপনা এক ফুঁযে নিভে গিয়ে সে পূর্বেকার মত ফের ফ্রিজিড ওয়াইফ-এ পরিণত হয়ে গেল। ডরোথীও বড় ঘরের মেয়ে, তার বাবা স্বনামধন্য এক ব্যবসায়ী সাইরাস ওয়েনরাইট। কি হল সেদিন রাত্রে, ঘুমন্ত স্বামীকে ডরোথী এক ছুরিকা দিয়ে আক্রমণ করে মারাত্মক জখম করে ফেলল। হাসপাতালে নেবার পূর্বেই প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে স্থবরা ব্যবসায়ী ভদ্রলোক প্রাণত্যাগ করল।

মানসিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে থাকাকালীন ডরোথী ওয়েনরাইট কেলার তার নার্সকে আচমকা আক্রমণ করে তাকে বেঁধে ফেলে। পরে নার্সের পোশাক পরে বাইরে এসে ২০,০০০ ডলার এর চেক ক্যাশ করে তার নতুন প্রেমিক হোরেস বর্গ-এর সঙ্গে নিউইয়র্কের পথে রওনা হয়ে যায় চুপিসাড়ে।

অবশেষে এই যুগল, ১৯০৭ এর ২০শে ফেব্রুয়ারী জাহাজে উঠে ইয়োরোপের পথে পাড়ি জমায়।

এক মহাদেশ ছেড়ে আরেক মহাদেশে এল পরম প্রবঞ্চক একজন হাতুড়ে চিকিৎসক, সঙ্গে নিয়ে পরস্ত্রী-এক সহচরী। শেষের শুরু এখানেই। সুচতুর বর্গ বেছে নিল এমন একটি দেশ যে স্যুইজারল্যাণ্ড হল স্যানিটোরিয়াম, ক্লিনিক ইত্যাদিতে আকীর্ণ এবং যেখানে—সাধারণতঃ আশ্রয় নেয় অসুখী একক নারীবৃন্দ! নিজেকে ডাক্তার বলে জাহির বা দাবি না করে বর্গ শুধু 'বিবাহিত নরনারীর উপদেষ্টা' হিসেবে জেনেভা নগরীতে সুইচ্ আইনকে কদলী প্রদর্শন করে এই অভিনব ব্যবসা শুরু করে দিল।

কুমারী উপাধি 'ওয়েনরাইট' গ্রহণ করে ডরোথী মন্ত্রমুগ্ধার মত এই তথাকথিত 'প্রফেসারের' সঙ্গে একাত্মভাবে লেগে রইল। প্রেমিকা স্বেচ্ছায়

ওকে ১৮,০০০ ডলার দিল অফিস খোলবার জন্য। বর্গ সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে দৃষ্টান্তসহ সব কিছু দেখিয়ে এবং বক্তৃতা করে এই কথাই বুঝিয়ে দিল যে সে যে কোন কামে বীতস্পৃহ ও কামশীতল রমণীকে তার অভিনব চিকিৎসার দ্বারা পুনরায় চঞ্চলা, কামনাবতী ও লালসাময়ীতে রূপান্তরিতা করতে সক্ষম। সেসব কথা ওখানকার সংবাদপত্রাদিতে ফলাও করে মুদ্রিত হল।

এই প্রচারের ফলে অজস্র চিঠিপত্র হু হু করে আসতে লাগলো বর্গের অফিসে। অধিকাংশ চিঠিই এল ইয়োরোপের ডজনখানেক দেশের মহিলাদের কাছ থেকে। তারা তাদের দাম্পত্য জীবনকে ডঃ বর্গের সুচিকিৎসায় পুনর্জীবিত করতে প্রয়াসী। কেন না তাদের মিলিত জীবন যৌন অসঙ্গতির চোরাবালিতে পড়ে ডুবে যাবার দাখিল হয়েছে। এসব পত্রের মধ্যে যেগুলিতে বোঝা গেল লেখিকা ধনী নয়, অর্থাৎ প্রচুর কাঁচা পয়সার মালিক নয়, সেসব চিঠি সঙ্গে সঙ্গে বর্গ ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছিঁড়ে ফেলে দিল।

—এই চিঠিটা পড়ে দেখো ডরোথী, উল্লসিতভাবে ডাঃ বর্গ বলে, এটা এসেছে ওয়ারশ'র ম্যাডাম হেলগা মেরীউইকজ এর কাছ থেকে। চিঠির কাগজ কি দামী দেখেছ? লিখেছে ভদ্রমহিলার স্বামী নাকি ও দেশের একজন বস্ত্রশিল্পী সম্রাট, নাম থ্যাডিয়াস মেরীউইকজ। ভদ্রমহিলা এক্ষুনি আসতে প্রস্তুত আমার এ ক্লিনিক-এ। চিকিৎসার জন্য ইনি ৩০,০০০ জলটিস ব্যয় করতে প্রস্তুত। মাই গড।

সঙ্গে সঙ্গে সে কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিসেব করে দেখলো উক্ত অর্থের পরিমাণ বর্তমান এক্সচেঞ্জ-এর রেট অনুযায়ী দাঁড়াবে প্রায় ৭,০০০ ডলার। প্রথম পেয়িং পেশেন্ট-এর পক্ষে আদৌ মন্দ নয়, কি বল?

ডরোথী তার প্রেমিকের পানে সেই দৃষ্টি নিয়ে তাকালো যা ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট অর্থাৎ কখনো ভাবলেশহীন কখনো ঈর্ষা সন্দেহ ঘৃণায় জীবন্ত, মুখে শুধু বললে, আশা করি মহিলাটি কুৎসিৎ এবং বয়স্কা হবে হোরেস। কেননা তুমি কোন যুবতী নারী বিশেষ করে সুন্দরী রূপসীকে চিকিৎসা কর, এটা সম্পূর্ণ আমার না-পছন্দ। আমি সেকথা চিন্তাও করতে পারি না। বুঝলে ডার্লিং?

ম্যাডাম মেরীউইকজকে দেখা গেল বেশ তন্বী চেহারার অভিজাত, উচ্চবংশীয়া এবং প্রচুর ধনী জনৈকা পোলিশ ভদ্রমহিলা। বাদামী চুল, গালের হাড় কিছু উঁচু। বয়েস ২৪ বছর। এক সন্তানের জননী। বর্গ-এক্স

তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত প্রশ্নে ভদ্রমহিলা লজ্জায় সংকোচে যারপরনাই বিব্রত বোধ করছিল। বর্গ তার প্রাইভেট চেম্বারে সংগোপনেই জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তখন।

—থ্যাডিয়াস, যদিও অধিকাংশ সময় তাঁর ঘোড়া, রেস এবং ক্লাব নিয়ে রাত কাটায়, তবুও তাকে আদর্শ ও ভাল স্বামীই বলব। কিন্তু রাত্রে যখন বিছানায় সে আমার সান্নিধ্যে এগিয়ে আসে, বিশ্বাস করুন, আমি—আমি সাংঘাতিক অস্বস্তি বোধ করি, মানে বিতৃষ্ণায় শারীরিক প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ি বলা যায়। একবার সে আমাকে স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ি, তাতে থ্যাডিয়াস দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে যায়। আরেকবার আমি তার চুম্বন সহ্য করতে না পেরে বাথরুমে পালিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। প্লিজ, মিঃ বর্গ, আমায় আপনি বাঁচান, এ রকম চললে আমাদের বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। অথচ আমার মনে হয়, আমি তো আমার স্বামীকে সত্যিই ভালবাসি, তাহলে, সে যখন আমায় কামনা করে কাছে আসে, তখন কেন মরতে, আমি ওরকম জঘন্য খারাপ ব্যবহার করি!

যদিও সে মোটেই ডাক্তার নয় তবু বর্গ মেডিসিন ও সাইকোলজি বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করে রেখেছিল। ফ্রয়েড তার কণ্ঠস্থ। এসব শুনে সে বাঁ হাত দাড়িতে স্থাপন করে আঙুলের টোকা দিল আর অভিব্যক্তিতে আনলো একটা গুরুগম্ভীর প্রফেসনাল্ পোজ, বললে,—মাই ডিয়ার লেডি। একে আমাদের ডাক্তারী ভাষায় বলে আনরিজল্‌ভ্ ট্রান্সফারেন্স। মানে আপনার মনের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে আপনার হতভাগ্য স্বামী ছাড়া অপর কোন এক ব্যক্তির প্রতি আকণ্ঠ ঘৃণা, যাকে আপনি আদৌ দেখতে পারতেন না, পছন্দ করতেন না।

এইভাবে শুরু করে কঠিন কঠিন ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের কঠিন সব বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় মহিলার কাছে দুর্বোধ্য অনেক কিছু বলে অবশেষে আশ্বাস দিয়ে বর্গ জানালো, মাভৈঃ, হতাশার কিছু নেই, নিরাময়ের পথ এখনো খোলা আছে; এখনো ভয়াবহ মানসিক কোন ক্ষতি হয়ে যায়নি।

ভদ্রমহিলা এতসব গূঢ়তত্ত্ব শুনে প্রায় বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল। পরে সানুনয় কণ্ঠে বললে,—তাহলে এখনো আশা আছে বলছেন? প্লিজ, তাহলে আমায় সাহায্য করুন। যা বলবেন তাই করতে রাজী আমি।

শেয়ালের মত মুখাকৃতি বর্গের মুখে এক অবৈধ হাসি সঞ্চারিত হল, সে উঠে গিয়ে চেম্বারের দরজা নিঃশব্দে লক্ করে দিল। তারপর পোলিশ ভদ্রমহিলা

কিছু বুঝে ওঠবার পূর্বেই দেখা গেল সে এই ডাঃ বর্গের দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় শেঠির ওপর শায়িত হয়ে গিয়েছে। ভেতরে যখন এই আজব চিকিৎসা স্থরু হল, বাইরে তখন অধৈর্যভাবে পায়চারিরতা ডরোথীর পক্ষে ভেতরের কোন কিছু শ্রবণ বা দর্শন করে গুপ্তচরবৃত্তি করবার উপায় রইল না।

আশ্চর্য কাণ্ড, ম্যাডাম মেরীউইকজ এই অবৈধ চিকিৎসায় সত্যি সত্যি পরম তৃপ্তি লাভ করল। মুখ ফুটে বলেই ফেললো, ওয়াণ্ডারফুল আপনি ডাঃ বর্গ। অশেষ ধন্যবাদ। আমি কত বছর পর যে শান্তি পেলাম, তা আর কি বলব। প্লিজ আমায় আপনার ক্লিনিক-এ থাকতে দিন। আমার কত কিছু এখানে শেখবার আছে।

—বেশ ম্যাডাম আপনাকে আমি পেশেণ্ট করে নিলাম, বর্গ প্রফেশনাল পোজ বজায় রেখে জবাব দেয়, যখন চিকিৎসান্তে ফিরে যাবেন, আমি নিশ্চিত যে আপনার স্বামী খুব খুশী হবেন কামনাবাসনাবতী একজন স্ত্রীকে নবরূপে পেয়ে। আমি আমার প্রাথমিক চিকিৎসা প্রক্রিয়ার দ্বারা এ প্রমাণ আপনাকে দিয়েছি যে আপনি মূলতঃ ঠিকই আছেন, নারীত্বের এতটুকু অভাব আপনার মধ্যে নেই, চমৎকার স্থস্থ ও ভোগবতী মহিলা। তবে ঠিক এই ধরনের চিকিৎসার পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তির উপরই নির্ভর করছে সাফল্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্থস্থ হয়ে ওঠা এবং ততদিন আমাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মহৎ স্বার্থে আপনার স্বামীর স্থান সাময়িকভাবে অধিকার করে তাঁরই বকলমে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এসব চিকিৎসা অবশ্য সময়সাপেক্ষ।

—বেশ তো আপনার যত খুশী প্রয়োজন সময় নিন। আপনার চিকিৎসা পদ্ধতি আমার ভাল লেগেছে, বলে ম্যাডাম মেরীউইকজ তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চেক বুক বের করে লডজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ওপর এক বিরাট অঙ্কের চেকে সই করে দিল।

মনে মনে বুঝি প্রফেসর বর্গ কামনা করল যে তার প্রাক্তন জেল-বন্ধুরা এসে দেখে যাক, বুদ্ধিবলে সে কি অসাধ্য সাধন করে চলেছে। দুনিয়ার রূপবতী ধনী যুবতী মেয়েদের ভোগ করছে এবং সেই বাবদে উল্টে তাদের কাছ থেকে প্রচুর আর্থিক দক্ষিণাও আদায় করছে সে। একেই বলে বুঝি ভেলকিবাজি।

জেনেভাস্থ এই ম্যারেজ ক্লিনিকে সবস্থদ্ধ চোদ্দখানা ঘর ছিল। এই আটটি ব্যবহৃত হত তথাকথিত মহিলা পেশেণ্টদের শোবার ঘর হিসেবে, যারা এসে এই "ইনষ্টিটিউট ফর ম্যারিটাল রিসার্চে" নাম লেখাত। রাঁধুনেসহ চারজন

কর্মচারী ছিল। ক্রমে দেখা গেল এতে কুলোচ্ছে না। বর্গের উচ্চাশা হল এমন এক ম্যানসন ভাড়া করার, যেখানে অন্ততঃ চল্লিশজন আবাসিক মহিলা রোগী থাকতে পারে।

বছর খানেকের মধ্যেই বর্গ বুঝতে পারলো যে সে একটি স্বর্ণখনির সৃষ্টি করে ফেলেছে, যা তাকে কাম-শীতলতাগ্রস্ত রোগিণীদের ব্যাপারে রিসার্চ চালাবার অজুহাতে প্রচুর নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করবার সুযোগ করে দিয়েছে এবং ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়িয়ে বাড়িয়ে ১৩০,০০০ স্বর্ণ ফ্র্যাঙ্ক-এ দাঁড় করিয়েছে।

মাঝে মাঝে ঈর্ষাপরায়ণ ডরোথী যে না ক্ষেপে গেছে এমন নয়। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ বিস্ফোরণে সে ওকে ভয় দেখিয়ে শাসিয়েছে এই বলে যে ফের বর্গ যদি মহিলা রোগিণীদের গাত্র স্পর্শ করে তো তাকে কিন্তু সে ভয়ংকর ও সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। কিন্তু বর্গও ছলাকলা বলবীর্যসম্পন্ন পুরুষ। প্রথমে কথায়, পরে কার্য-প্রণালীতে প্রগাঢ় প্রণয়ের অভিনয়ে তার পক্ষে স্বামিত্যাগিনী ডরোথীকে শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তিদানান্তে শান্ত করতে বেশী সময় লাগত না।

পরের জুন মাসে বর্গ তার ক্লিনিককে চ্যাটো ব্রিগুলিয়ারস্থ ৪০ কামরার এক প্রাসাদোপম বাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে এল। নীল জল রোন নদীর সামনে অবস্থিত এই প্রাসাদ থেকে নীচে চতুর্দিকের জেনেভা শহর যেন ছবির মত মনে হত। এখান থেকে তুষারশুভ্র মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক ও তাদের দুটি খ্যাত শীর্ষ চমৎকার দেখা যেত।

বেশ চলছিল। কিন্তু বিধি বাম। ঝামেলার শুরু হল হেলইস স্প্যাগনোস নামক ২৭ বছরের এক মহিলার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। এ মহিলাটি এথেন্স-এর প্রধান জাহাজ-ব্যবসায়ীর স্ত্রী। আঁটোসাটো গড়নের পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী এই মহিলাকে আর যাই হোক 'ফ্রিজিড' বলে আদপেই মনে হয় না। তবে কেন এখানে এসেছে? চোখে-মুখে ক্লান্তি, বোঝা যায় মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা চরম অশান্তি প্রবহমান। অথচ দৃষ্টি বা হাবভাবে তাকে পূর্ণ লালসাময়ী রমণী বলেই মনে হচ্ছে।

বর্গ উৎকর্ণ হল শোনবার জন্য উক্ত মহিলার কাহিনী:

—আমার স্বামী এল্যুথেরিস যদিও আজগুবী রকমের ধনী কিন্তু সে একজন অতি স্থূল রুচিসম্পন্ন মানুষ। কোটি কোটি ডলারের মালিক উপরন্তু তার রয়েছে তিরিশটির ওপর জাহাজ। আমার ওই স্বামীটি নিদারুণ ঈর্ষাপরায়ণ।

আমি যদি তার দেহজ প্রেম-প্রণয়ে সাড়া না দিই তবে সে আমাকে হত্যা করে ফেলবে বলে শাসিয়েছে। কিন্তু জানেন প্রফেসর আমার এই স্বামীটির দেহে কি বিচ্ছিরি ছাগলের বোটকা গন্ধ। লোকটা বিছানায় শুয়ে হাঁসের কাঁচা ডিম ঢকঢক করে খেয়ে ফেলে। সে কামোন্মত্ত লোমশ দেহ নিয়ে যখন আমার দিকে এগিয়ে আসে তখন তাকে মনে হয় কোন বিশালকায় লোমশ গরিলা বিশেষ। ভয়ে আমি এতটুকু হয়ে যাই। অবশ্য ডাইভোর্সের কথা অচিন্ত্যনীয়। তাহলে আমার নিজের পরিবারই আমাকে পরিত্যাগ করবে, ত্যাজ্য করে দেবে। প্লিজ, প্রফেসর আমায় বলে দিন কিভাবে আমি আমার স্বামীর কাছে স্বাভাবিক প্রেমবতী স্ত্রী হতে পারব?

ইতিমধ্যেই প্রফেসর বর্গ তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্ট নিযুক্ত করেছে যারা ক্লিনিকে আসা মহিলাদের তথাকথিত "চিকিৎসা"য় তাকে সাহায্য করে থাকে।

একজনের নাম রাওল স্তি সির, লোকটির ওজন আজগুবী ধরনের, সে একজন টেনিস স্টার। প্যারিসে থাকতে লোকটা নাকি কুখ্যাত পল্লীর পালোয়ানরূপে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম, হেন্ডরিক লুব্বে, আমস্টারডামে এককালে লঞ্চে স্টিমারে কাজ করত। ভ্রাম্যমাণ মেলায় মেলায় মাংসপেশী সঞ্চালন দেখিয়ে ফিরত এই ব্যায়ামবীর মানুষটি। তৃতীয় জনের নাম লুইস ওয়ার্নার, ক্ষীণদেহী একজন ইংরেজ সে। স্মাগলিং-এর অভিযোগে ডার্টমুর-এ একবার জেল খেটেছিল লোকটি।

প্রথমে মনে হয়েছিল রাজযোটক বুঝি। যেমন দেবা, তেমনি দেবী। অর্থাৎ এই গ্রীক রমণী বোধ করি নিঃসীম কামাচারী বর্গ-এর উপযুক্ত দোসর, যোগ্য সঙ্গিনী। কিন্তু কার্যকালে সমুৎপন্নে দেখা গেল সীমাহীন কামনা বাসনার অধিকারিণী এই হেলইস স্প্যাগনোস নামক নারীটিকে তৃপ্তিদান করা বর্গের অসাধ্য। দুঃখের সঙ্গে সে তার এই নতুন পেশেন্টকে ওলন্দাজ লুব্বার হাতে ফেলে রাখলো তিন দিন তিন রাত।

চতুর্থ দিন লুব্বা রণে ভঙ্গ দিয়ে ক্লান্ত কম্পিত দেহে বেরিয়ে এসে বর্গকে নিবেদন করল, মাইনহিয়ার, ভদ্রমহিলা সাংঘাতিক। আমায় ক্ষমা করবেন। ওকে বরং ফরাসী-দাদার দ্বারা 'চিকিৎসা' করান।

সেও চতুর্থ দিনের শেষে হাউমাউ করে এসে নিবেদন করল, মন্-ডিউ! মাফ করুন প্রফেসর। এ ধরনের দ্বিতীয় পেশেন্ট আমার কাছে পাঠালে আমি এ চাকরি ছেড়ে চলে যাব। অকালে প্রাণে মরা পড়ব নাকি স্যার!

ম্যাডাম স্প্যাগনোস নগদ ৪০,০০০ ড্র্যাস্‌মাস্‌ দিয়েছে এ ক্লিনিকে ভরতি ও চিকিৎসিত হবার জন্যে। এটা প্রায় ৮০০০ ডলারের মত। বর্গ বেশ ভড়কে গেল। তার ভুয়া বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং চার চারজন পুরুষ-পুঙ্গবদের সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে এই গ্রীক ভদ্রমহিলার কাছে। গ্রীক কন্যাটি যদিও নিজ স্বামীর কাছে 'কামশীতল' বনে যায়, আসলে সে একজন পরিপূর্ণ নিম্‌ফোম্যানিয়াক। এরপর ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অধিকারী শীর্ণকায় সেই ইংরেজ ওয়ার্নারও বিফল হয়ে হার মেনে অধোবদনে সরে এল ম্যাডাম স্প্যাগনোস-এর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে।

—আপনারা সবাই এখানে জঘন্য প্রবঞ্চক, গ্রীক ভদ্রমহিলা এবার পরম ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জে উঠলো, আমি আমার স্বামীকে জানাচ্ছি আমায় এখান থেকে নিয়ে যেতে। এলিওথেরিস জানে কিভাবে আপনার মত চোরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হয়। আপনি আমার প্রচুর অর্থ খেয়েছেন, পরিবর্তে আপনি ও আপনার ঐ ছোটলোক গুণ্ডা হাড়হাভাতে সহকারীরা আমার এতটুকু শাস্তি দিতে পারেনি।

একজন পরিচারিকাকে ঘুষ দিয়ে মহিলা এথেন্স-এ তার স্বামীর কাছে তার পাঠালো। একথা বর্গ অবশ্য ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। প'বর্তী রোববার সকালে দেখা গেল ঘোড়ায় টানা একটি গাড়ী এসে প্রবেশ করল চ্যাটো ব্রিগুলিয়ার চত্বরে। তা থেকে নেমে এল গাট্টাগোট্টা শক্ত মাংসপেশী-ওয়ালা বুলডগের মত মুখাকৃতি একজন ভদ্রলোক। যদিও পরনে ছিল তার খুবই অভিজাত ও মূল্যবান পোশাক, তবু জামার ফাঁকে, কলারের পাশ দিয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ চুল বেরিয়ে থাকায়, তাকে মানুষের চেয়ে গরিলার মতই দেখাচ্ছিল সমধিক।

আগন্তুক এসেই বাজখাই কণ্ঠে বিদেশী টানে জানতে চাইল সংস্থার মালিক কে?

এই অদ্ভুত আকৃতির লোকটির সামনে এক সময় এসে দাঁড়ালো প্রফেসর বর্গ কিঞ্চিৎ নার্ভাস অবস্থায়, বললে, আমিই হলাম স্বত্বাধিকারী স্যার। আমার নাম বর্গ। হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

—আমার নাম ইলিউথেরিয়স স্প্যাগনোস্‌। তুমি হলে একজন হতচ্ছাড়া জুয়াচোর। আমি এথেন্স থেকে চলে এসেছি আমার স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যেতে। কিন্তু তার আগে প্রথমে আমি তোমায় এমন কিছু দিয়ে যেতে চাই যাতে আজীবন আমাকে তোমার স্মরণে থাকে।

এই বলে গ্রীক জাহাজ-মালিক তার ডান হাতের বজ্রমুষ্টি বর্গের নাকের কাছে হুঁশিয়ারী ভঙ্গিতে নাড়তে লাগলো। আঙুলের গাঁটে গাঁটে তার তীক্ষ্ণধার সূচ্যগ্র পেতলের তৈরি বোতাম লাগানো। সেই শূকরের মত হাতটি প্রথম প্রচণ্ড আঘাত হানলো বর্গের গালে। হাতুড়ে বর্গ সে আঘাতে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়তে তার মাথার পেছনে হাতুড়ির মত ক্রমাগত আঘাত করে গেল গ্রীক বণিক। এর পর আধা অজ্ঞান বর্গের দেহটাকে ফুটবলের মত ড্রিবল করতে থাকল সে।

তিনজন সহকারী প্রাণপণ চেষ্টা করে তবে হোরেস বর্গ-এর রক্তাপ্লুত দারুণ আহত দেহটাকে অগ্নিশর্মা দানব গ্রীক স্বামীর হাত থেকে সরিয়ে আনতে সমর্থ হল।

স্প্যাগনোস্ সরাসরি স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লিনিক ত্যাগ করে চোখের আড়ালে চলে গেল।

উপরতলার এক গবাক্ষপথে জালি পর্দার আড়াল থেকে ডরোথী ওয়েনরাইট উঁকি মেরে সব কিছু প্রত্যক্ষ করল। দেখে শুনে সে যেন খুবই খুশী হল, আনন্দিত হল। ক্লিনিকের কর্মীরা যখন প্রফেসর বর্গের আঘাতস্থল ও রক্তাক্ত স্থানগুলিকে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছিল সে সময় ডরোথীর মুখে ফুটে উঠল এক বিচিত্র হাসি, যার অর্থ হল বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমন ফল।

এই গুরুতর ও লজ্জাজনক প্রহারের ধকল থেকে সেরে উঠতে বর্গ-এর প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগলো। তবে সে দমে যাবার বাচ্চা নয়, সেরে উঠে ফের পূর্ণোদ্যমে পেশেণ্টদের নিয়ে চিকিৎসা কর্মে লেগে গেল।

এরপর এল এক চরম সাফল্য। সাফল্য এল এক নতুন পেশেণ্টরূপে। পেরু-দেশীয় প্রখ্যাত টিন ব্যবসায়ীর উত্তরাধিকারিণী এই বিবাহিত মেয়েটির নাম ডলরেস সিমকো। বর্গ প্রমান করে দিল যে তরুণীটি আদৌ 'কামশীতল' নারী নয়, যা সে নিজে ও তার স্বামী ভেবে নিয়েছিল এতকাল।

একদিন যখন বর্গ গল্‌ফ খেলার নিকার-বোকার পরে, মেয়েটির সঙ্গে প্রেম প্রণয় বিষয়ে আলোচনা করছিল, তখন দেখা গেল ডলরেস যেন কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে এসে গেছে এক চাপা চঞ্চলতা, তার মুখাবয়ব রক্তাভ হয়ে উঠেছে লাজুক লাজুক ভাবে। চতুর বর্গের মনে চট করে এক সন্দেহ এল। সে ফ্রয়েডের শিষ্য। সঙ্গে সঙ্গে সে সাইকোঅ্যানালেসিস পদ্ধতি প্রয়োগ করে মেয়েটির গুপ্তকথা বের করে নিল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

মেয়েটি সসংকোচে স্বীকার করল, যখন তার পনের বছর বয়েস, তখন তার

পিতার গলফের পার্টনার এক ভদ্রলোক তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে তোলে নিকটবর্তী গ্রীন হাউসে। লোকটার পরনে ছিল তখন নিকারবোকার। সে দিনের সেই স্মৃতি কিশোরী মেয়েটির কাছে খুবই রোমাঞ্চকর, জীবনের প্রথম যৌনসংযোগের সুখ-স্মৃতি সে আজও ভোলেনি। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে সে ঘটনাকে অবচেতনের গভীরে চাপা দিয়ে রেখেছিল এতকাল।

বর্গ এর পর নিজে ও সহকারীদের দিয়ে নিকারবোকার পোশাকে মেয়েটির সঙ্গে প্রেম প্রণয়ের বাস্তব অভিনয় করিয়ে চরম সাফল্য লাভ করেছে। অতঃপর সে মেয়েটির স্বামীর কাছে এক পত্রযোগে জানিয়েছে ঃ

প্রিয় সেনর,

সব কিছু প্রকাশ করা সম্ভব নয় অনিবার্য কারণে, তবু বলছি আপনার স্ত্রী খুবই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবতী যৌবনবতী রসিকা এক মহিলা। প্রশ্ন করবেন না, আমার অনুরোধ, এরপর আপনি নাইট শার্টের পরিবর্তে নিকার-বোকার পরিধান করে স্ত্রী মিলনে যাবেন এবং দেখবেন আর কোন বাধা নেই বিপত্তি নেই, নেই কোন হতাশা, অচিরে স্বর্গীয় আনন্দে অবশ্যই বিভোর হয়ে যাবেন দুজনে।

স্বামী ছেলেটি বর্গের কথা রেখে অতীব সুফল পেয়ে এতই আনন্দিত হল যে অবিলম্বে হোরেস বর্গ-এর নামে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ২০,০০০ ডলারের এক চেক লিখে পাঠিয়ে দিল। সে বিপুল অর্থ পেয়ে বর্গ এর চেয়েও বড় এক প্রাসাদে তুলে নিয়ে গেল তার ক্লিনিক।

কিন্তু নেভবার আগেই বুঝি প্রদীপ শিখা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেই বৃত্তান্ত।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাত। প্রফেসর বর্গ তার সুযোগ্য সহকারী তিনজনকে ডেকে সংগোপনে জানালো ডরোথী ওয়েনরাইট-এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সে তাদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী।

—জানো এই স্ত্রীলোকটি একাধারে ভয়াবহ এবং অসহ্য। এক সময় ও আমার কাছে প্রয়োজনীয় ছিল ঠিকই। কিন্তু দিনের পর দিন ক্রমশঃ এ মহিলা তার বিদিকিচ্ছিরি ঈর্ষাপরায়ণ মনের দ্বারা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। জানো, কত বড় আস্পর্ধা, ও আমার পেছনে গুপ্তচরবৃত্তি করছে, আমার চিঠিপত্র খুলে পড়ছে, ক্লিনিকের সমস্ত মহিলা পেশেণ্টদের অযথা অপমান করে চলেছে। ডরোথী আমেরিকা ফিরে যেতে নারাজ, পরিবর্তে আমার ঘাড়ে বসে আমার জীবনকে সে অতিষ্ঠ করে তোলবার পণ করছে।

—প্রফেসার, আমাদের কি করতে বলেন ওকে নিয়ে?

—বলছি শোন। মার্সেলিস বন্দরে এস. এ. ট্রিয়েষ্টি নামে একটি ৭০০০ টনের ছোট জাহাজ নোঙর করে আছে। তার ক্যাপ্টেন আমার জানাশোনা লোক। ৫ই নভেম্বর সে জাহাজ রিও ডি জেনেরো যাত্রা করবে কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজ বোঝাই করে। আমি স্কিপারকে অর্থ দিয়ে রাজী করিয়েছি এই অনিচ্ছুক মহিলা ডরোথীকে যাত্রীরূপে সে জাহাজে নিতে। ব্রেজিলে স্কিপার সহজেই ডরোথীকে যে কোন গণিকালয়ের মালিকের কাছে বেচে দিতে পারবে ভাল অর্থের বিনিময়ে।

এই বলে বর্গ তার অভিনব পরিকল্পনার কথা ওদের বুঝিয়ে বলল, কিভাবে ডরোথীকে স্মাগল্ করে নিয়ে জাহাজে তোলা হবে। তারপর সে বন্দিনী অবস্থায় কিভাবে দক্ষিণ আমেরিকায় পাচার হয়ে বন্দরস্থ গণিকা ব'নে গিয়ে দেশবিদেশের নাবিকদের মনোরঞ্জন করে ইহজীবন কাটাতে বাধ্য হবে।

নভেম্বরের তিন তারিখে বর্গ ও ডরোথী মার্সেলিস বন্দরে পৌঁছে হোটেল ভিক্টর হুগোতে স্বামী-স্ত্রীরূপে নাম লিখিয়ে উঠল। ডরোথীকে বর্গ বলেছে জাহাজের এক ব্যবসায়ে কণ্ট্রাক্টের ব্যাপারে সে তাকে এই বন্দর নগরে এনেছে, এ ব্যাপারে তার পরামর্শও সে চায়। খুশী করবার জন্য বর্গ মহিলাটিকে একটা নীল রঙের কোট কিনে দিল।

সে রাতে বর্গের দিক থেকে প্রণয় সোহাগ যেন একটু বাড়াবাড়ি রকমই হল। এক সময় ক্লান্ত ডরোথী নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো। বর্গের চোখে কিন্তু ঘুম নেই। ত্রস্তে সে উঠে ক্লোরোফর্ম ভেজানো একটি রুমাল চেপে ধরলো ডরোথীর নাকে। প্রথমটা প্রবল ঝটাপটি করলেও শেষে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। বর্গ এবার উঠে গিয়ে খিড়কির জানালাপথে রাস্তায় দাঁড়ানো দুজন সহকারীকে টর্চ জেলে ইশারা করল।

মিনিটখানেক বাদে ফায়ার এস্‌কেপ দিয়ে দুজন লোক সেই ঘরে এসে প্রবেশ করল। ওলন্দাজ লুব্বে রাস্তায় রইল পাহারায়, যদি কোন জেন্ডারমে (পুলিস) বা হোটেল কর্মী সামনে এসে যায় তো সে পূর্বাহ্ণেই হুঁশিয়ারী করে দেবে। ফরাসী ও ইংরেজ দুইজন অচৈতন্য ডরোথীকে একটা কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে যে পথে এসেছিল সে পথে নেমে গিয়ে দণ্ডায়মান একটি ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল।

স্বস্তির প্রবল নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বর্গ-এর বুক থেকে। উঃ কি শান্তি, বাঁচা গেল। নচ্ছার মেয়েমানুষটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল অবশেষে। হোটেল ঘরের সমস্ত জানালা খুলে দিল সে। ঘর থেকে ক্লোরোফর্মের গন্ধ

যাতে চলে যায়। তারপর আরাম করে দেহ এলিয়ে দিল দুগ্ধফেননিভ বিছানায়। সে নতুন নতুন মহিলা রোগীর আগমন, অজস্র অর্থোপার্জন প্রভৃতির সুখচিন্তায় বিভোর হয়ে গেল। যাক ঐ পথের কাঁটা ডরোথীটাকে তো সরানো গেছে, আপদ চুকেছে। এবার প্রাণভরে স্ফূর্তি করা যাবে।

চোখে বুঝি তন্দ্রা নেমেছিল। শেষ রাত প্রায় পাঁচটা। বর্গের তন্দ্রা সহসা ভেঙ্গে গেল। আধা নিদ্রা আধা জাগরণে মনে হল যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেল ঘরে। কে যেন ঘরে এসে ঢুকেছে।

—কে!! বর্গ ভাবলো সহকারীরা বোধ হয় ফিরে এসেছে এই সংবাদ নিয়ে যে ডরোথীকে তারা বন্দিনী অবস্থায় ট্রিেষ্টি জাহাজের কেবিনে তালা বন্ধ অবস্থায় রেখে এসেছে।

এমন সময় গলার মাঝখানে তীক্ষ্ণ একটা ধাতব ছোঁয়াচ লাগতেই বর্গ সম্পূর্ণ জেগে গেল। নিদারুণ আতঙ্কে তার জিভ শুকিয়ে গেল। শেষ রাতের আবছা আলোয় দেখলো একটা মানবমূর্তি তার ওপর উপুড় হয়ে রয়েছে। চোখ খিঁতোতে দেখলো সেই ছায়ামূর্তির অঙ্গে নীল রঙের একটা কোট। এতো মানব নয়, এযে এক মানবী। স্ত্রীলোকটি হাতের ছুরিটাকে আরো একটু চাপ দিতে মৃত্যুভয়ে দিশেহারা বর্গ মাথাটাকে আরেকটুকু ঠেলে তোশকের মধ্যে পেছন দিকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

সর্বনাশ! বর্গের এবার নজরে পড়লো, এযে আর কেউ নয়, এযে স্বয়ং ডরোথী ওয়েনরাইট!! অ্যা·· তুমি···!!

—আমার কয়েক বছর আগেই তোমাকে হত্যা করা উচিত ছিল, ভয়াবহ কণ্ঠে ডরোথী হিসহিস করে বলে ওঠে, ঐ নির্বোধ গুণ্ডাগুলি আমাকে ভুল এক জাহাজে নিয়ে ক্যাপ্টেনের কেবিনে ফেলে এসেছিল। ক্যাপ্টেন জণ্ডারমেস (পুলিস) ডাকে, আর তারাই আমাকে এ হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেছে। এখন আমি দেখতে চাই তুমি মর, বুঝলে শয়তান হোরেস।

এরপর বর্গ বৃথাই প্রাণভিক্ষার জন্য করুণভাবে আকুলিবিকুলি করল কিন্তু তার কথাগুলি ভালভাবে বোঝা গেল না, কারণ তখন তীক্ষ্ণধার ছুরিকাটি তার কণ্ঠের তাজা রক্তপান করতে শুরু করেছে। অবশেষে পুরুষটির বিরক্তিকর আর্তস্বরে ক্লান্ত হয়ে ডরোথী ছুরিকাটিকে সমূলে ঢুকিয়ে দিল বর্গের গলায়। ছুরি এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে বালিশে গিয়ে বিঁধলো। ফিনকি-দেওয়া রক্তে বালিশ বিছানা লাল হয়ে গেল।

সকাল আটটার সময় হোটেল পরিচারিকা এসে দেখলো মৃত হোরেস বর্গের

পাশে রক্তাক্ত বিছানায় এক ভদ্রমহিলা শুয়ে আছে। প্রথমে ভেবেছিল বিছানার চাদরটা বুঝি লাল রঙে ছোপানো, পরে যখন বুঝলো ওটা রক্ত তখন সে হাউমাউ করে চিৎকার করে উঠল !···

ডরোথী অতি শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলে ওঠে, এই নির্বোধ মেয়েটা অমন করে চেঁচাবার কি আছে? এটা একটা মৃত ব্যক্তি। হোরেস কামশীতল মেয়েদের চিকিৎসা করছিল···এবং তাতে বেশ আনন্দলাভই করছিল কয়েক বছর ধরে। এখন সে নিজেই পরিপূর্ণ শীতলকাম বনে গেছে আর আমি এখন খুবই আনন্দলাভ করছি।

বলে হো হো করে বিকট এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো প্রতিহিংসাপরায়ণা একদা চরম লালসাময়ী নারী ডরোথী ওয়েনরাইট।

দেখে শুনে ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল পরিচারিকা সেই মৃতের ঘর থেকে।

দানব রোগের ভয়াল কাহিনী

'নতুন বিশ্ব' জয় করে এলেন কলম্বাস, সঙ্গে করে নিয়ে এলেন দেহভরা 'নতুন' এক রোগ। কথিত আছে, তাঁকে চরম অসুস্থ অবস্থায় জাহাজ থেকে পাঁজাকোলা করে নামানো হয় তীর ভূমিতে এবং কিছুকাল মধ্যে সেই কালান্তক রোগেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

শেষের সেখানেই শুরু। সেই ভয়ংকর ব্যাধি, যাকে তখন নাম দেওয়া হয়েছিল 'জার্মান-পক্স' রূপে, সারা ইয়োরোপকে তছনছ করে, দেড় কোটি আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণহরণ করেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে।

সেই ব্যাধি, সেই যৌন-ব্যাধি, আজ বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে পড়ে তার প্রাপ্য ফসল সমানে তুলে নিয়ে চলেছে সর্বাধুনিক এক নামে। দেবভূম ভারতবর্ষে সে ব্যাধির প্রথম পদার্পণ হয় প্রখ্যাত নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ও তাঁর সহচরদের সৌজন্যে।

১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এ রোগের যে অকল্পনীয়, বীভৎস ও ভয়ংকর মহামারী ইয়োরোপকে প্রায় শেষ করে এনেছিল, সেখান থেকেই কাহিনী শুরু করা যাক ঃ

চমৎকার বসন্তকাল। যে বসন্তের জন্য প্যারিস সে-ঋতুতে হয়ে ওঠে স্বর্গসম, মনোরম আবহাওয়ায় দেখা গেল অদ্ভুত বীভৎস একদল মানুষের মিছিল চলেছে রাস্তা ধরে, পথচারীরা ভয়ে আতঙ্কে সে দৃশ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে, কেউ কেউ ওদের দেখে বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে, কেউ কেউ অসহনীয় সে দৃশ্য দেখার চেয়ে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

মিছিলকে সংযত রাখতে রাখতে চলেছে বর্শা ও তরবারিধারী অশ্বারোহী বেলিফ ক'জন। মিছিল থেকে ছত্রভঙ্গ বা পালানোর চেষ্টা করা কিছু নর-নারীকে তরবারি ও বর্শার আঘাতে রক্তাক্ত দেহে ফিরিয়ে আনছে তারা মাঝেমাঝেই।

এ মিছিলে চলছিল প্রায় চার হাজারজন পুরুষ, নারী এমন কি কিছু শিশুও। এরা প্রত্যেকেই যৌন-রোগাক্রান্ত। বছরটা হল ভয়াবহ সেই ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ,

যে বছরে ভয়ংকর সিফিলিস মহামারী কামানের গোলার মত বিস্ফোরিত হয়ে সারা ইয়োরোপ মহাদেশকে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে তুলেছিল।

এই অশুভ বর্ষের পূর্ব পর্যন্ত এ রোগ ছিল সম্পূর্ণ অজানা ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডে। মাঝে মধ্যে কিংবদন্তীর মত এ রোগের কথা শোনা যেত দূর দূরান্ত দেশ থেকে ঘুরে আসা নাবিক পর্যটকদের মুখে। কিন্তু সে বছর এল শিয়রে শমন, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নর-নারী বেঘোরে প্রাণ দিতে লাগলো এই নতুন-আসা কালব্যাধিতে।

অকস্মাৎ আক্রান্ত প্যারিস, মরণশয্যায় ধুঁকতে লাগলো এই আচমকা আঘাতে। সঙ্গে সঙ্গে সেণ্ট জারমেইন জেলাকে এই রোগাক্রান্ত মানুষদের নির্বাসনস্থান স্থির করে ফেললো। কোয়েরাস্টাইন এলাকা। আদেশজারী হল এই রোগী ও রোগীনীদের অবিলম্বে ঐ জেলায় গিয়ে বন্দীজীবন যাপন করতে হবে, নচেৎ মৃত্যুদণ্ড।

চার হাজার লোকের এইটি হল সর্বাধুনিক মিছিল, যাদের ধরে পাকড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেণ্ট জারমেইনের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, যেখানে গিয়ে তারা অনাহারে অনিদ্রায় পচে গলে মৃত্যুবরণ করবে। নাৎসী বন্দী শিবিরের মত এখানে জীবিত ও মৃত মানুষদের একযোগে গাদিয়ে রাখা হতে লাগলো।

বড়জোর হাজার দুই লোক বাস করতে পারে কোন মতে এমন একস্থানে বিশহাজার নর-নারীকে বন্দী করে রাখা হল। মাঝে মাঝে একটা ওয়াগনে করে কতগুলো পোকাকাটা সব্জী দেয়ালের বাইরে থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত ভেতরে। তিন-চার দিন অন্তর এই জঘন্য ও নগণ্য খাদ্য ছুঁড়ে দেওয়া হত পশুর অধম হতভাগ্য সেই নর-নারীদের। রোগের জ্বালায় আর অনাহারে অচিরেই খতম হতে থাকলো একের পর এক।

মিছিলটা যখন সিন নদীর একটা ব্রিজের কাছে পৌঁচেছে, জনৈক কৃষক যুবক, যার সর্বমুখে সিফিলিসের দগদগে ঘা, অকস্মাৎ লাইন থেকে বেরিয়ে এক লাফে উঠে গেল ব্রীজের রেলিং-এর উপর। তারপর আর্তনাদের মত সচিৎকারে সে বলে গেল, সেণ্ট জারমেইনে গিয়ে তিলেতিলে মৃত্যুর চেয়ে এখানেই প্রাণ বিসর্জন দেওয়া আমি ঢের ভাল মনে করি। এই যে 'জার্মান-পক্স'-এ আক্রান্ত হয়েছি, এটা আমার দোষে নয়। এটা দিয়েছে আমায় ঐ ব্লু-বোর ট্যাভার্ন মদ্যশালার বেশ্যাটা। হায়, আর আমি আমার বউ ছেলেমেয়েদের আর দেখতে পাবো না এজীবনে।

রেলিং-এর ওপর সে ইতস্তত: করছিল ঝাঁপ দেবে বলে কিন্তু ইতিপূর্বেই একজন সৈনিকের তীক্ষ্ণ বর্শা তার বুক ভেদ করে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তাক্ত দেহ নদীর জলে ঝপাং শব্দে পড়ে মিলিয়ে গেল। মিছিল চলতে লাগলো।

প্যারিসের অন্যত্র তখন গীর্জাগুলি থেকে মুহুর্মুহুঃ ভয়াবহ ঘণ্টাধ্বনি বেজে চলেছে। ভীত সন্ত্রস্ত কিছু মানুষ রাস্তায় রাস্তায় বাছুরের রক্ত ছেটাচ্ছে, অনেকেই ধূপধুনা জেলে বায়ু শুদ্ধ করছে, কেউ কেউ শয়তানের পূজা করে চলেছে, যাতে করে মানবজাতির এ চরম সর্বনাশ রুদ্ধ হয়, অপসারিত হয়। এই নিদারুণ রোগ মোটামুটি ধাতস্থ ও প্রশমিত হওয়ার পূর্বে পরবর্তী পাক্কা তিরিশ বছরে আড়াই কোটি লোকের প্রাণ নিয়ে নিল, সমসংখ্যক বা তারও বেশী মানুষকে চরম বিকলাঙ্গ করে ছাড়লো। আর তারপর থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়াব্যাপী মানবজাতির মধ্যে কায়েমিরূপে আসন গ্রহণ করে অদ্যাপি তার মারাত্মক শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য বিউবনিক প্লেগ-এর মত এ যৌনরোগের সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর সে করাল রূপ নেই, এখন অনেক অনেক ঝিমিয়ে স্তিমিতরূপে ধিকি-ধিকি প্রজ্বলিত হয়ে রয়েছে মাত্র।

১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইয়োরোপে এ-রোগ ছিল অজ্ঞাত। শোনা যেত মধ্যপ্রাচ্যে আছে, পরে প্রমাণিত হল 'নতুন বিশ্ব' বা আমেরিকায় এ-রোগ ভালোভাবেই ছিল। কিন্তু সে বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এই বিচিত্র ও ভয়ংকর রোগের প্রকোপ দেখা দিল ইয়োরোপে। অজস্র নর-নারী মৃত্যুমুখে পতিত হতে লাগলো আচমকা। রোগটা এতই নতুন যে তখন পর্যন্ত এর কোন নামকরণ করাই সম্ভব হল না।

রয়েল স্প্যানিস কোর্ট-এর রাই দ্য আইসলা নামক জনৈক রাজ-বৈদ্য ক্রিস্টফার কলম্বাস ও তার নাবিকদের চিকিৎসা করেন। তাঁরা তাঁদের চাঞ্চল্যকর আমেরিকা আবিষ্কার করে স্পেনে ফিরে এসেছেন এবং সঙ্গে করে এনেছেন দেহভরে অদ্ভুত এক রোগ যার বহিরাকৃতি যেমন বীভৎস, দ্রুত ক্ষয়রোগ হিসেবেও যেটা সমধিক কুখ্যাত। পরে জানা গেল যে কলম্বাস ও তার সহচরেরা রেড ইণ্ডিয়ান নারী সংসর্গে এই কুৎসিত যৌন রোগটি সংগ্রহ করে এনেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সার্জেন জেনারেল ডাঃ থমাস পারান-এর মতে এই মহান আবিষ্কারককে জাহাজ থেকে বহন করে নামানো হয়েছিল স্পেনের মাটিতে গুরুতর এই রোগাক্রান্ত অবস্থায়।

ডাঃ পারান তাঁর ভি. ডি. সম্পর্কীত পুস্তকের একস্থানে লিখেছেন:

কলম্বাসের বুক থেকে নিম্নাঙ্গ পর্যন্ত শোথ ও উদরীর মত হয়ে গিয়েছিল, যেমন হয়ে থাকে হার্টের ভ্যালভ জখম হলে, হাত-পা প্যারালিসিসগ্রস্থ, এমন কি মস্তিষ্কও বিকৃত হয়ে গিয়েছিল—এ সবই কালান্তক সিফিলিস রোগের শেষ উপসর্গ। ফলে এই মহৎ আবিষ্কারক ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে দেহত্যাগ করেন।

কলম্বাসের মৃত্যুর অনেক আগেই তাঁদের আনা এই বিচিত্র রোগটি ঝটিকাগতিতে ইয়োরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রে সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দু'বছর দাক্ষিণ-পশ্চিম ইয়োরোপের ওপর জ্বলন্ত ত্রাস-এর কাজ করে পরে ঢুকলো গিয়ে ইতালীতে। ফরাসী সম্রাট অষ্টম চার্লস নেপল্‌স্-এর সিংহাসন দাবি করে ইতালীয় উপদ্বীপে সসৈন্যে আক্রমণ চালান। তাঁর সেই পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য এ রোগটি ছড়িয়ে দেয় ঐ দেশে।

তদানীন্তন ইতালী ছিল বহু পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। প্রতিরোধকারী স্পেনীয় ও নেপল্‌স্ সৈন্যরা পালিয়ে যাবার পর সেইসব রাষ্ট্রে এই বিজিত সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাদর স্বাগত জানালো চরম চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা দিয়ে। আক্রমণকারীদের মধ্যে ছিল জার্মান, সুইস, অষ্ট্রিয়ান, ইংরেজ এবং ওলন্দাজ সেনা, তারা চরম লুব্ধভাবে মুফৎ মদ ও সুন্দরী যুবতী নারী গোগ্রাসে গিলতে লাগলো এবং সেই সব নারীদের অধিকাংশই ছিল কলম্বাসের লোকেদের দ্বারা রোগসংক্রামিত, ফলে বিপুল সৈন্যবাহিনী রোগকবলিত হয়ে পড়লো অচিরাৎ।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রাজা চার্লস-এর সেনাদল এই অজ্ঞাত অদ্ভুত রোগে প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। তখন একে বিবিধ নামে অভিহিত করা হত, যেমন, টার্কিশ পক্স. ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ান মিজল্‌স্, জার্মান পক্স, ফ্রেঞ্চ কার্স। প্রতিটি দেশ একে অপরকে এ রোগের অভিশাপের জন্য দায়ী করতে লাগলো, দোষারোপ করতে থাকলো।

এই রোগের মহামারীতে যখন তার সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত এবং আধা মৃত তখন ভীত চার্লস্ সংবাদ পেলেন তাঁকে নাকি হত্যা করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ তিনি পালী থেকে সৈন্যাপসারণের ঝটিতি আদেশ দিলেন। এবং সেইসব বারো জাতির দ্বারা গঠিত সৈন্যদল স্ব স্ব দেশে ছড়াতে লাগলো এই কদর্য রোগ। কোন দেশ অব্যাহতি পেল না, বিশালকায় রাশিয়া থেকে ক্ষুদ্রাদপি সুইজারল্যাণ্ড পর্যন্ত যাবতীয় দেশ এ রোগের কামড়ে জর্জরিত হল।

প্রবলভাবে ভি' ডি. ছড়িয়ে পড়ায় প্রতিটি নগরীতে প্রতিটি হ্যামলেট-এ

সে আতঙ্কের তুলনা রইল না। গীর্জার উপাসনা পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত অনিশ্চিতকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। ভীত জেনারেলরা সম্পূর্ণ সেনাদলকে ভেঙ্গে দিল। ডাক্তারেরা, সে প্রকৃত বা হাতুড়ে যেই হোক না কেন উল্টোপাল্টা মলম ও বড়ি দিয়ে চিকিৎসা করে (যেগুলো এই রোগ প্রতিরোধ বা নিরাময়ে কোন কাজেই লাগতো না) রাতারাতি প্রচুর পয়সা উপার্জন করে বড়লোক হয়ে গেল।

ভি. ডি. যখন দেশকে তুরমুজ করে ফেলছে সে সময় হল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরা দোকান-পসরা বন্ধ করে দিল। দেশের রেভেনিউ কমে যাওয়ায় নেদারল্যাণ্ডরাজ এক 'পক্স-ট্যাক্স' বসিয়ে দিল। হতভাগ্য যে নর-নারী বা যুবকগণ এ রোগে আক্রান্ত হবে তাকেই মাথাপিছু সরকারকে ৫০ গিলডার করে কর দিতে হবে, অন্যথায় কারাদণ্ড তথা মৃত্যুদণ্ড। একটিমাত্র সপ্তাহে আমস্টারডামে ৪৫০ জন হল্যাণ্ডবাসী কর না দিতে সক্ষম হওয়ায় ফাঁসীমঞ্চে প্রাণ দিল।

সেই অবিশ্বাস্য বছরের যতদিন যেতে লাগলো ইয়োরোপে সাধারণ সমাবেশ বন্ধ হয়ে গেল, সৈনিকরা লড়াই করতে অস্বীকার করলো, গণিকালয় বন্ধ করে পুড়িয়ে দেওয়া হল, থিয়েটার লোকশূন্য হওয়ায় দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হল।

লিয়র প্রখ্যাত মেলার উদ্যোক্তারা ভি. ডি'র ভয় সত্বেও লাভজনক মেলা বন্ধ করতে অস্বীকার করে সশস্ত্র প্রহরী রাখলো যাতে মেলাপ্রাঙ্গণে নষ্ট চরিত্রের কোন নারী বা গণিকারা প্রবেশ না করতে পারে। গণিকারা প্রমাদ গনলো বছরের এই তিনমাসে তাদের মোটা রোজগার হয়, তা দিয়ে চলে বাকী নয় মাস। ক্ষেপে গিয়ে তারা দলবদ্ধ আক্রমণে পনের জন প্রহরীকে পর্যুদস্ত করে মেলায় ঢুকে গেল।

সেনাদল ডাকা হল। পরস্পর লড়াইয়ে রোগে ইতিমধ্যেই ক্ষতবিক্ষত জনা ত্রিশেক গণিকা নিহত হয়ে গেল সেখানে। এই ঘটনার ফলে ফরাসী দেশে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হল জনসমাবেশ, থিয়েটারসমূহ, যাবতীয় গীর্জা, আদালত ও মুরগীর লড়াই। ১৪৪ ধারার মত অনধিক চারব্যক্তির সমাবেশ নিষিদ্ধ হল। স্কুলে কোন ছাত্র রইল না, রইল না জেলের মধ্যে কোন বন্দী।

অথচ কেউ কোন কারণ খুঁজে পেল না এই প্রবল বন্যার মত ঐ বিদঘুটে রোগের প্লাবন কেন এসে সব দেশকে ক্রমান্বয়ে শেষ করে ফেলছে।

ডাঃ পারান বলেন, প্রতিরোধ ক্ষমতা কম বলেই হোক বা সেই যুগের সর্বপ্রথম আক্রমণের প্রবলতার জন্যেই হোক, এই রোগটি সাংঘাতিক মারকরূপে দেখা দিয়েছিল তখন। আজ কিন্তু এ রোগের সেই ধরনের হিংস্রভাব আর

নেই, বহুলাংশে নিস্তেজ হয়ে গেছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের চরম উন্নতিতে সর্বাধুনিক ঔষধের জাদুগুণে এর মারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

সে যুগে এরোগে আক্রান্ত রোগীর প্রবল জ্বর হত, দারুণ প্রলাপ, অসহ্য মাথার যন্ত্রণা এবং প্রতিটি হাড়ে বেদনা ও ঘা, ভয়াবহ চামড়া-ক্ষত দেখা দিত। চতুর্দিকে মৃত্যুর হাহাকার, এবং সাধারণ সর্দির চেয়েও বেশী সংক্রামক ছিল এই যৌন-রোগটি। যৌন-সংযোগ ছাড়াও আজকের যুগে অভাবনীয়, সে যুগের সর্বস্তরের মানুষের ঘনিষ্ঠ জীবনধারাতেও রোগ সংক্রামিত হত।

এরোগ প্রাদুর্ভাবের কয়েক মাসের মধ্যে আরব বণিকরা আক্রান্ত দেশসমূহে পারদঘটিত মলম পাঠাতে লাগলো। এরোগের ঘা ইত্যাদি নিরাময়ে আরব চিকিৎসকগণ নাকি মার্কারি চিকিৎসায় ফল পেয়েছিল। কিন্তু অতি তাড়াতাড়ি রোগ সারাবার কু-প্রচেষ্টায় ইউরোপের হাতুড়ে ডাক্তাররা রোগীদের এত বেশী পরিমাণে সে ঔষধ দিতে লাগলো যে ওভার ডোজের ফলে হাজারে হাজারে রোগীর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটলো।

যদিও সে যুগের ডাক্তার এবং বৈজ্ঞানিকদের এ রোগের কারণ সম্পর্কে ঝাপসা ধারণা ছিল, তবে এটা যে যৌনসংযোগের ফলে সংক্রামিত হয় এ সন্দেহটা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়ে উঠলো।

জেনা নগরের এলবার্ট ভন টুইয়েস নামক একজন চক্ষুচিকিৎসক ঘোষণা করলেন যে মাইক্রোস্কোপে সিফিলিসাক্রান্তর রক্ত রেখে তিনি "লিটল মনস্টার" কিছু লক্ষ্য করেছেন।

তিনি বললেন, এই সব অতি ক্ষুদ্র কীট বা বীজাণুগুলিই ঐ অভিশপ্ত ফরাসী পক্স রোগের হয়ত কারণ।

ভন টুইয়েস একজন কালদর্শী বিজ্ঞানী ছিলেন। যা হয়ে থাকে, তাকেও স্থানীয় নাগরিকরা জাদুকর বা ব্ল্যাক ম্যাজিসিয়ান রূপে অভিহিত করত।

একদিন জেনার নাগরিক কমিটির একদল মানুষ, যারা এই বিজ্ঞানী দর্শিত কর্ক স্ক্রু আকৃতির "মনস্টার"কে নানাভাবে বিদ্রুপ করে এসেছে, তারাই সদলে হামলা করে একরাত্রে শুধু ভন টুইয়েস-এর লেবরেটরী, সব যন্ত্রপাতি ধ্বংস করেই নিবৃত্ত হল না, স্বয়ং বিজ্ঞানীকেও জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ফেললো।

হাতুড়েদেরও যেমন পোয়াবারো তেমনি তখনকার কজন জ্যোতিষীরাও ঘোষণা করলে সিফিলিস-মহামারীর জন্য কয়েকটি "স্টার'ই দায়ী।

হেনরিখ উলবার নামক জনৈক প্রভাবশালী নক্ষত্রবিজ্ঞানী রায় দিলেন,

যাজকবৃন্দ এরোগে আক্রান্ত হয় বৃশ্চিক বা অপর কোন অশুভ লগ্নের নক্ষত্রালোকে অনাবৃত্ত অবস্থায় থেকে। আর আমাদের মধ্যেকার সাধারণ পাপাত্মার ডেভিল পক্স রোগে পড়ে নারীসংসর্গ মারফৎ।

উলবার নিজে এই রোগের প্রতিষেধকরূপী দুটি বিচিত্র বস্তু বিক্রী করে প্রভূত বিত্তশালী হয়ে উঠে এবং রাইন নদীর তীরে বিরাট এক এস্টেট ও একটি ক্যাসল ক্রয় করে। বস্তু দুটি হল: একটি মলম ও একটি সিল্কের মুখোস। এই দুটি বস্তু যদি কোন নিদ্রিত নর বা নারীর মুখে লেপন ও ঢাকা দেওয়া যায় তবে নাকি উক্ত ভি. ডি. জীবাণু দেহে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু মজা এই, এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক শয়তান লম্পট নিজেই কাম-লালসায় নিমজ্জিত হয়ে ফরাসী এক গণিকাকে নিয়ে ভেনিসে গিয়ে স্ফূর্তিতে মত্ত রইল। যখন সে দেশে ফিরলো তখন সিফিলিসের ঘায়ে তার মুখের অর্ধেকটা বিকৃত হয়ে গেছে। ভয়াবহ সে দৃশ্য। এককালের সম্মানীয় ব্যক্তি অতীব ঘৃণিত মানুষে পর্যবসিত হল।

অচিরেই জ্যোতিষি সাহেব গ্রেপ্তার হয়ে ফ্রাঙ্কফুটের শহরতলীর বন্দী-নিবাসে আটক হয়ে পাঁচ সপ্তাহ বাদে অনাহারে সেখানে মারা গেল।

দ্রুত সঞ্চরণশীল এই রোগ নানা ধরণের পথে সংক্রামিত হতে লাগলো নির্দোষ মানুষজনের মধ্যে। ধাত্রীর মারফৎ আক্রান্ত হল গর্ভবতী মেয়েরা, নাপিতরা তাদের বিষাক্ত ক্ষুরমারফৎ এ রোগ চালান করলো অগণিত নিরীহ মানুষদের মধ্যে। বহু নগরে বন্দরে ব্যক্তিরা রোগাক্রান্ত হয়ে বিকৃত হবার বা মরবার পূর্বে শেষ স্ফূর্তি করবার মানসে গণিকালয়ে ঘুরে ঘুরে দিবারাত্র নিজের শেষ সুখ ও অপরের অশেষ অসুখ ফিরি করে যেতে লাগলো। নিজেরা তাদের কাছ থেকে অসুখ বাধিয়ে স্ব-স্ব গৃহে স্ত্রীদের মধ্যে রোগ বিস্তার করে দিল। এইভাবে মহামারী ক্রমে ক্রমে চরম পর্যায়ে উপনীত হল।

এই অজ্ঞাত রোগের নামাকরণ করেন জিরালামো ফ্রাক্কাস্টোরো নামক জনৈক ইতালীয় ডাক্তার। তিনি নিওবের দ্বিতীয় পুত্র রোগাক্রান্ত সিফাইলাসের নামানুসারে এই নিদারুণ যৌনরোগটির নাম দেন: সিফিলিস। অদ্যপি এই নামই বলবৎ রয়েছে।

সর্বস্তরের নরনারীর মধ্যে এই রোগের আতঙ্ক নিঃসীম পর্যায়ে উঠলো। কি ধনী কি দরিদ্র, কি সৈনিক কি করনিক, কি অভিজাত কি ছোট দোকানী, কি বেশ্যা কি বা অভিজাত বংশীয়া, প্রত্যেকেই থরথরি কাঁপতে লাগলো রোগাক্রমণ ভীতিতে। ব্যাভেরিয়ান সম্রাট ম্যাক্সিমিলান স্বয়ং পর্যন্ত এমন

আতঙ্কিত হয়ে গেলেন যে ১৪৯৫-এর ৭ই আগষ্ট এক আদেশজারী করে ঘোষণা করলেন যে "পক্স রোগাক্রান্ত প্রতিটি মানুষকে কুষ্ঠরোগীদের মত ব্যবহার করে, তাদের অবস্থানুসারে এক হয় ফাঁসী দেওয়া হবে, নয়ত পুড়িয়ে মারা হবে কিংবা নির্যাতন করা হবে! তবে পবিত্র স্যাবাথ (রবিবার) দিনটাকে বাদ দিয়েই এসব করা হবে।"

দক্ষিণ জার্মানীর অল্প ক্ষমতাশালী কিছু প্রিন্স এমন আদেশও দিলেন যে প্রত্যেক রোগীকে রক্তবর্ণ পোশাক ও হাতে একটি শ্বেতপতাকা বহন করে পথে বেরুতে হবে যাতে করে সুস্থ মানুষেরা তাদের সিফিলিটেক বলে চিনতে পেরে সভয়ে দূরে যেতে সক্ষম হয়।

সে যুগের দৃশ্যাদি এমনই হৃদয়বিদারক ছিল যে মহান আর্টিস্ট আলব্রেখ্‌ট ডুরার এক উডকাট-এ সে দৃশ্য ধরে রাখেন, আজও যে কাঠ খোদাই শিল্পকর্মটি "দি ফার্স্ট সিফিলিটিক" নামে প্রখ্যাত হয়ে আছে। বার্লিনের ক্রায়েডরিখ উইলহেলম মিউজিয়ামের দেয়ালে এটিকে দেখে আজও দর্শকবৃন্দ ভয়ে আতঙ্কে অবশ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ আজ এ রোগ জাদু ঔষধ পেনিসিলিনের কল্যাণে কত না অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠেছে।

বর্দো থেকে যাওয়া বাণিজ্যিক জাহাজের নাবিকদের ব্রিস্টল বন্দরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সেই অশুভ বৎসরে ইংলণ্ডে এই বিভীষিকা রোগ প্রথম প্রবেশ লাভ করে। দেড় মাসের মধ্যে চার হাজার নাবিক ও শহরের জনসাধারণ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ৪৭টি গণিকালয় সম্পন্ন নারকীয় বন্দর রূপে খ্যাত ব্রিস্টল নগরী এ ব্যাপারে স্বদেশকে খুব ভালভাবেই সাহায্য করলো ভি. ডি. সম্প্রসারণে।

রোগটি লাফিয়ে লাফিয়ে ছেয়ে ফেললো দেশ। একলাফে গেল স্কটল্যাণ্ডে। সেখানকার রাজা চতুর্থ জেমস গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল গোছের হাতুড়ে ডাক্তার বনে গেলেন। সিফিলিস রোগীদের বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা শুরু করে দিলেন। এমন কি অনিচ্ছুক রোগীদের নিজ চিকিৎসাধীনে আনবার জন্য উল্টে স্বর্ণমুদ্রা প্রদানও করতে থাকলেন। তার হাতুড়ে আজব চিকিৎসার একটি প্রিয় প্রক্রিয়া ছিল কালো ভেড়ার ফুটন্ত চর্বি ভি. ডি. রোগীর অঙ্গে লেপন করে দেওয়া।

সেই ভয়ংকর বছরের ৬ই নভেম্বরের রাজা জেমস্ এই আদেশ জারী করলেন যে তার যেসব প্রজা 'গ্র্যাণ্টগোর' রোগে (সিফিলিসের উক্ত নাম দিয়েছিলেন তিনি) আক্রান্ত হয়েছে তারা যেন অবিলম্বে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে

তাদের স্ব-স্ব শহর বন্দর পরিত্যাগ করে চলে যায়। অমান্য করলে মৃত্যুদণ্ড।

এইসব অসহায় মানুষগুলিকে (যার মধ্যে দশ বছরের শিশুও ছিল) স্কটিশ শহর লীথ-এর বিপরীতে এক দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে শুরু হল সপারিষদ হাতুড়ে সমেত স্বয়ং রাজা জেমস্-এর আজব চিকিৎসা। এরপর যখন পূর্বোক্ত 'ভেড়া চর্বি লেপন' চিকিৎসা পদ্ধতি রোগ নিরাময়ে কোন কাজে এল না তখন মেগ হ্যারিকাট নামক এক দুর্বৃত্ত শয়তানের পরামর্শে রাজা ডজনখানেক নর ও নারী রোগীর জিভ কেটে ফেলে দিলেন।

এই নিষ্ঠুর চিকিৎসা পদ্ধতি অবশ্য অচিরেই পরিত্যক্ত হল। এবার স্কটিশ রাজা আরেক নতুন আদেশ জারী করলেন। যাবতীয় ভি. ডি. রোগীদের দু গালে চিহ্নিত করা হবে, সাধারণ্যে চাবুক মারা হবে, পরে তাদের শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় পাঠানো হবে 'আইল অব সোর'-এ (বন্দীনিবাস দ্বীপকে এই নামেই অভিহিত করেছিলেন তিনি)।

তদানিন্তন যুগের নামকরা কবি উইলিয়ম ডানবার, রাজা জেমস-এর এই আজগুবী ও নিষ্ফল চিকিৎসা পদ্ধতির প্রশংসা করে এক কবিতা লিখে ফেললেন। ফলে রাজার কাছ থেকে পারিতোষিক হিসেবে এক বস্তা স্বর্ণমুদ্রা লাভ করলেন। কিন্তু নিয়তির পরিহাস স্বয়ং কবি-প্রবর প্রতিবেশীর এক সুন্দরী পত্নীর সঙ্গে রাত কাটিয়ে রোগ বাধিয়ে বসলেন। রাজা জেমস্ বিষম রেগে নিজ হাতে লোহা গরম করে সভাকবির দুই গণ্ডে ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিয়ে সরাসরি ডানবারকে উক্ত দ্বীপে নির্বাসিত করলেন, সেখানে মাস পাঁচেক বাদে তিনি দেহরক্ষা করলেন।

হেনরিখস্ নামীয় জনৈক মধ্যযুগীয় প্যারিসের লেখনীতে পাই এই ভেনারেল পক্স-এর ভয়াবহ বর্ণনা: "এই পক্স বাহ্যিক পরিদৃশ্যমান হবার পরই সেটা মস্তিষ্ক অধিকার করে সেখানে তার কায়েমী বাসা বাঁধতো। এটা মাথা ভেদ করতে পারত, ব্লাড ভেসল্-এর ভেতর দিয়ে কানে প্রবেশ করে রোগীকে কালা করে ছাড়তো, কানে পোকার জন্ম দিত, নাকটাকে দিত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, গড়ে তুলতো নেত্রনালীর ঘা।

এটা দাঁতের দফা রফা করে মুখগহ্বরকে করে তুলতো পুতিগন্ধময় নরক। আলজিভ খসে যাওয়ায় কণ্ঠস্বর নষ্ট বা পক্ষাঘাত আক্রান্ত হত। কোমর এবং হাঁটু অসাড় হয়ে পদদ্বয় এমনভাবে বক্র হয়ে যেত যে রোগীর চলন ক্ষমতা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যেত।"

আজকের গবেষকগণও স্বীকার করেন এ বর্ণনা যথার্থতা। সেই ভয়ংকর বছরের অস্বাভাবিক ধরনের তীব্র এই যৌন রোগের উপসর্গের উক্ত লেখক কর্তৃক বর্ণনা নিখুঁত ক্লিনিকাল প্রতিচ্ছবি। এই ভয়ংকর হিংস্র রূপই সেই ১৪৯৫ এবং পরবর্তী তিন দশক ধরে সারা ইয়োরোপকে মুমূর্ষু করে ছেড়েছিল।

তদানিন্তন ডাক্তারদের চিকিৎসা পদ্ধতিও ছিল অভাবনীয় নিষ্ঠুর। তারা রোগীর চোখের পাতা বিদ্ধ করতো, কপালের দু পাশ পুড়িয়ে দিত, কামানো তালু কেটে ব্লাড ভেসল্ উন্মোচিত করত, শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে কাঠ পুড়িয়ে জলন্ত ছেঁকা দিত। রোগের চেয়ে চিকিৎসা ছিল আরও ভয়ংকর, তারপর দু হাতের শিরা কেটে রক্ত মোক্ষণ করাতো, পুরুষাঙ্গে জোঁক বসাতো। ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই রোগীরা রক্তশূন্য হয়ে মারা যেত।

স্পেনদেশেও ঐ ১৪৯৫-এর আগে সিফিলিস ছিল পুরোপুরি অজ্ঞাত। কিন্তু সে বছর ১৮ই জুন তারিখে পাডুয়া ইউনিভার্সিটির মেডিসিনের প্রফেসার নিক্কোলো সিলাসিও বার্সিলোনায় গিয়ে এই ফ্রেঞ্চ কার্সের (এ নামই তিনি দিয়েছিলেন) ৩০০০ রোগী দেখতে পেলেন।

এই প্রফেসার উক্ত রোগ নিরাময়ের এক অভিনব এবং চরম বেদনাদায়ক পদ্ধতি প্রেসক্রাইব করলেন। তিনি রোগীর তালুতে গর্ত করে তাতে ধোঁয়া ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন ফুঁ দিয়ে। তাঁর মতে এই ধোঁয়া ক্রমান্বয়ে মস্তিষ্কের ভেতর ঢুকে যে অশুভ শ্লেষ্মার দ্বারা এ রোগ জন্মায়, তাকে উড়িয়ে বাইরে নিয়ে আসবে এবং অচিরেই রোগী রোগমুক্ত হয়ে যাবে।

এই চিকিৎসা-পদ্ধতি যখন ব্যর্থ হল তখন প্রফেসর এক বত্রিশভাজা মলম তৈরী করলেন, তার মধ্যে তিনি সেরুজ, লরেল বেরি, গঁদ, সঙ্গে দিলেন পোড়া সীসে, লৌহ মরচে, তার্পিন তেল, ঝাউ তেল, চর্বি এবং ষাঁড়ের খুরের মেদ ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত মলম নিয়ে তিনি ও তাঁর সহকারী রোগীর হাত, পা, কোমর প্রভৃতি স্থানে সমানে মালিশ করতে থাকলেন এবং নাভি-অঞ্চলেও আরেকটি কি বস্তুর প্রলেপ লাগাতে লাগলেন। তার কিছু কিছু পেশেণ্ট সর্বাঙ্গে দুর্গন্ধময় এই মলমের প্রলেপ সহ উত্তপ্ত চুল্লী সন্নিধানে পাকা তিরিশ দিন পর্যন্ত কাল কাটাতে বাধ্য হল। তারা যদি এই প্রবল উত্তাপ চিকিৎসান্তেও জীবিত থাকত তো তাদের রোগ নিরাময় হয়ে গেছে বলে ঘোষিত হত। অপরাপর কিছু রোগীকে ঘরে উনুন জ্বেলে একটি বিছানায় শুইয়ে তাদের গায়ে গোটা কয়েক কম্বল চাপা দিয়ে বিছানার তলায় খাটের স্প্রীং-এর নীচে জলন্ত কয়লা ছড়িয়ে রেখে দরজা জানালা বন্ধ করে দেওয়া হত। সহজেই অনুমেয়

এমত অবস্থায় বহু রোগী চিকিৎসার চেয়ে রোগে মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ বলে বিবেচনা করত, কেননা এ অসহনীয় বেদনাময় পদ্ধতি, যার দ্বারা কোন ফলই হত না, তাকে সভয়ে পরিহাস করে চলত।

এরপর বেপরোয়া কিছু চিকিৎসক ঘোষণা করলেন সিফিলিস সারাবার একমাত্র ঔষধ হল তথাকথিত 'পবিত্রকাষ্ঠ' (লিগনাম স্যাংটাম)। এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আমস্টারডামের ডাক্তার উলরিচ ভ্যান হাটেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ভি. ডি. রোগীকে যদি একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পাকা চল্লিশ দিন একমাত্র লিগনাম স্যাংটাম চোকলা ছাড়া কিছু খেতে না দিয়ে বন্দী করে রাখা যায় তবেই রোগী উক্ত রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

ভ্যান হাটেন স্বয়ং এ রোগ বাধিয়ে বসলো ভেরোনা শহরের রাস্তায় ঘোরা এক গণিকা সম্ভোগে। তিনি নিজে উক্ত পবিত্র কাষ্ঠ চোকলা ভক্ষণ পদ্ধতিতে 'সেল'-এ চল্লিশ দিন থেকে উপবাসে জীর্ণশীর্ণ চরম দুর্বল হয়েও অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, আমি সেরে গেছি। এই পবিত্র কাষ্ঠের কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। এ পবিত্র কাষ্ঠ প্রকৃতই ম্যাজিক কাষ্ঠ।

ডাক্তারের এ উচ্ছ্বাস যে কত মিথ্যা তা প্রমাণিত হয়ে গেল দুই সপ্তাহ পরে অনাহারজনিত জীবনী-শক্তি হ্রাস ও সিফিলিসের প্রচণ্ডতায় তার মৃত্যু হল। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই 'লিগনাম স্যাংটাম' চিকিৎসা পদ্ধতি চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল।

সারা ইয়োরোপীয় রাজ্যের পৌর প্রতিনিধিরাই ঐ রোগীদের কোয়েরেন্টাইন পদ্ধতিতে বন্দী রেখে রোগ বিস্তার রোধে বিফল হল। বিদেশী আগন্তুকদের শহর বন্দর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল তাদের ক্ষেত্র বিশেষে পাথর মেরে বা প্রহারে জর্জরিত করে মেরে ফেলা হল। রুগ্ন পর্যটকদের নদীতে বা কুঁয়োতে ফেলে বধ করা হল। স্বদেশী নাগরিকরাও রোগাক্রান্ত হলে এর চেয়ে কিছু কম নিগৃহীত হল না।

পোল্যাণ্ডের ক্রাকাউ শহরের ক্রুদ্ধ গৃহিণীরা দল বেধে আক্রমণ করলো সেখানকার কুখ্যাত এক গণিকালয় (অন্তত এক বছর বন্ধ থাকবে মিউনিসি-প্যালিটির এই নির্দেশ উক্ত গণিকালয় অমান্য করেছিল), তারপর রান্নার তেল ঢেলে সে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। সে আগুনে পুড়ে মরলো ছজন গণিকা ও পাঁচজন খদ্দের পুরুষ।

ইওরোপের মধ্যে ভেনিস নগরীই সর্বাধিক ভাবে আক্রান্ত হয়েছিল এই জঘন্য ব্যাধিতে। ১৪৯৫-তে ওখানকার ৩ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ১১,৬৭৫ জন

ছিল গণিকা। নানা প্রকার যৌন বিকৃতির খেলা চলতো সেই সব বেশ্যালয়ে, ফলে এ রোগও হু হু করে হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়লো সারা ভেনিস-এ।

গ্র্যাণ্ড ক্যানাল-এ প্যালাজজো দা মস্টোতে ভেনিসিয়ান প্রিন্সদের হাতে অস্ত্র দিয়ে দেওয়া হল ডিসেম্বর মাসে, কেন না সে সময়েই উক্ত জল-নগরীতে সর্বাধিক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। সিফিলিসে মরা আট হাজার ভেনিসিয়ান নর-নারীকে খালের জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে মৃতদেহের দ্বারা আবহাওয়া দূষিত না হয়।

অভিজাত সম্প্রদায় ভুল করে ভাবলো যে সাধারণ নাগরিকদের শত হস্তের দূরে রাখলেই এ রোগ থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব, তাই তারা তাদের প্যালেস এবং দুর্গসমূহ সদা সতর্ক প্রহরী দ্বারা ঘিরে রাখলো। তাদের দুর্গের খুব নিকটে আসা নৌকারোহীদের প্রতি জলন্ত অগ্নিসহ তীর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করলো।

কিন্তু এই অভিজাত সম্প্রদায় ভেবে দেখলো না যে এই জার্মান পক্স রোগ তাদের স্বজাত অভিজাত রক্তের দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে। প্রাসাদের মধ্যে ভিড করা বেশ কিছু প্রিন্স এই জঘন্য রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পডলো। কিভাবে তাহলে এল এই রোগ? এলো একটি পরিচারিকা মারফৎ। 'প্যালাজজোতে উক্ত যুবতীকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল নিঃসঙ্গ প্রাসাদ বন্দী কিছু প্রিন্সদের মনোরঞ্জনার্থে, ফলে এই যুবতীই তার রাজকীয় প্রণয়ীদের এই রোগটি উপহার দেয়।

এক মাস বাদে দেখা গেল প্রাসাদের শরণার্থী ৩৫ জন প্রিন্সের মধ্যে মাত্র তিনজন রোগ এড়িয়ে তখনও জীবিত আছে।

বছরে শেষে ভেনিস নগরীর অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ালো। ১৭ হাজার লোক মৃত এবং ৪০ হাজার লোক রোগাক্রান্ত।

রোম নগরীর কুখ্যাত বরজিয়া বংশের গৃহচিকিৎসক ডাঃ ক্যাসপেয়ার টরেল্লা, সখেদে তাঁর ডাইরীর এক স্থানে লিখেছেন যে একমাত্র ঐ কুখ্যাত পরিবারেই তিনি সতের জন নরনারীকে ভি. ডি. রোগে ভুগতে দেখেন। সেই সতের জনের মধ্যে অচিরেই বারোজন মারা যায়।

রাশিয়াতে, আইভ্যান দি টেরিবল এই রোগের পাল্লায় পড়ে প্রাণত্যাগ করেন। ঐতিহাসিকদের দৃঢ় বিশ্বাস এই ভি. ডি-র ফলেই আইভান দুরন্ত রাগী ও হিংস্র হয়ে ওঠেন এবং সংখ্যাতীত নিরপরাধ নরনারীকে অবাধে নিধন করেন।

ইয়োরোপীয় বণিকগণ সাউথ সী অঞ্চলে এ রোগ নিয়ে যায়। সেখানে

গিয়ে শ্বেতাঙ্গ নাবিক সঙ্গ করে নেটিভ রমণীগণ আক্রান্ত হয়, কিছুকাল মধ্যেই দ্বীপের পর দ্বীপের পনেরো আনা জনসংখ্যা মৃত্যুকবলিত হয়ে যায়।

প্রখ্যাত অভিযাত্রী ভাস্কো-ডা-গামার নাবিকবৃন্দ, যারা পূর্বেই ইয়োরোপ থেকে রোগ বাধিয়ে ফেলে, তারা এই কালান্তক 'পক্স' বহন করে নিয়ে আসে ভারতবর্ষে। বিদেশী ও নতুন মেয়ে দুইয়েরই পদসঞ্চার হল ভাস্কো-ডা-গামার সৌজন্যে। ফরাসীদেশ ও জার্মানী থেকে বিতাড়িত জিপসীরা এই রোগের বিভীষিকা কালক্রমে ছড়ালো অন্তত বারো চৌদ্দটি দেশের অজ পাড়াগাঁয়েও।

তবে পরবর্তী বছরের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি এ ভয়ংকর রোগের প্রকোপ বহুলাংশে তেজ হারিয়ে যেন স্তিমিত হয়ে পড়লো। মহামারী আর রইল না। অবশ্য পরবর্তী চার শতাব্দী ধরে এ রোগ নিরবধি ধারায় সংক্রামিত হতে থাকলো ঠিকই, তবে ১৪৯৬-এর অকল্পনীয় ভয়াভয় আর রইল না। তবে এক বছরই কয়েকশ বছরের ট্যাক্স নিয়ে গেল। শুধু সেই কুখ্যাত বছরটিতেই ইয়োরোপ থেকে ঐ একটিমাত্র যৌনরোগ দেড়কোটি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে পরপারে চালান করে ছাড়লো।

তবে এ রোগ বুঝি অমর, তাই আজও এই 'পক্স' সারা বিশ্বব্যাপী রাজত্ব করে চলেছে অবাধ গতিতে।

পরমাশ্চর্য সব নতুন নতুন চমকের যুগ গেছে বিংশ শতাব্দীর সেই দ্বিতীয় দশকের অবিস্মরণীয় বছরগুলিতে।

সেই উনিশ শ' কুড়ি খ্রীষ্টাব্দের পর পর বছরগুলিতে আমরা পাই লিণ্ডবার্গ, বাথটাব জিন, মডেল টি ফোর্ড গাড়ি, দিক্‌বিদিক মাতিয়ে তোলা ফিল্ম স্টার রুডলফ ভ্যালেন্টিনো এবং মাংকি গ্ল্যাণ্ডস্ বা বাঁদরের গ্রন্থি।

লোকের মুখে মুখে তখন ঐ এক কথা, মাংকি গ্ল্যাণ্ড আর মাংকি গ্ল্যাণ্ড। জনতা জয়ধ্বনি করে উঠলো, একেই বলে 'ফাউণ্টেন অব ইয়ুথ' বা যৌবন ঝর্না।

ধরুন, আপনি যদি সে যুগের লোক হতেন এবং বার্ধক্য এসে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করত আপনাকে, আর তখন আপনি পূর্বেকার মত উৎসাহ উদ্দীপনা বা এনার্জি পাচ্ছেন না কোন কিছুতেই। যদিও হয়ত বা তখনও আপনি মনে মনে কিঞ্চিৎ যুবভাবাপন্ন ছিলেন এবং সত্যি কথা বলতে কি, সুন্দরী যুবতী দর্শনে অদৃশ্যে রোমাঞ্চিত হয়ে মনে মনে আপনার নানাবিধ আকুলি-বিকুলি ভাব জাগরিত হয় অর্থাৎ তখন আপনার সেই অবস্থা যাকে বলে সাধ আছে অথচ সাধ্য নেই। এবং বৃদ্ধকালে যদি আপনার যথাযথ আর্থিক সঙ্গতি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি হাতের কাছের ট্রেন, জাহাজ ধরে গিয়ে উপস্থিত হতেন 'দি মাংকি গ্ল্যাণ্ডম্যান' নামে পরিচিত ডাক্তার সার্জ ভরোনফের প্যারিসস্থ ক্লিনিকে চিকিৎসিত হতে।

আর যথাকালে তাঁর হাতে অপারেশন করিয়ে পূর্ণ-যৌবন লাভ করে সোল্লাসে ফিরে আসতেন স্বগৃহে।

অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই শল্য চিকিৎসক মানুষের বয়সের ঘড়ির কাঁটাকে পেছনমুখো চালিয়ে হাজার হাজার অসমর্থ, অক্ষম, বয়স্ক এবং ধনাঢ্য মানুষকে পুনরায় তাদের অভাবিত রোমান্সের তথা প্রেম, প্রণয় ও কামলীলার জীবনে প্রত্যাবর্তন করিয়ে ছেড়েছিলেন।

ডাঃ ভরোনফ-এর চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল চমকপ্রদ ধরনের নতুন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, তিনি একটি শিম্পাঞ্জীকে 'খাসি' করে তার গ্ল্যাণ্ডকে তুলে এনে আপনার জরাজর্জরিত অক্ষম দেহে পুনঃসংস্থাপিত করে দিতেন, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে আপনার শরীর থেকে জরাজীর্ণ বহু বছর

বয়সের অসহনীয় গুরুভার নিমেষে গলে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

প্রকৃতপক্ষে শত শত বয়োবৃদ্ধ পয়সাওয়ালা সম্ভ্রান্ত মানুষের সে-যুগে প্যারিস নগরীতে গেছে এই ডাঃ ভরোনফ-এর কাছে তার জাদু চিকিৎসা করাতে। চিকিৎসান্তে তারা ফিরে এসেছে উজ্জ্বল দৃষ্টি ও উৎসাহ উদ্দীপনা বলবীর্যে ঝলমল হয়ে। আর ক্ষেত্রবিশেষে নিজের বয়স অপেক্ষা তিরিশ বছরের ছোট কোন রূপসী তরুণী ফরাসী কন্যাকে বিবাহ করে নিয়ে স্বদেশাভিমুখে রওনা হয়ে গেছে নতুন করে সংসার পাতবার মানসে।

ডাঃ ভরোনফ-এর এই চিকিৎসা পদ্ধতি শুধুমাত্র পুরুষ পেসেণ্টেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কিছু বেশী অর্থ নিয়ে তিনি কোন মাদী বাঁদরের যৌন অঙ্গ তুলে এনে যে কোন আগ্রহী বয়স্কা মহিলার দেহে সংস্থাপিত করে দিতেন।

যেমন, একদা ব্রেজিলের ৪৮ বৎসর বয়স্কা এক মহিলা সমুদ্র পেরিয়ে এসে উপস্থিত হল প্যারিসের ভরোনফ-এর ক্লিনিকে।

মহিলা সখেদে ডাক্তারকে বললেন, ডাক্তার, আমার স্বামী আমাকে বুড়ী গণ্য করে আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাই আমি সর্বপ্রথম জাহাজটি ধরে আপনার কাছে চলে এসেছি গ্র্যাফ্‌টিং করে পুনর্যৌবন লাভ করতে। আমায় বাঁচান।

ভরোনফ মহিলাটিকে ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। পরে তিনি তাঁর কেস-বইয়ে লিখলেন : আমি মনে করি, এই কেস-এ গ্র্যাফ্‌টিং করাটা হবে নীতিগতভাবে খুবই পবিত্র কর্ম। কেন না, এর দ্বারা সামাজিক দিক থেকে এবং একটা ফ্যামিলির শিথিল হয়ে যাওয়া বন্ধনকে পুনরায় সুদৃঢ় করতে সাহায্য করা হবে। মহিলাটি তাঁর নিষ্ঠুর স্বামীকে নতুন করে প্রাপ্ত সৌন্দর্য নিয়ে পুনরায় জয় করতে সমর্থ হবেন।

চিকিৎসান্তে ভদ্রমহিলা ব্রেজিলে ফিরে যান। এরপর কিছুকাল আর ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না। অতঃপর একদিন মহিলাটি ফের এসে উপস্থিত হলেন প্যারিসে। এবার সঙ্গে এনেছেন তাঁর দুই দাদাকে একজনের বয়স ৬১, অপরজনের ৫৭। তাঁরাও এসেছেন বোনের মত ডাঃ ভরোনফের কাছে অপারেশন করাতে।

ডাক্তার কিন্তু তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিলেন তাঁর ভূতপূর্ব পেশেণ্ট এই ভদ্রমহিলার পানে। সাবাস! কে বলবে এ মহিলা পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন? কারুর সাধ্য নেই এঁকে পঁয়ত্রিশ বছরের উর্ধ্বে ভাবে।

মহিলা কিঞ্চিৎ সলজ্জভাবেই ডাক্তারের কাছে স্বীকার করলেন যে সম্প্রতি

তিনি তাঁর চেয়ে ছোট তরুণ বয়স্ক ছেলেদের সঙ্গেই মেলামেশা বেশী করছেন।

ডাক্তার যখন জানতে চাইলেন মহিলাটি বর্তমানে তাঁর স্বামীকে নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাচ্ছেন কিনা? তদুত্তরে মুখ বিকৃত করে তাচ্ছিল্যের স্বরে মহিলাটি বলে উঠলেন, আরে ছোঃ! ফের ঐ বাস্টার্ডটার কাছে ফিরে যাওয়া, বলেন কী? বিশেষ করে আমার বর্তমানের দেহ ভরা যৌবনের পসরা নিয়ে যাব ঐ বুড়ো স্বামীর কাছে! নট্ অন্ ইওর লাইফ। ঐ বুড়ো আমার এ দেহের উপযুক্তও নয়, ডাক্তার।

ভরোনফ-এর নাম যে কেসটির দ্বারা বিশ্ব-চরাচরে ছড়িয়ে পড়ে এবং রাতারাতি তিনি অতি প্রখ্যাত হয়ে যান, সেটি হল জনৈক ৭৪ বৎসর বয়স্ক প্রখ্যাত একজন ব্রিটিশ স্টেটস্‌ম্যানকে সফল চিকিৎসা করে। এই বৃদ্ধ রাজনীতিক কোন উপায়ান্তর না দেখে শেষ আশ্রয় হিসেবে এসেছিলেন ডাঃ ভরোনফ-এর কাছে চিকিৎসাপ্রার্থী হয়ে।

ভদ্রলোক ছেলে বয়সেই ভয়াবহ যৌনরোগ গণোরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, ভারতবর্ষে গিয়ে ম্যালেরিয়ায় পড়েন, ইয়োরোপে হয় স্মল পক্স। অপারেশনের দু' বছর আগে অর্থাৎ ৭২ বৎসর বয়সের সময় তাঁর ছিল পেরিটনাইটিস্ এবং ছিলেন ক্রনিক মাতাল। যদিও তিনি ব্রিটিশ স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন অতি সম্মানীয় পদে আসীন ছিলেন, তবু তাঁর জীবনযাপন ছিল অতীব নোংরা এবং উচ্ছৃংখলতায় ভরা।

তিনি যখন প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে এসে উপস্থিত হলেন ভরোনফের ক্লিনিকে তখন তাঁর দেহ বেঁকে গেছে, হাতে লাঠি ছাড়া চলতে একেবারেই অক্ষম। স্মরণশক্তি খুবই ক্ষীণ, মন ও চিন্তাধারা ঝাপসা ও বোঁদা হয়ে গেছে। সঙ্গত কারণেই তিনি প্রায় এক যুগ ধরে পরিপূর্ণভাবে পুরুষত্বহীনতায় ভুগছিলেন।

ডাঃ ভরোনফ একটি তরতাজা শিম্পাঞ্জীর অণ্ডকোষদ্বয়কে অপারেশন করে পুনঃসংস্থাপিত করলেন এই প্রখ্যাত এবং কনডেমড্ বৃদ্ধের অঙ্গে। দু' সপ্তাহ বাদে বৃদ্ধ ডাক্তারের হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেলেন স্বদেশে।

এর প্রায় আট মাস বাদে ডাক্তারের সঙ্গে এই যুবশক্তি ফিরে পাওয়া বয়োবৃদ্ধ স্টেটস্‌ম্যান-এর পুনরায় সাক্ষাৎকার হল।

নিজের কৃতিত্বে নিজেই চমকিত হলেন ডাক্তার। ৭৪ বৎসর বয়স্ক দেহমনে কনডেমড্ হয়ে যাওয়া প্রখ্যাত ইংরেজ রাজপুরুষকে আর চেনা যায় না। দেহ থেকে বাড়তি চর্বি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বৃদ্ধ এখন যুবকের মত ঋজু হয়ে হাঁটেন চলেন দাঁড়ান। চলাফেরা এত দ্রুত ও স্মার্ট যে, মনে হয় তিনি যেন এক

অনুশীলিত যুবক অ্যাথলেট। চোখ ও দৃষ্টি তারুণ্যে উজ্জ্বল, মাথায় নতুন করে চুল গজিয়েছে। শরীর থেকে টুপ করে পাক্কা ২৪টি বছর যেন খসে পড়ে গেছে। পঞ্চাশের ওপর কিছুতেই মনে হয় না ভদ্রলোককে।

রাজনীতিবিদের মুখেই সব শোনা গেল। অপারেশনের পর থেকেই ভদ্রলোক সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে পর্বতারোহণ এবং স্কীইং করে যাচ্ছেন প্রায়শঃই। আবার পূর্বেকার অভ্যাস ফিরে এসেছে। নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করলেন তিনি, যে বর্তমানে সারা ইয়োরোপ চুঁড়ে তিনি বিভিন্ন মেয়েদের পেছনে ঘুরছেন এবং তাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভ করে চলেছেন। এও জানালেন যে, তাঁর পুরুষত্ব স্বাভাবিকভাবে যৌবনে যেমন ছিল তার চেয়েও আরও ভালভাবে নাকি ফিরে এসেছে। সপ্তাহে তিন চারবার তাঁর নারীসঙ্গলাভে আদৌ ক্লান্তি আসে না। তিনি নিয়মিত যুবতী মিলনরূপ অভ্যাসটি চালিয়ে যাচ্ছেন।

শুনে তো স্বয়ং ডাক্তারই 'থ' হয়ে গেলেন হতচকিত হয়ে। বলে কি পরমলোভাতুর অবৈধ কামলালসাক্রান্ত এই তিনি, যে বর্তমানে সারা ইয়োরোপ চুঁড়ে তিনি বিভিন্ন বুড়ো হাড়ে।

ডাঃ ভরোনফ সাবধান করে দিলেন তাঁর এই প্রখ্যাত ইংরেজ পেশেণ্টকে ; না অতোটা ঐ লাইনে যাবেন না এত অল্প সময়ে, এত বেশী বার। প্রকৃতির নিয়মেরও একটা সীমা আছে, তাকে সাময়িক দম্ভ ও দর্পভরে লঙ্ঘন করা কিন্তু বিপজ্জনক। জীবনকে অন্যভাবে উপভোগ করুন। সুরা নারী ছাড়া কি আর কোন আনন্দঘন দিক নেই ?

কিন্তু ধর্মকাহিনী শোনবার বান্দা ছিলেন না ইংরেজ মহোদয়। তিনি ডাক্তারের হুঁশিয়ারীতে থোড়াই কর্ণপাত করলেন। চলতে লাগলো তাঁর ইচ্ছাপূরণের লালসাঘন দ্রুতলয়ের জীবন। দুর্মদ দুর্দান্ত গতিতে তিনি পেছনে গর্ভবতী নারীর দল ও সুরা নিঃশেষিত খালি বোতলের মিছিল ফেলে রাখতে রাখতে সম্মুখ পানে এগিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু হায়! তাঁর গন্তব্যস্থল যে ছিল মৃত্যুগহ্বর, সে-কথা তিনি বুঝেও বোঝেন নি।

তিনি অচিরেই অর্থাৎ দু' বছর সাত মাস বাদে অ্যালকোহলিক বিষক্রিয়া এবং 'অপর আরেকটি গুহ্য কারণে' প্রাণত্যাগ করেন। হায় রে! কি বিচিত্র উদ্ভট কারণেই না তাঁর ইহলীলা সাঙ্গ হল। দেহের সুখের জন্য দেহত্যাগ।

এই কাহিনী অর্থাৎ প্রখ্যাত ইংরেজ বৃদ্ধের পুনর্যৌবন-প্রাপ্তির কাহিনী ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাবৎ দুনিয়ার দিক্‌বিদিক থেকে সঙ্গতিসম্পন্ন ও বহু রসিক অথচ অক্ষম বুড়োরা পড়ি-মরি করে চিকিৎসিত হবার জন্য ছুটে আসতে

লাগলো ভরোনফ-এর প্যারিসস্থ ক্লিনিকে। সে এক নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধ অক্ষম অসমর্থ এবং যৌনলালসাপাগল মানুষের মিছিল শুরু হয়ে গেল কম্পাসের কাঁটার মত একই দিকে। প্রায় সকলেই যৌবন এবং যৌবনের মজা ফিরে পাবার অভিলাষী।

অপরাপর কিছু ডাক্তারগণও গ্ল্যাণ্ড-গ্রাফ্টিং এক্সপেরিমেণ্ট শুরু করে দিলেন। এই ধরনের একটি ক্ষেত্রে প্রখ্যাত কারাগার স্যান কোয়েণ্টিন-এর কিছু কয়েদী নিজেদের বাঁদরগ্রন্থি সংস্থাপনের অপারেশনে স্বেচ্ছায় যোগদান করে। অতঃপর এই অভিনব পরীক্ষাস্বরূপ অপারেশন দ্বারা গৃহীত শরীরের বাঁদরের রক্ত সঞ্চালনের কার্যকারিতা প্রমাণের জন্যই বুঝি এক রাতে কারাগারের দেয়াল টপকে তারা হাওয়া হয়ে যায়।

সেই বিংশ দশকের একজন প্রখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বয়সেই অনুভব করলেন যে, তিনি কেমন যেন মিইয়ে যাচ্ছেন। দেহে-মনে জরা এসে জীর্ণ করে ফেলবার উপক্রম করছে তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা এবং জীবনীশক্তিকে। তিনি শুনেছিলেন ভরোনফ-এর জাদু শল্যচিকিৎসার কথা। নিজে একবার ঐ অপারেশন ট্রাই করে দেখবেন মনস্থ করলেন।

এই বিস্ময়কর চিকিৎসান্তে তিনি ফিরে গেলেন যেন তাঁর প্রথম ডগমগে যৌবনের সেই বিশ বছর বয়সের দিনগুলিতে। তাঁর প্রেম-প্রণয়, যৌন জীবন, তাঁর লেখিকারূপে সৃষ্টিশীলতা সবকিছু যেন নিমেষে ফের তুঙ্গে উঠে গেল। তিনি এর পর পুনর্যৌবন লাভরূপ এই যৌন অপারেশনকে কেন্দ্র করে একটি অতি মনোরম উপন্যাস রচনা করেন এবং অচিরেই সেটি বেস্ট সেলার গ্রন্থ হয়ে যায়। এই উপন্যাসের সৌজন্যে জনসাধারণের এই চিকিৎসার ব্যাপারে কৌতূহল সাংঘাতিকভাবে জাগরিত হয় বা বেড়ে যায়।

অবশ্য এই চিকিৎসার পক্ষে যেমন মানুষ ছিল তেমনি বিপক্ষেও ছিল প্রচুর লোক। এইসব সন্দিগ্ধমনা অবিশ্বাসী মানুষেরা এ চিকিৎসাকে উপহাস করে বহু কাহিনী, বহু মজার মজার জোক্স্ তৈরি করে প্রচার করে। এই মাংকি গ্ল্যাণ্ড বা বাঁদরের গ্রন্থি অপারেশন নিয়ে হাস্যকৌতুক কাহিনীরও অন্ত ছিল না।

এইসব চালু গল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠটি হল নিম্নরূপ :

একজন আশি বছর বয়স্ক বৃদ্ধ, যিনি নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে খুবই চালু ছিলেন বরাবর, সহসা একদিন বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে উপলব্ধি করলেন তাঁর আগের মত বলবীর্য শক্তিসামর্থ্য আর আদৌ নেই। এ অবস্থাদৃষ্টে বড়ই হতাশাসাগরে নিমজ্জিত হয়ে যারপরনাই ম্রিয়মাণ হয়ে গেলেন।

অবশেষে তিনি অগতির গতি ডাঃ ভরোনফের প্যারিসের ক্লিনিকে গিয়ে এক সেট বাঁদরের গ্রন্থি নিজ দেহে সংস্থাপিত করিয়ে নিলেন।

তারপর দেশে ফিরে এসে নতুন একজন স্ত্রীর সন্ধানে ব্যাপৃত রইলেন। এক সময় জুটেও গেল। কুড়ি বছর বয়স্কা ব্যায়ামবীর ধরনের দুকুল প্লাবিনী যৌবনসম্পন্না এক পাত্রী সংগ্রহ করে বিবাহান্তে অশীতিপর এই যুবক (?) সংসার পাতলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নবপরিণীতা পত্নী সন্তানসম্ভবা হয়ে গেল। প্রত্যেকেই পরবর্তী আট মাসকাল অতি আগ্রহে এই কথা ভাবতে ভাবতে কাটিয়ে দিল যে, দেখা যাক বুড়ো বয়সের সন্তান কেমন হয়। হবু বৃদ্ধ পিতাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কম হলেন না। কে জানে, ঐ মাংকি গ্ল্যাণ্ডের প্রভাবে শিশুটির আকৃতি-প্রকৃতি চরিত্র কি ধরনের হয়।

আট মাসকাল অতিবাহিত হবার পর একদা এক বিংশতিবর্ষীয়া গর্ভিণীকে হুইল চেয়ারে ঠেলে ডাক্তাররা নিয়ে গেল লেবার রুমে, ডেলিভারি প্রকোষ্ঠে। আর বাইরে করিডোরে বসে তখন বৃদ্ধ হবু পিতা একের পর এক সিগারেট পুড়িয়ে চেইন স্মোকিং-এর পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, চিন্তায় দুর্ভাবনায় উদ্বেগের ঠ্যালায় মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে অধীর প্রতীক্ষায় কাল কাটাতে লাগলেন।

যেন মনে হল অনন্তকাল পরে ডাক্তার এক সময় মাস্ক ও হাতের গ্লাভস্ খুলতে খুলতে বাইরে বেরিয়ে এল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বৃদ্ধ পিতা ছুটে গেলেন ডাক্তারের কাছে, অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করলেন, ছেলে না মেয়ে বেবি ডাক্তার?

ডাক্তার দু'কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে শ্রাগ্ করলো এবং বললো, আমি নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছি না। ছেলে বা মেয়ে যাই হোক, সে এখন ওপরের বাতিদানে লেজ পাকিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দোলা খাচ্ছে।

সমসাময়িক ডাক্তার সহকর্মিগণ কিন্তু ভরোনফের প্রতি তামাশা বিদ্রূপ ও বিরক্তিতে মুখর হয়ে উঠেছিল। তাদের আপত্তি ছিল এই বলে যে, এই অপারেশন পুরোপুরি বা আদৌ কার্যকরী ছিল না! অথচ ভরোনফ কিনা দুনিয়াময় এই প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন যে এটার তুল্য ফলদায়ক চিকিৎসা আর এ জগতে কুত্রাপি হয় না বা হয়নি।

এতদ্সত্ত্বেও বিদ্রূপ বিরোধীতাকে অট্টহাস্য হেনে ভরোনফ-এর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আজগুবী রকমের স্ফীত হতে লাগলো দিনের পর দিন।

লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি রোজগার করেছেন। তাঁর কাজের জন্য ফরাসী

গভর্নমেণ্ট তাঁকে যথোচিত সম্মানে ভূষিত করেছে। হু-ইজ-হু-তে তাঁর নাম যুক্ত হয়েছে। সুতরাং তিনি ঈর্ষাজর্জরিত সহকর্মী সহধর্মী ডাক্তারদের বিরোধীতায় পরোয়া করবেনই বা কেন ?

ডাঃ ভরোনফ ছিলেন দীর্ঘকায়, রোগাটে এবং ছোট্ট একটি গুম্ফ সম্বলিত মানুষ। তাঁর জন্ম হয় রাশিয়াতে, কিন্তু যৌবনেই ফরাসী দেশে চলে আসেন দেশ ছেড়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে ভরোনফ মিশরের খেডিভ-এর রয়াল ফিজিসিয়ান নিযুক্ত হন। এ কার্যে বহুদিন তাঁকে কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়াতে বসবাস করতে হয়। ঐ দেশেই তিনি সর্বপ্রথম গ্ল্যাণ্ড গ্র্যাফটিং-এর ব্যাপারে উৎসাহিত হন।

সে সময়েও মিশরের নানা স্থানে কিছু খোজা মানুষ জীবিত ছিল। যাদের শৈশবকালে খোজা করে দেওয়া হয়েছিল এ কারণে যে, ভবিষ্যতে তারা রাজকীয় হারেমে প্রহরীরূপে কাজ করবে। রাজা-রাজড়াও নিশ্চিন্ত থাকবেন তাদের রানীদের সতীত্ব বিষয়ে। কেননা, খোজা প্রহরীদের বদ অভিপ্রায় থাকলেও তাদের নারীসঙ্গম যোগ্য কোন শারীরিক ক্ষমতা ছিল না।

ভরোনফ লক্ষ্য করে দেখলেন যে কোন খোজাই ৪৫ বছর বয়সের বেশী বাঁচেনি এবং ঐ বয়সের মধ্যেই তাদের দেহে চরম বার্ধক্যের যাবতীয় উপসর্গ দেখা দিত···এবং বার্ধক্যের যাবতীয় যন্ত্রণায় জর্জরিতও হত।

ডাক্তার তখন ছাগল ভেড়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। বিশেষ করে প্রায় চলচ্ছক্তিহীন, দণ্ডায়মান হতে পর্যন্ত অপরাগ পুরুষ ভেড়া নিয়েই সবিশেষ এক্সপেরিমেণ্ট চালালেন। এই অকর্মণ্য ভেড়াদের দেহে তিনি যুবক পুং ভেড়ার যৌনাঙ্গ সংস্থাপন করে যৎপরোনাস্তি সাফল্যলাভ করলেন।

অধিকাংশ এ জাতীয় প্রাণীরা ১২ বছর বয়সেই বার্ধক্যে উপনীত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকে, কিন্তু ভরোনফ-এর অপারেশন চিকিৎসার ফলে তারা এমন কি ২০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে সমর্থ হল। বহুলাংশে তাদের আয়ুষ্কাল এইভাবে বেড়ে গেল। উপরন্তু এই প্রাণীরা আরও বেশী বয়েস পর্যন্ত সন্তান উৎপাদন ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে উঠলো। তারা ও তাদের সৃষ্ট বাচ্চারা স্বাস্থ্যে সামর্থ্যে শক্তিতে প্রাণপ্রাচুর্যে আরও বেশী ঝলমল হয়ে উঠলো।

জর্জেস নাওভিয়ন নামক অ্যালজেরিয়ান এগ্রিকালচারাল কোম্পানির ডিরেক্টর শুনেছিলেন ভরোনফ-এর ঐ ধরনের এক্সপেরিমেণ্টের কথা। ফরাসী উপনিবেশসমূহে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল যারা মূল ফরাসী দেশ থেকে ভাল জাতের

ষাঁড় আফ্রিকায় এনে স্থানীয় নেটিভ গরুদের সঙ্গে মিলন করিয়ে উচ্চ জাতের গোজাতি সৃষ্টিতে ব্যাপৃত থাকত।

এই অ্যালজেরিয়ান কোম্পানির 'জ্যাকি' নামক একটি বিশালকায় বৃদ্ধ ষাঁড় ছিল। এই ষাঁড়টি ছিল তাদের সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ প্রজনন ষণ্ড। সারা আফ্রিকা মহাদেশ থেকে বিভিন্ন কৃষকরা তাদের গরুসমূহকে নিয়ে আসত এই জ্যাকির' দ্বারা পাল খাইয়ে বাছুর উৎপাদন করতে। এজন্য তাদের আজগুবী গল্পের অর্থও প্রদান করতে হত কোম্পানিকে।

কিন্তু বর্তমানে ১৭ বৎসর বয়স্ক এই 'জ্যাকি' আজ বছর দুই ধরে গরুদের প্রতি তাকিয়েও দেখে না, কোন রকম শক্তি বা উৎসাহ নেই, সবই নষ্ট হয়ে গেছে বয়সের ভারে। ভরোনফ অ্যালজেরিয়াতে গিয়ে পশুটিকে পরীক্ষা করে দেখলেন। দেখেশুনে মনে হয়, 'জ্যাকি' যেন কষাইখানা থেকে পলাতক এক জরাজীর্ণ জীব।

'জ্যাকির' লোম ঝরে পড়ছিল, তার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেছে, সে প্রস্রাব করে ফেলে যখন তখন। গোয়ালের কোন গাভীর প্রতিই তার আকর্ষণ নেই। আর ইদানীং নতুন জোয়ান ষাঁড় দেখলে বড়ই ভীত হয়ে পড়ে।

ডাঃ ভরোনফ দু'বছর বয়সের একটি ষণ্ডের অণ্ডকোষ নিয়ে সে-দু'টিকে জ্যাকির' অঙ্গে অপারেশন করে স্থাপন করে দিলেন। ভরোনফ তার কেস-বইতে লিখলেন, আসলে একটি ষাঁড়ের উপর অস্ত্রোপচার করা, তা সে জোয়ানই হোক বা বুড়োই হোক, খুব সহজসাধ্য ব্যাপারও নয় এবং নিরাপদও নয়। কাজটি খুবই বিপদসংকুল। ওকে যদিও লোকাল এনেস্থেসিয়া প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং উপরন্তু দশ-বারো জন ইয়া জোয়ান আরব যুবক চেপে ধরে রেখেছিল, তবু শল্যচিকিৎসক দলকে বহুবারই 'জ্যাকি' গুঁতিয়ে বা ঝট্কা মেরে চিৎপটাং করে ছেড়েছে নিমেষে।

অবশ্য এই কষ্টান্তে কেষ্ট পাওয়া গিয়েছিল অর্থাৎ এই এক্সপেরিমেণ্ট পরিণতিতে খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

এই অপারেশনের অব্যবহিত পরেই ভরোনফ প্যারিস চলে যান। মাস দুই বাদে তিনি জর্জেস নাওভিয়ানের কাছ থেকে একটি পত্র পান। তাতে লেখা: যে ষণ্ডকে আপনি অপারেশন করেছিলেন সে অতি চমৎকার কাজ দিচ্ছে। ওর লোম পুনরায় ভেলভেট কোমল হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি চমৎকার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে পুনরায় 'জ্যাকি' বলবীর্যবান হয়ে উঠেছে। কয়দিন পূর্বে 'জ্যাকি' দুপুরের পূর্বেই একটি গাভীতে চার

চারবার উপগত হয়েছে, যেটা খুবই অসাধারণ ও অস্বাভাবিক। এই ষণ্ড এখন নিয়মিত তার যথা কর্তব্য কাজ করে চলেছে। আমি পরে আপনাকে জানাব যে, ঐ সব গাভীগুলি বৎসসম্ভবা হল কিনা।

এর কয় মাস বাদে নাওভিয়ন পুনরায় এক চিঠি লিখে ভরোনফকে জানিয়েছে যে, 'জ্যাকির' দ্বারা উপগত হওয়া তিনটে গরুই বাচ্চা দিয়েছে। তিনটি বাছুরই স্বাস্থ্যসম্পন্ন এবং দেখতে 'জ্যাকির' মতই হয়েছে। ইতিমধ্যে আরও ছয়-সাতটি গাভীতে এক একদিনে একাধিকবার উপগত হয়েছে এই 'জ্যাকি'। আরেকটি মজার ব্যাপার হয়েছে। আমাদের ফার্মে অপর একটি আট বছর বয়সের বলিষ্ঠ ষাঁড় আছে যার নাম সালেম। 'জ্যাকি' যখন অক্ষম ও অসমর্থ, সে-সময় সালেমই কাজ চালিয়ে গেছে এবং তখন 'জ্যাকি' ছিল মনমরা এবং ভীতু। সালেমকে সভয়ে সে এড়িয়ে চলতো। এখন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে আবার। বর্তমানে 'জ্যাকিই' পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠে ফার্মের গোয়ালের লর্ডস্বরূপ বনে গেছে। সালেম এখন ওকে মেনে চলে, সমীহ করে চলে। ফার্মের সবাই এই ধরনের পবিবর্তনের ব্যাপার-স্যাপার দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

'জ্যাকি' প্রায় তিরিশ বছর বয়েস অবধি বেঁচেছিল (অবশ্য ওকে পাঁচ বছর পরে আরেকবার অস্ত্রোপচার করে অণ্ডকোষ পুনঃসংস্থাপন করতে হয়েছিল)। সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রজনন কর্ম চালিয়ে গেছে। 'জ্যাকির' অপারেশন সাফল্যমণ্ডিত হবার পর ভরোনফ স্থির করেন যে তিনি এবার এই ধরনের চিকিৎসা মনুষের উপর প্রয়োগ করবেন।

কিন্তু কার্যকালে মুশকিল দেখা দিল। ডাক্তার এমন কোন মানুষ পেলেন না যে স্বেচ্ছায় বিজ্ঞানের প্রয়োজনে নিজ অণ্ডকোষ প্রদান করতে প্রস্তুত। তখন তিনি একটি শিম্পাঞ্জীর সেক্সগ্ল্যাণ্ড নিয়ে তা পুনঃসংস্থাপিত করে দিলেন জনৈক বয়স্ক মানুষের অঙ্গে। অত্যল্পকাল মধ্যেই দেখা গেল, সেই মধ্যবয়স্ক মানুষটি আঠারো বছরের ছোকরার মত নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে।

প্রথমে ফরাসী মেডিকাল প্রফেসন ভেরোনফ-এর কার্যাবলী ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে খুব বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখেনি। ভরোনফ যেভাবে বিজ্ঞাপন করতো যে একমাত্র মৃতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার ব্যতীত সে আর সবকিছুই করতে সক্ষম, এতে অপরাপর ডাক্তররা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে।

শত শত মানুষ এসে ভরোনফের দ্বারা অপারেশন করাতে লাগলো। হু-হু করে অর্থ আসতে লাগলো। ডাক্তার এবং তার ভাই এই লাভের টাকায়

রাজপ্রাসাদের মত বাড়ি তৈরি করলো ও বিরাট জমিদারী এস্টেট কিনে ফেললো। শোনা যায়, ডাক্তারের বাৎসরিক আয় ছিল কয়েক লক্ষ টাকা।

প্রখ্যাত এবং অখ্যাত সমস্ত ধরনের মানুষই আসতে লাগলো চিকিৎসার জন্য এই মাংকি গ্ল্যাণ্ডম্যানের কাছে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের অন্যতম হলেন জার্মানীর প্রাক্তন কাইজার উইলহেল্ম-এর ভগ্নী। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের এই মহিলা প্রেমে পড়লেন লাউবকভ নামক ফরাসী রেস্তোরাঁর ওয়েটার এক নব্য যুবকের সঙ্গে। কাইজার ভগ্নীটি এই অসম রোমান্সকে যাতে চুটিয়ে উপভোগ করতে পারেন, তাই শরণাপন্ন হলেন ভরোনফ-এর কাছে অপারেশনের জন্য।

ন্যান্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বৃদ্ধ প্রফেসার রিটায়ার-এর পরেও যাতে কর্মক্ষম থেকে অধ্যাপনা করে যেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ভারোনফের কাছে এসে অপারেশন করিয়ে যান।

কিছুকাল মধ্যেই এ কথা প্রকট হয়ে উঠলো যে, ভরোনফের চিকিৎসায় সত্যি সত্যিই ফল দেয়। এ কথা অস্বীকার করবার আর উপায় নেই। অবশ্য এ কথাও ঠিক, এই আরোপিত ক্ষমতা বা যৌবনলাভ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এক দেড় বছর পর্যন্ত এর মেয়াদ থাকে। তবে অপারেশনটি খুবই সহজ সরল, অনেকটা অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অস্ত্রপচারের মতই। এই অপারেশন প্রয়োজনানুসারে যতবার খুশী করিয়ে নেওয়া চলে।

দি ফ্রেঞ্চ মেডিকাল সোসাইটি অবশেষে ভরোনফ-এর কার্যাবলীকে স্বীকার করে নিয়ে দেশের সরকারী সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করে।

ইতিমধ্যে এই রুশ ডাক্তার অপরাপর ক্ষেত্রেও গ্র্যাফটিং নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়ে যান। তিনি হলেন অন্যতম প্রথম চিকিৎসক যিনি করনিয়াল ট্রান্সপ্লাণ্ট-কার্য সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করেন। আর অন্ধ মানুষের চোখে নতুন টিস্যু পুনঃসংস্থাপিত করে তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি সাফল্যের সঙ্গে নতুন স্টমাক লাইনিংও গ্র্যাফ্‌ট করেছেন। নতুন কিডনী বসানো এবং হরমোনের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচলন করে গেছেন।

ডাঃ ভরোনফ জীবনযাপনও করে গেছেন প্রকৃত ধনাঢ্য, অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত মানুষের মতনই। চড়তেন রোলস রয়েস গাড়ি, কোথাও ভ্রমণের সময় হোটেলের যে কোন তলার যাবতীয় ঘর ভাড়া করে নিতেন, মহামূল্য ও প্রখ্যাত দরজী নির্মিত পোশাক থাকত তাঁর অঙ্গে। তিনি তাঁর নিজস্ব ব্রাণ্ডের সিগারেট

শুধুমাত্র তাঁর নিজের জন্য তৈরি করিয়ে আনতেন কোম্পানি থেকে।

১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে যখন ডাঃ ভরোনফ-এর বয়েস ৬৮ বছর, সহসা তিনি বিশ বছর বয়স্কা সুন্দরী স্বর্ণকেশী ফ্রলিনকে (জার্মান মেয়ে) বিয়ে করে ফেললেন।

স্বাভাবিকভাবেই রিপোর্টাররা ধাওয়া করে ধরে ফেললো হনিমুন করতে যাওয়া দম্পতিকে। ভরোনফকে প্রশ্ন করলো এই বলে যে, তিনি নিজের উপর চিকিৎসা প্রয়োগ করেছেন কিনা, অর্থাৎ অপারেশন করে মাংকি গ্ল্যাণ্ড বসিয়ে পূর্নযৌবন লাভ করেছেন কিনা, নয়ত সহসা কেন এই বয়সে…!

জবাবে তিনি সহাস্যে বললেন, আমার তো মাত্র ৬৮ বৎসর বয়েস, এখনও আমি ম্যাংকি গ্ল্যাণ্ড ছাড়াই সংসার ধর্ম পালন করে যেতে সক্ষম। অবশ্য আমি মনে করি আমার এই নবপরিণীতা পত্নীর সঙ্গে সমানতালে সহবাস করতে হলে সম্ভবতঃ আমার শরীরে যথাসময়ে গ্ল্যাণ্ডগ্র্যাফটিং করিয়ে নিতে হবে। তবে বছব দশেক বাদে আমার সেই অপারেশনের প্রয়োজন হবে, তার আগে নয়!

ক্লায়েন্ট বা পেশেন্টদের চাপের জন্য ভরোনফ নিজেই একটি বানর প্রজননের ফার্ম খুলে ছিলেন ফরাসী-ইতালীয় সীমান্তে অবস্থিত গ্রিমল্ডি নামক স্থানে। এটাকে তিনি বলতেন 'স্টক অফ স্পেয়ার পার্টস'।

তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। নাৎসীরা এক সময় রে রে করে ফরাসী দেশে ঢুকে পড়লো।

স্বয়ং হিটলার এবং তাঁর সহকারীবৃন্দ প্রস্তাব দিলেন এইভাবে, ভরোনফ নতুন ধরনের এমন কোন গ্ল্যাণ্ড গ্র্যাফটিং প্রথা উদ্ভাবন করুক যাতে জার্মান সৈন্যরা এক একটি সুপারম্যান হয়ে উঠতে পারে।

ভরোনফ ঘৃণাভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, ফলে তাঁকে কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে বন্দী করে রাখবার ব্যবস্থা হয়। সৌভাগ্যবশতঃ স্বদেশপ্রেমিক গুপ্ত ফরাসী বাহিনীর সহায়তায় ডাক্তার এবং তাঁর স্ত্রী জারট্রুডকে স্মাগল করে ফরাসী দেশের বাইরে পাচার করে দেওয়া হয়।

যুদ্ধকালীন সময়টা তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করা হয়েছিল। ফরাসীদের মত উদারনৈতিক মনোভাব ছিল না আমেরিকানদের। তাই মার্কিন দেশে বসবাসকালে তাঁকে কোন মাংকি গ্ল্যাণ্ড অপারেশন কার্য করতে সম্মতি দেওয়া হয়নি।

যাই হোক, ভরোনফ চুপচাপ বসেছিলেন না তা বলে। সমানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ক্রেটিনস্‌ বা কনজেনিটাল ইডিয়টদের

(সহজাত জড়বুদ্ধিসম্পন্ন অথর্ব বা নির্বোধ) দেহে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড গ্রাফ্টিং-এর ব্যাপারে প্রচুর রিসার্চ চালিয়ে গিয়েছেন। আর আজকে ঐ ধরনের চিকিৎসা যে উদ্ভাবিত হয়েছে তার ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন তিনিই।

যুদ্ধের পর তিনি ফের ফিরে যান তাঁর মাংকি ফার্ম চ্যাটো গ্রিমল্ডিতে এবং তাঁর ক্লিনিককে নতুন করে খোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

অবশেষে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের লাউসান নামক স্থানে হৃদ্‌রোগের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৮৫ বৎসর, কিন্তু তাঁকে দেখলে মনে হত ৫০ মাত্র।

তিনি কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছেন, জীবন-যাপন করেছেন প্রকৃত একজন রাজার মতন এবং পেছনে রেখে গেছেন তুলনাবিহীন এক কিংবদন্তী। তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি গ্ল্যাণ্ড যদি পুনঃসংস্থাপিত করা সম্ভব হয় তাহলে অপরাপর গ্ল্যাণ্ডের ব্যাপারেও তা সম্ভব। তিনি এ আস্থা নিয়েই মারা গেছেন যে, ভবিষ্যত যুগে বাহু, পা, হার্ট এমন কি ব্রেন পর্যন্ত ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা সম্ভবপর হবে। জীবিত থাকাকালীন তিনি স্বপ্ন দেখতেন যে অচিরেই এমন একটি মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 'স্পেয়ার পার্টস ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠিত হবে যার সাহায্যে মানুষ নতুন জীবন পাবে, তাদের আয়ু বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ১৫০ বৎসরে এবং সে বয়েস অবধি তারা স্বাস্থ্য সামর্থ্য বলবীর্য ও যৌবন নিয়েই জীবন-যাপন করে যেতে পারবে।

একটু একটু করে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে আজ। তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে আজ আমরা ব্লাড ব্যাঙ্ক পেয়েছি এবং ভল্ট গড়েছি যেখানে চোখ এবং পাকস্থলী বরফে সঞ্চিত করে রাখা সম্ভব। প্রয়োজনানুসারে সেগুলি যাতে আহত মানুষের দেহে পুনঃসংস্থাপিত করা যায়।

ডাক্তার ভরোনফ কখনো স্বীকার করে যাননি যে তাঁর দেহে কোন গ্ল্যাণ্ড গ্রাফটিং হয়েছে, কিন্তু তিনি আসল বয়সের চেয়ে অনেক কম বয়সের আকৃতি নিয়ে মারা গেছেন। বয়সের তুলনায় কি দেহে কি মনে অনেক বেশী যুবক ছিলেন তিনি।

ঘুরিয়ে বলা যায়, সার্জ ভরোনফের জীবনে বাঁদরামি (মাংকি বিজনেস) সাংঘাতিক অর্থপ্রসূ হয়েছিল।

দেহপ্রহরণে শিকার কাহিনী

নিজের ঢলঢল যৌবনা যমজ দুটি কন্যাকে 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করে এই আটত্রিশ বছর বয়স্কা জার্মান মহিলাটি। যুদ্ধকালীন জার্মানীতে যে "অপারেশন লাস্ট" (কাম-লালসার অভিযান) চালিয়েছিল, যার একটি পর্যায়ে ছিল ব্ল্যাক-মার্কেটের প্রবঞ্চনা, অপর পর্যায়ে ছিল দেহবিহ্বল করা কামাচার। শুধু তাই নয়, এ রোমাঞ্চকর নাটকে মহিলাটি অপূর্ব কৌশলে স্বয়ং হিটলারকেও একজন অদৃশ্য কুশীলব করে ছেড়েছিল। ক্রাইম ও প্যাশনের ইতিহাসে এই নারীটির তুলনা বুঝি সে নিজেই!

কাহিনীর আরম্ভ জার্মানীর ফ্র্যাঙ্কফুর্ট নগরীতে। ১৯৪৩-এর শেষাশেষি। ফ্র্যাঙ্কফুর্টের আকাশ ছেয়ে আক্রমণ শুরু করেছে মিত্রপক্ষীয় বোম্বার বিমান বি-১৭, যার অপর নাম ছিল ফ্লাইং ফোর্টেস। কান ফাটানো আওয়াজে তারা বিধ্বংসী বোমা ফেলে শহরকে ভূমিকম্পের মত কাঁপিয়ে ফেলছিল।

নগরীর ৪১ নং কনিগস্ট্রাসে নামক রাস্তার বাড়িটার তিনতলার ঘরে দু'জোড়া প্রেমিক প্রেমিকা তখন রতিচর্চায় এতই মগ্ন যে তাদের খেয়ালই হয় নি যে এ সময়ে ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়।

—ইভা! গ্রেটা! চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে ওপরে উঠে এল ওদের মা মার্গট মুলার।

ইভা তখন ট্যাঙ্ক-ড্রাইভারের কোলে বসে পরস্পর উত্তেজনাবশে চুম্বনাদিতে ব্যস্ত। একই ঘরে অদূরে অপর একটা কৌচে বসে তখন অপর বোন গ্রেটা এক গোলন্দাজ সার্জেণ্টকে নিয়ে কামকেলীর প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল মত্ত। ১৯ বছর বয়স্কা যমজ এই কন্যাদ্বয়ের কানে মায়ের ডাক প্রবেশ করলেও লালসাবধির তারা সে ডাকে পাত্তা দিল না।

সারা অঞ্চল কাঁপিয়ে রাইন এলাকায় একটি বোমা পড়লো। ইভা! গ্রেটা! ওদের মা ঘরে ঢুকে পড়েছে তখন। প্রেমিক-প্রেমিকাদ্বয়ের তখনো হুঁশ নেই। অসহ্য ক্রোধে মা এবার এক বালতি জল উভয় প্রেমিক সহ কন্যাদ্বয়ের গায়ে ঢেলে দিলো। আচমকা ঠাণ্ডা জলের ঝাপটায় সীমাহীন কামাচারী তথাকথিত নিম্ফোম্যানিয়াম মেয়ে দুটি প্রেমালিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে সবিরক্তি চাউনি নিয়ে মায়ের পানে তাকালো।

—বিরক্ত করলাম বলে কিছু মনে করো না ইয়ংমেন, এয়ার অ্যাটাক হয়েছে শুনতে পাচ্ছ না? শীগগির নেমে এস বেসমেণ্ট সেণ্টারে। আশা করি এ অবস্থায় পুড়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে অপঘাতে মরতে চাও না।

অতৃপ্তকাম মেয়েরা একটু গাঁইগুঁই করছিল। কিন্তু খাণ্ডারনি মায়ের রক্তচক্ষু দেখে সুড়সুড় করে নেমে গেল প্রেমিক দুজনকে নিয়ে।

গ্রেটার স্বাস্থ্য ভাল কিন্তু বুদ্ধি কম। বয়স অপেক্ষা দেহ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে লাউডগার মত ফনফনিয়ে। ওকে বক্ষে ধারণ করলে নাকি তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে সমাজ সংস্কার যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির যাবতীয় ব্যাপার ভুলে যেতে হয়। অপর বোন ইভার বর্ণনাও একইভাবে দেওয়া চলে। দু'জনেই নিম্ফো জাতীয় যুবতী।

ঘণ্টা দুই বাদে বিমান আক্রমণ শেষ হলে দেখা গেল মাটির ওপরকার অট্টালিকার যাবতীয় অংশ ভেঙে পড়েছে। তখনো কিন্তু সেণ্টারের মধ্যেই মেয়ে দুটি প্রেমিকদের নিয়ে মত্ত।

পরদিন সকালেই মা মেয়েদের বললো, রেডি হয়ে নাও। আমরা বের্লিন যাব। সেখানে না গেলে আমরা পয়সার মুখ দেখব না। সেখানে গেলেই আমরা দু'দিনে ধনী হয়ে যাব।

—কিভাবে তা সম্ভব মা? গ্রেটা প্রশ্ন করে।

—আমাদের পরম প্রিয় ফুয়েরার-এর (হিটলারের) কৃপাদৃষ্টিতে কি না সম্ভব। তিনি আমাকে সাহায্য করবেনই। বলে এমন এক রহস্যময় হাসি হাসলো মা, যে মেয়েরা মায়ের এতবড় প্রেমিকের কথা জেনে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

১৯৪৪-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারী কন্যাদ্বয়সহ মার্গট ম্যুলার এসে বের্লিনে পৌছল। জন্ম দিল "অপারেশন লাস্ট"। নগরীর অভিজাত অঞ্চলে একটি ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিল সে। একজন পরিচারিকা ও একজন বাটলার নিয়োগ করলো। ইয়োরোপীয় আধুনিক ইতিহাসে সেক্স ও ক্রাইম লীলার তুলনাহীন এক খেলার প্রাথমিক ভিৎ-এর পত্তন হয়ে গেল।

নিজেও আঁটোসাঁটো যুবতী দেহের আটত্রিশ বৎসর বয়স্কা বিধবা, কামনিপুণা কন্যাদ্বয়কে আসন্ন কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়ে বললে, দেখ মেয়েরা, আমার হাতে এখন মাত্র ৯০০ মার্ক অবশিষ্ট আছে। পরিকল্পনায় এতটুকু ভুল হলে চলবে না। সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে এক অভিনব অভিযানে নামছি। সাফল্যলাভ করলে মিলিয়নিয়ার বনে যাব; আর হেরে গেলে ফায়ারিং

স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে গুলিবৃষ্টিতে মরতে হবে।

—দরকার কি এসব ঝুঁকিতে, ফিরে চল ফ্র্যাঙ্কফুর্টেই, ইভা বলে।

—সাট আপ্ বোকা মেয়ে, মা ধমকে ওঠে, আমরা মিশবো সেরা সব মানুষজনের সঙ্গে, তারা সবাই চরম ধনী এবং শক্তিশালী নাগরিক। তারা আমাদের সঙ্গে সানন্দে মিশতে আগ্রহী হবে, কেননা আমার রক্ষক যিনি আই মিন আওয়ার বিলাভেড ফুয়েরারকে তারা ভয়ও পায় ভক্তিও করে।

—তিনি কে মা? সরল মনে প্রশ্ন করে গ্রেটা।

—বোকা মেয়ে। বোঝ না, তিনি স্বয়ং অ্যাডলফ মানে অ্যাডলফ হিটলার। অতি চতুর বিধবা যুবতী যেন একটা পরম গোপন রহস্য ফাঁস করলো এমনভাবে চোখ নাচিয়ে বলে ওঠে।

পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে সুচতুরা মার্গট ম্যুলার ৭০০০ মার্ক মূল্যের অতি দামী পোশাক কিনলো নিজের আর যমজ মেয়েদের জন্য। আর কিনলো ৪০০০ মার্ক মূল্যের ব্ল্যাক মার্কেট খাদ্যসম্ভার এবং অভিজাত মদ। এ সমস্তই কিন্তু কিনলো বাকীতে। এর পর দৈনিক সংবাদপত্র ঘেঁটে নগরীর সব সেরা ফ্যাশানেবল কাফে, কফিশপ, রেস্টুরেন্ট ও বার-এর নাম টুকে নিল। সংবাদপত্রের সোসাইটি কলম দেখে শিকারোপযোগী অভিজাত ও ধনাঢ্য নর-নারীর নামও তালিকাভুক্ত করলো সযত্নে।

উপরোক্ত সময়ের মধ্যে তরুণী বিধবা তার যুবতী কন্যাদ্বয়কে নিয়ে বিভিন্ন উচ্চমানের ড্রেস-শপ, ডিপার্টমেন্ট স্টোর এবং নাইট ক্লাব প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ঐ সব স্থানে যখনই রাস্তায় বেড়িয়ে লক্ষ্য করেছে কোন অভিজাত ধনী মহিলা অমনি তাকে শুনিয়ে ট্যাক্সি ডেকেছে এবং ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলেছে, রাইখচ্যান্সেলারী চল (হিটলারের আবাসস্থল)।

তারপর ট্যাক্সি কিছুদূর গেলে মত পালটে তাকে নিজ বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে।

বাড়ি থেকে বের হবার মুখেও পড়শীদের শুনিয়ে বিধবা তরুণী ট্যাক্সি ড্রাইভারদের ঐ একই গন্তব্যস্থলের কথা বলত। উদ্দেশ্য মহৎ। অর্থাৎ ওর মুরুব্বি আর কেউ নন স্বয়ং হিটলার এ ধারণাটা যেন চমকে ওঠা পড়শীদের মনে বদ্ধমূল হয়। যেন বেখেয়ালে সে মাঝে মাঝে কল্পিত সংলাপ চালায় ফোনে, কাউকে যেন সগর্বে বলছে কার রক্ষিতা সে। হেঁজিপেঁজি কেউ নয়। তিনি স্বয়ং ফুয়েরার। এ সংলাপগুলো চলে পরিচারিকা ও বাটলারকে শুনিয়ে। যাতে তারা তাদের স্বভাবমত এ গুজবটি দিকে দিকে চাউর করে বেড়ায়।

হলও তাই।

উদ্দেশ্য সাধিত হলে সে পড়শীদের মাঝে মাঝে কফিতে ডাকে। সবাই সোৎসাহে যোগদান করে তাতে। হিটলারের শয্যাসঙ্গিনীর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের মানসে। তারাও যমজ কন্যা ও তার মাকে তাদের পার্টিতে ডাকে। সে-সব স্থানে ওদের সঙ্গে পরিচয় হয় উচ্চপদস্থ নাৎসী ভি. আই. পি.-দের পরিবারবর্গের সঙ্গে। অবশ্য মার্গট ম্যুলার হিটলারের ঘনিষ্ঠতম বাঘা বাঘা অফিসারদের বউদের সযত্নে এড়িয়ে চলে, পাছে তারা ঐ মিথ্যা গুজবের সত্যতা আবিষ্কার করে এক ঝামেলা বাধায়। তাহলে তো পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।

মা কিন্তু মেয়েদের এখন কড়া শাসনে রেখেছে। অনন্তকামী ভগ্নিদ্বয় যাতে যে কোন পুরুষ নিয়ে বেলেল্লাপনায় লিপ্ত না হয় সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি। কেন না জরুরী সময়ে অর্থাৎ পরিকল্পনামাফিক কার্যকালে এই মেয়েদের কাজে লাগাতে হবে। শিকারী ভি. আই. পি.-দের চোখে যাতে ওরা সাদা সরল নিষ্পাপ কিশোরীরূপে প্রতিভাত হয় সেই ট্রেনিং দিয়ে চললো মা-রূপিনী ডাইনী মার্গট ম্যুলার।

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই পাওনাদারদের (দোকানী) তাগাদা শুরু হতেই মার্গট আর কালক্ষয় না করে 'অপারেশন লাস্ট-এ' নেমে গেল। সে নিমন্ত্রণ করে আনলো রাইখ-ব্যাঙ্কের ভাইস প্রেসিডেন্টের স্ত্রীকে। তাকে অচিন্তনীয় খাবার দাবার সহ লাঞ্চ করিয়ে ছাড়লো। দুষ্প্রাপ্য ব্ল্যাক-মার্কেটে কেনা চিংড়ি মাছ, মাংসের স্টিক, ফল ও কফিতে আপ্যায়িত করলো তাকে।

—ওয়াণ্ডারবার! ব্যাঙ্কার গৃহিণী পরম মুগ্ধচিত্তে বললে, ভারী তৃপ্তি পেলাম খেয়ে। সব জিনিসই চমৎকার এবং সুস্বাদু।

প্রশংসা শুনে এবার আরেকটি অকল্পনীয় এবং লোভনীয় ডিস এগিয়ে দিল চতুর মার্গট ম্যুলার। তাতে ছিল খাবলা খাবলা সোনালী মাখনের দলাসহ আনারসের টুকরো।

—মাগো, এ লাঞ্চের তুলনা নেই। বের্লিনের আর কোথাও এটা সম্ভব নয়। কোন বড় হোটেলেও এ মেনু সার্ভ করতে পারবে না। আশ্চর্য লাগছে, আপনি কোত্থেকে এই দেব-দুর্লভ খাবার-দাবার সংগ্রহ করলেন? বিশেষ করে এই যুদ্ধের বাজারে?

—আমায় খুব বেগ পেতে হয় না এসব পেতে। শুনলে অবাক হবেন এত বেশি পাই যে বাড়তি খাবার আমায় ফের বিক্রি করে দিতে হয়, মার্গট ম্যুলার

মুচকি হেসে বলে, আমার, মানে গভর্ণমেন্টে আমার একজন বিশেষ বন্ধু আছেন যিনি আমায় ইমপোর্ট পারমিট পেতে সাহায্য করেন। তাঁর সাহায্যেই আমি সুইজারল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা এবং সুইডেনের সেরা সেরা খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারি।

—তিনি নিশ্চয়ই সরকারে একজন অতি ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি, প্রশ্ন করেন ব্যাঙ্কার গৃহিণী। যদিও লোক-পরম্পরায় শুনেছেন ব্যক্তিটি কে।

সুন্দরী বিধবা মার্গট যেন লজ্জায় লাল হয়ে যায় এমনি মুখ করে সলজ্জ হেসে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে, তিনি আমায়, মানে আমায় খুবই ভালবাসেন আই মিন স্নেহ করেন। আমায় জিজ্ঞেস করবেন না কে তিনি।

এইভাবে কথা শুরু। এইভাবে সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করে নিশ্চয়ই ফ্রাউ ম্যুলারের প্রচুর লাভ হয়। তা হয় বৈকি, মার্গট স্বীকার করে। তবে মুশকিল কি জানেন আমার ক্যাপিটেল তেমন নেই। শুনে সঙ্গে সঙ্গে প্রলুব্ধ প্রস্তাব দেন ব্যাঙ্কার গৃহিণী, টাকার জন্য ভাববেন না। আমি আপনাকে ক্যাপিটাল দিয়ে সাহায্য করতে রাজি। এই তো জালে পড়েছে শিকার!

যেন খুবই অনিচ্ছা, এইভাবে নিমরাজী হয় মা ম্যুলার। এই শুরু। পরবর্তীকালে পুরোপুরি ৪৬ জন নরনারী বধের এই শুভারম্ভ। প্রত্যেকেই ভেবেছে হিটলার-শয্যাসঙ্গিনীর হাতে রয়েছে প্রচুর লাভের স্বর্ণখনি। মার্গট এইসব শিকারদের সঙ্গে পাকা অভিনেত্রীর কায়দায় অভিনয় করে গেছে। প্রলোভন দেখিয়েছে যে অর্থ তার লগ্নী করবে দু'মাসের মধ্যে সেই টাকা ডবল করে দেবে সে। লোভী নাৎসীরা দু মাস তাকে আসল বা সুদ কোন টাকাই ফেরত না নিয়ে তাকে ফের ডবল করে দেবার অনুরোধ জানায় সনির্বন্ধ ভাবে। প্রতিটি শিকারকেই মার্গট হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে এ সংবাদ যেন দ্বিতীয় কোন প্রাণী না জানতে পারে। কেন না এটা পাঁচ কান হলে স্বয়ং তার ফুয়েরারের কানে একথা উঠবে। তিনি তখন খুবই অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়বেন। তিনি মনে করবেন তাঁর রক্ষিতা তৎপ্রদত্ত সুযোগ সুবিধার অপব্যবহার করে জনে জনে লাভের ব্যবসা চালাচ্ছে। নাৎসীরা সবাই জানে হিটলার ক্ষুব্ধ হলে কি তার পরিণাম হয়। এক, হয় তাদের রাশিয়ান ফ্রন্টের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাচার করা হবে। নয়ত তাকে তুলে দেওয়া হবে বিভীষিকাময় গেস্টাপোর হাতে। অতএব কারুর কথাই কেউ জানলো না।

১৯৪৪-তে দৈনিক মিত্র পক্ষীয় হাজার প্লেন জার্মানীর শহর বন্দরকে আক্রমণ করে চূর্ণবিচূর্ণ করতে লাগলো। চতুর্দিক থেকে শত্রুর চাপে সে দিশাহারা। মিত্রপক্ষ নর্মাণ্ডিতে অবতরণ করেছে। রাশিয়ার রেড আর্মি বালটিক থেকে

ব্ল্যাক সী পর্যন্ত বিস্তারিত হয়ে এগিয়ে আসছে ভীম বেগে।

মার্গট মুলার দেখলো টাকা ফেরত পাবার জন্য তার লগ্নীকারিরা চঞ্চল হয়ে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় লাখ খানেক টাকার ব্ল্যাক মার্কেট কেনা খাদ্যদ্রব্য এনে সেলারের বিশালকায় ফ্রিজে রেখে দিল। তারপর সেই শেয়ালের কুমীরছানা দেখাবার মত করে এক একজন ঘাতককে এনে সেই ঘরে ঢুকিয়ে তাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে অবিলম্বেই যে তাদের অর্থ এবার দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ হয়ে যাবে সে আশ্বাস দিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখলো।

শিকারের মধ্যে অর্ধেকেই ছিল পুরুষ। তারা পর্যায়ক্রমে সুদের আশায় এসে পড়ে যেত যমজ বোন দু'জনের খপ্পরে। অপার কাম-প্রবণা মেয়ে দুটির হাত থেকে রেহাই পেলে 'বাঁচি' এরকম অবস্থায় তারা রতিশ্রান্ত রতিক্লান্ত হয়ে সরে পড়ত। প্রয়োজনানুসারে মা মুলারও কিছু কিছু বয়স্ক শিকারদের শয্যা সঙ্গদানে তৃপ্ত করতো।

আরেকটা ঝামেলা দেখা দিল অচিরে। মা মুলার যত্রতত্র যার তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করতে দিত না মেয়েদের। নিস্ফো মেয়েরা এবার মায়ের অজ্ঞাতে বাড়ির যুবক বাটলারকে নিয়ে পড়লো! বৃষস্কন্ধ বলিষ্ঠ যুবক বাটলার ক্রমান্বয়ে ইভা ও গ্রেটা নামী দুটি সীমাহীন লালসাময়ীদের তৃপ্তিদানের নিষ্ফল প্রচেষ্টায় ক'দিনের মধ্যেই কঙ্কালসার অবস্থায় উপনীত হল।

প্রথমে অবাক্, তারপর সন্দেহ, অবশেষে দরজার ছিদ্রপথে সন্দেহ ভঞ্জন করে মা মুলার কি করবে ভেবে পেল না। মেয়েদের কড়া গলায় 'তোরা পেয়েছিস কি' গোছের কৈফিয়ত চাইল।

—বাঃ তুমি তো অজানা কারুর সঙ্গে প্রেম করতে বারণ করেছিল, ইভা বলে ওঠে।

—আর হ্যান্স (বাটলার) তো অজানা বাইরের লোক না, গ্রেটা যোগ দেয়।

—যা করেছ করেছ। আর নয়। লোকটাকে কি তোরা মেরে ফেলবি? আর নয়। এবার থেমে যা।

নিয়তিই থামিয়ে দিল। ক'দিন বাদে গাড়ি চাপা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করে বাটলারটি। জানা যায়নি এর পেছনে মায়ের গুপ্ত হাত ছিল কিনা।

পুরুষ পাওনাদারদের জমজ মেয়েরা খুশী করে ফিরিয়ে দিত। কিন্তু একবার এল বছর চল্লিশ-এর এক তরুণ অফিসার। সে তার মায়ের লগ্নী করা ৭০ হাজার টাকা ফেরত চায়। মেয়েরা সে সময়ে বাড়ি ছিল না। মা এগিয়ে

গেল দেহমন ছলচাতুরী নিয়ে। কাজ হল। অফিসারটি মদাসক্ত। প্রচুর নামী ও দামী মদ দেওয়া হল তাকে। তারপর সুরামত্ত অফিসারকে নিয়ে মা ম্যুলার তুললো দুগ্ধফেননিভ বিছানায়। চরম আনন্দঘন মুহূর্তে মা ম্যুলার এবার তার এই লাভজনক প্রবঞ্চনার স্কীমের কথা খোলাখুলি বলে দিল তরুণ প্রেমিককে। পরে তাকে বেড পার্টনার থেকে বিজনেস পার্টনারে আহ্বান জানালো। অতি চালুপুরিয়া সেই অফিসারটি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে নেমে গেল এই প্রবঞ্চনার ব্যবসায়।

তার দৌলতে ব্যবসা আরও ফুলে ফেঁপে উঠলো। মেয়েরা পুরোদমে লেগে গেল বিভিন্ন শিকারদের দেহরঞ্জনে। তাদের লাভ ছিল তাদের অপার লালসার তৃপ্তি। তাদের খদ্দের ক্রমশঃই বেড়ে গেল মায়ের ব্যবসার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। একই সময়ে বিভিন্ন ঘরে তাদের বিভিন্ন পুরুষের মনোরঞ্জন করতে হয়েছে নানা অছিলায়। অন্ধকার ঘরে যমজের এক বোনের প্রেমিককে অজ্ঞাতে প্রক্সি দিয়েছে অপর বোন।

পতনের কিছু পূর্বে বের্লিনের মানুষজন যেন অতিশোকে ক্ষেপে গিয়েছিল। চুরি জোচ্চুরি রাহাজানি মদ্যপান ব্যভিচারে ছেয়ে গিয়েছিল নগরী।

মার্গট ম্যুলার বুঝে গিয়েছিল আর নয় এবার যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।

ঐ তরুণ প্রেমিক অফিসারের সাহায্যে মার্গট ম্যুলার তার সঞ্চিত মার্ককে সুইডেনের কারেন্সিতে (ক্রনর) রূপান্তরিত করে বিশ্বের যে কোন স্থানে ব্যবহারযোগ্য ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে ফেললো।

অতঃপর অফিসার তাদের রাত্রের অন্ধকারে টেম্পলহফ্ এয়ারপোর্টে নিয়ে প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে একটা পুরনো দুই ইঞ্জিনযুক্ত প্লেন নিয়ে পাড়ি জমায় স্টকহলমে।

বের্লিনে পাওনাদারগণ মা ম্যুলারের বাড়ি এসে যখন পরিচারিকার মুখে এ দুঃসংবাদ শুনলো তখন তাদের সে কি হতাশা, ক্রন্দন ও অভিশাপ প্রদান।

প্রেমিক ও যমজ মেয়ে দু'জন সহ এবার মার্গট চলে যায় আর্জেন্টিনা। সেখানে প্রেমিকের সঙ্গে মায়ের বিয়ে হয়ে যায়। আর মেয়ে দুটি এক-একজন মায়ের কাছ থেকে তিন লাখ টাকা নিয়ে দেহ-ব্যবসায় নেমে যায়।

কালক্রমে সে টাকা ফুলে ফেঁপে কততে দাঁড়িয়েছে তা বুঝি একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। মেয়ে দুটি তাদের কাঙ্ক্ষিত জীবন পেয়ে অবশ্যই সুখী এবং তৃপ্ত। তাদের কাছে অর্থের চেয়ে দেহ-সুখই শ্রেয়তম। সেই সাধনোচিত পঙ্কিল জীবনে তারা আকণ্ঠ ডুবে গেল।

"ক্লিওপেট্রা" ও কলগার্লদের কাহিনী

—কতদিন ধরে তুমি বেশ্যাবৃত্তি শুরু করেছ ? রোম নগরীর এক হোটেলের ভাড়া করা ঘরের অভ্যন্তরে ধনী ব্যবসায়ী রসিক নাগর, শয্যায় তার কণ্ঠলগ্না উদ্ভিন্ন-যৌবনা দেহোপজীবিনীকে প্রশ্ন করে।

—বেশি দিন নয়, কৃষ্ণকেশী যুবতী জবাব দেয়, বছর খানেক মাত্র। তার আগে আমি সিনেমার ছবিতে কাজ করেছি।

অবিশ্বাসের কণ্ঠে রসিক নাগর জিগ্যেস করে, সিনেমা ? কোন সিনেমা ?

—'ক্লিওপেট্রা।' আধ ঘণ্টা পূর্বে রোমের কুখ্যাত অঞ্চল ভিয়া ভেনেতোতে সাক্ষাৎ পাওয়া কলগার্লটি বলে চলে, আমি 'ক্লিওপেট্রা' মুভি-তে ছিলাম। কি ? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? পিকচারটা একবার দয়া করে দেখে এসো। তখন তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধবদের ডাঁটের মাথায় বলতে পারবে যে তুমি এমন একটি সিনেমা স্টারলেট-এর সঙ্গে শুয়েছ যে স্বয়ং এলিজাবেথ টেলরের সাথে একই সিন-এ কাজ করেছে।

মোহময়ী হাসি এবার মিলিয়ে গেল যুবতীর। কিছুটা বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, যদি সেই 'ক্লিওপেট্রা' ছবিতে কাজ না করতাম, তাহলে এ লাইনে আসতে হত না আমায়, আজও আমি সেই ডান্সারই থাকতাম।

যেসব অজস্র উত্তুঙ্গ যৌবনময়ী 'একস্ট্রা' রোম-এ তোলা মার্কিন ছবি 'ক্লিওপেট্রা" ছবিতে কাজ করেছিল, এই গণিকাবৃত্তিতে নামা তরুণীটি তাদের অন্যতমা। টইটম্বুর সেক্স-এ মাখো মাখো করে ছবিটিকে গঠিত করতে এইসব যুবতী তরুণীরা হাজারে হাজারে এসে জড়ো হয়েছিল রোমে। তারা সারা ইয়োরোপ, আমেরিকা এবং উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সিনেমা স্টার হবার বাসনায় উড়ে এসে পড়েছিল সেখানে।

স্থানীয় ইতালীয় ছুকরিরা তো ছিলই, এছাড়া হলিউডের মেয়েরা তো এসেছিল চাকুরির শর্ত অনুযায়ী। কত দেশের নাম, কত রূপের হাট। ইংল্যাণ্ড, ফরাসী, স্পেন, হল্যাণ্ড, জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইডেন, আলজেরিয়া, মরক্কো, মিশর এমন কি ফরমোসা চীন থেকেও দুকূলপ্লাবি যৌন-যৌবনময়ী মেয়েরা সেখানে উপস্থিত হয়েছিল তখন। কেউ ব্লণ্ড, কেউ ব্রুনেট, কেউ রেড হেডস, কারুর গায়ের রঙ সাদা, কারুর শ্যাম, কারুর বাদামী, কারুর সোনালী।

সে এক যুবতীর হাট, যুবতীর মেলা।

তাদের মধ্য থেকে শত শত মেয়েকে 'একস্ট্রা' হিসেবে ভাড়া করা হয়েছিল। সিনেমায় তারা 'ক্লিওপেট্রা'র পরিচারিকা, ক্রীতদাসী এবং নর্তকী হিসেবে কাজ করেছিল। সিজারের প্রাসাদের ব্যাঙ্কোয়েট হল-এ উৎকট স্ফূর্তিফার্তা সুরা উৎসব নৃত্যানুষ্ঠান সহ মাইফেলিয় দৃশ্যে বিশালকায় সেটটি পূর্ণ করা হত শত শত অর্ধনগ্না এইসব যুবতীদের দ্বারা।

সিনেমায় এই জাতীয় যৌন উন্মাদনাময় দৃশ্যাদির প্রচলন করে বক্স অফিসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হলিউডিও এক পুরনো টেকনিক বিশেষ। আর এই বইটির জন্য প্রস্তুত মাইফেলিয় দৃশ্য বুঝি পূর্বতন অপরাপর যৌন উন্মাদনাময় দৃশ্যের চেয়ে শতগুণে বেশি আকর্ষণীয় করা হয়েছিল। এইসব কলহাস্যধ্বনিত চলমান ঝরণা-সদৃশ যুবতীদের কোমরের ঊর্ধ্বে কোন আবরণ ছিল না, আর কোমরের নিচে অতি অকিঞ্চিৎকর বস্ত্রখণ্ড দিয়ে শালিনতা বাঁচানো হয়েছিল মাত্র।

এই অভূতপূর্ব দৃশ্যকে পরিপূর্ণ নিখুঁত করে তুলতে স্বয়ং 'ক্লিওপেট্রা'কেও অর্থাৎ উক্ত চরিত্রে অভিনয়কারিণী এলিজাবেথ টেলরকেও প্রায়-নগ্নিকা হতে হয়েছিল।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, পরিপূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় নগ্ন দৃশ্যের ব্যাপারে ইওরোপীয় কোন দেশের সেন্সারেরই আপত্তি নেই, তারা তাতে ভ্রূক্ষেপও করে না, বরং রসিয়ে রসিয়ে তা উপভোগই করে থাকে। কিন্তু শুনলে অবাক্ লাগে আমেরিকার সেন্সর বড় কড়া এ বিষয়ে। তাই 'ক্লিওপেট্রা' ছবিটিকে দুটি ভার্সনে তোলা হয়েছিল নাচগান মাইফেলীয় দৃশ্যগুলিকে। আমেরিকান ভার্সানে নর্তকী মেয়েদের একটি করে বক্ষবন্ধনী ব্যবহার করতে হয়েছিল। আর ইয়োরোপীয় ভার্সানে একেবারে উদোম।

এইসব লচ্‌পচে দৃশ্যাদি তোলবার সময়ে পরম পুলকিত দেহে মনে অবলোকন করেছে ক্যামেরাম্যানেরা, অভিনেতারা, লাইটম্যানবৃন্দ এবং পুরুষ একস্ট্রার পাল। সবচেয়ে উদাসীন থেকেছে বুঝি স্বয়ং লিজ টেলর। বিরক্তি ভাবকে চাপা দেবার জন্য এসব সিন প্রস্তুতিকালীন সময়ে তার মুখে ফুটে উঠেছে স্ফিংসের মুখের অলৌকিক হাসি। তাকে অধিকাংশ সময় মনে হয়েছে সে যেন নীল নদের চড়াভূমিতে রোদপোয়ানোরত একটি উদাসীন কুমীর। হলিউডের রানী এলিজাবেথ-এর কাছে এ ধরনের চরম যৌন উন্মাদনাময় দৃশ্য প্রথমও নয় শেষও নয়। এ হেন সেক্স-শক প্রুফ অভিনেত্রীও চমকে উঠতো বা ভয় পেতো যদি ঘুণাক্ষরেও তার জানা থাকতো যে 'ক্লিওপেট্রা'র পার্শ্বচরী এইসব 'একস্ট্রা'

মেয়েরা সেট-এর বাইরে ব্যক্তিগত জীবনে যে যৌন-হুল্লোড়ে মেতে উঠেছিল তা বুঝি চলচ্চিত্রের দৃশ্যকে এক টিপে নস্যির সামিল করে ছেড়েছে।

সিনেমার এইসব 'একস্ট্রা' যুবতীরা স্টুডিওর বাইরে আজগুবি মূল্যে ঘণ্টাভর ও রাত্রিভর চুক্তিতে নিজেদের বিক্রী করে দিত নারী মাংসলোভী বিভিন্ন নর-নেকড়েদের কাছে। হোটেলে-মোটেলে ধনীদের বাগানবাড়িতে গড়ে উঠতো স্ফূর্তি মহল।

সিনেসেট্টা স্টুডিওতেও সুটিং চলছিল 'ক্লিওপেট্রা' ছবির।

যথারীতি যৌন-সন্ধানীরা জুটে গেল দলে দলে। শুলুকসন্ধানীর দল, দালাল, বদমাইস, নারী মাংসলোভীদের নজর পড়ে গেল এই শত শত প্রস্ফুটিত যুবতী পুষ্পের প্রতি। দেশ-বিদেশের সেরা সুন্দরীদের প্রতি। নেকড়েদের জিভে লালা নিঃসরণ বেড়ে গেল। তারা আঘাত হানলো, নানা রূপে, নানা ভঙ্গিতে মেয়েগুলিকে আদিম পেশায় নামাবার কুমানসে।

কেউ স্টুডিও মালিকের ছদ্মবেশে জেনে নিল কারা কারা স্টুডিওতে 'একস্ট্রা'র কাজ করছে এবং কাদের কাদের বাইরে এনে কব্জা করা সম্ভব হবে। খাটানো সম্ভব হবে। ভোগ করা সম্ভব হবে। রোজগারের শিকার হবে। এইসব শয়তানরা তথাকথিত 'ক্রীতদাসী' এবং 'বেলি ডান্সার'দের কাছে নিজেদের ডিরেক্টর, প্রডিউসার প্রভৃতি রূপে পরিচয় দিয়ে তাদের ভবিষ্যতে 'স্টার, বানিয়ে দেবে, 'হিরোইনের' চান্স দেবে তাদের অদূর ভবিষ্যতের কাল্পনিক ফিল্মে, এইসব প্রলোভনের টোপ দিয়ে মুঠোর মধ্যে নিয়ে ফেললো।

আরেকদল বদমাইস, নিজেদের সাচ্চা বিজনেসম্যান রূপে পরিচয় দিয়ে অতি সুলভ মূল্যে এবং সহজ অবিশ্বাস্য কিস্তিতে মেয়েগুলিকে নানাবিধ লোভনীয় ও মহামূল্য জুয়েল, ফার এবং দামী পোশাকাদি বিক্রী করতে থাকলো। কিছুদিন পরেই মেয়েরা বুঝতে পারলো কি ধরনের 'সস্তার' কাঁচিকলে তারা জড়িয়ে পড়েছে। শয়তানী প্যাঁচের বজ্র বন্ধনে বন্দী হয়েছে।

যখন তারা এক সময় তাদের পরবর্তী কিস্তি এবং তৎসহ উপযুক্ত সুদ প্রদানে অক্ষম হল, তখন তাদের কাছে "সিনেমাতে প্রচুর রোজগারের" প্রলোভন স্বরূপ প্রস্তাব রাখা হল, যার সাহায্যে দেনা শোধ করা সহজ হয়ে উঠবে।

এরপর মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল কিছু সিনেমা প্রডিউসারদের সঙ্গে, যারা আসলে হল রোমান এবং ইতালী-মার্কিন গুণ্ডাশ্রেণীর মানুষ।

সেই তথাকথিত 'প্রডিউসাররা' মেয়েদের সিনেমা স্ক্রিপ্ট পড়াবার কণ্ট্রাক্ট করাবার কথা বলে হোটেল-রুমে নিয়ে তুলতো। একবার লাইনে নেমে গেলে

তারা জন্মের মত ফাঁদে জড়িয়ে পড়তো। বদমাইসেরা এই সব নিরীহ মেয়েদের এই বলে ভয় দেখাতো যে তারা যদি লক্ষ্মী মেয়ের মত তাদের সর্ববিধ কুনির্দেশ না মেনে চলে তো তারা কালবিলম্ব না করে মেয়েদের অবৈধ বেশ্যাবৃত্তির কথা পুলিসে জানিয়ে দেবে।

ভূয়া 'স্ক্রীন' টেস্টের মহড়া দেওয়া হত হোটেল রুমের অভ্যন্তরে। সেখানে মেয়েদের বিবস্ত্র হতে নির্দেশ দিয়ে বহুবিধ অশোভন ও আপত্তিকর পোজ-এ মুভি এবং স্টিল দুরকম ফটোগ্রাফই নেওয়া হত। পরে এই সব কুৎসিত ছবি দ্বিবিধ কাজে লাগাতো ঐসব গুণ্ডা মানুষেরা। পরনোগ্রাফি এবং ব্ল্যাকমেলিং দুই ভাবেই লাগাতো সেগুলোকে। মেয়েদের শাসানো হত তারা যদি এই দুষ্টচক্রের সঙ্গে সহযোগিতা না করে তো এই সব ফটোর কপি তাদের বাড়ির লোকেদের কাছে পাঠানো হবে।

এই ভাবে ছলে-বলে-কলা-কৌশলে বদমাইসেরা প্রায় ৫০।৬০ জন 'ক্লিওপেট্রা' ছবির এক্সট্রাকে লাইনে নামিয়ে ভাল ব্যবসা শুরু করে দিল।

এই কলগার্ল অপারেশনটা পুলিসের কাছে অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয়ে যায় ছোট্ট একটা ঘটনার মারফৎ। কুখ্যাত অঞ্চল ভিয়া ভেনেতোতে একজন রোমান নেকড়ে, মেয়েদের বিরক্ত-জ্বালাতন করার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়ে যায়। লোকটা বেহেড মাতাল অবস্থায় চূড়ান্ত খিস্তি-খেউর চালিয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি সহ মেয়েদের জ্বালাতন করছিল।

পুলিশ তাকে নিয়ে হাজতে পোরে। তার পকেট-এ একটি ছোট্ট ডাইরী পাওয়া যায় তাতে প্রায় তিরিশটি মেয়ের নাম, ঠিকানা, ফোন, বয়েস ও সংক্ষিপ্ত চেহারার বিবরণ ছিল। ভাইস-স্কোয়াড তদন্ত চালিয়ে দেখে সেই সব মেয়েদের অধিকাংশই নর্তকী, অভিনেত্রী এবং এক্সট্রা রূপে নিয়োজিত হয়েছিল সিনেসেট্টা স্টুডিওতে। ক্লিওপেট্রা ছবিকে যৌন ঝলমল করবার উদ্দেশে। পুলিশ আরও খবর সংগ্রহ করে নিয়ে কতকগুলি অভিজাত ভিলা ও হোটেলে হানা দিয়ে বহু তথাকথিত 'সিনেমা স্টার' মেয়ে ও কিছু দালালকে গ্রেপ্তার করে। সে সব স্থানে যে ধরনের যৌনাচার চরম হৈহুল্লোড় লক্ষিত হয়েছে তাতে উপস্থিত থাকতে পারলে অর্জি-প্রেমিক স্বয়ং সীজারও বুঝি ভড়কে যেত তাতে সন্দেহ নেই। মেয়েগুলির বয়েস ছিল ১৭ থেকে ২৩-এর মধ্যে। এই সব মেয়েদের বেশীর ভাগই এসেছিল ভাল ও ভদ্র বাড়ি বা পরিবার থেকে। দুজন তো ছিল ইতালীর সোসাইটি গার্লদের অন্যতমা। এই সব মেয়েদের খদ্দেরবৃন্দ ছিল সর্বস্তরের মানুষ যেমন রোমান অ্যারিস্টক্র্যাট, প্লেবয়েজ, রাজনীতিক,

বাঘা বাঘা বণিককুল এবং কিছু প্রকৃত সিনেমা প্রযোজক। ধৃত মেয়েদের ৩০ জনের মধ্যে আধাআধি ছিল ইতালীয়, বাদবাকীরা কেউ ইংরেজ, কেউ জার্মান, কেউ ফরাসী কেউ বা স্ক্যাণ্ডেনোভিয়াবাসিনী। একজন ছিল আমেরিকান নিগ্রো নর্তকী। ইস্তাম্বুলের জনৈকা বেলি-ডান্সারও ছিল। আর ছিল দুজন দূর প্রাচ্যদেশীয় সুন্দরী।

অথচ মজা এই, এসব সংবাদ পেয়ে স্থানীয় সিনেসেট্টা স্টুডিওতে নিয়োজিত কর্তাব্যক্তিরা যখন ব্যস্ত হয়ে হলিউডে কেবলগ্রাম করে জানালো তখন সেখানকার টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স কর্তৃপক্ষ মহা উল্লাসিত হয়ে উঠলো। প্রত্যুত্তরে তারা জানালো, অপূর্ব, অনবদ্য, আমরা এই কলগার্ল স্ক্যাণ্ডালই চাইছিলাম। "ক্লিওপেট্রা" ছবি এমনিতেই প্রযোজকরা যা চাইছিল সেই প্রয়োজনাতিরিক্ত পাবলিসিটি পেয়ে গিয়েছিল, তার উপরে হুররে! এই কল-গার্ল স্ক্যাণ্ডেল তাদের ছবির প্রচারকে তুঙ্গে তুলে দিয়েছে এবং দেবে। চলতে দাও, চলুক।

কিন্তু এর পর বাদ সাধলো আরেকটি ঘটনা, এই ছবিতে কাজ করবার সময়ই চতুর্থবার বিবাহিতা অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলর ছবির নায়ক রিচার্ড বার্টন-এর সঙ্গে অবৈধ প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করে চতুর্থ স্বামী ত্যাগের পরিকল্পনা নেয়। ইতালীর পত্র-পত্রিকায় ছি-ছি-কার সহকারে এই স্ক্যাণ্ডালের কাহিনী ক্রমাগত ছাপা হতে লাগলো। তাতেই কল-গার্ল কেচ্ছাটা কিঞ্চিৎ চাপা পড়ে গেল। পত্র-পত্রিকাসমূহ কেউ কেউ এ ইঙ্গিতও দিল যে ছবির নায়ক-নায়িকারা কেচ্ছা কাহিনীই 'এক্সট্রা'দের কল-গার্ল জীবনে প্ররোচিত করেছে। পালের গোদারাই যদি অসচ্চরিত্র হয় তাহলে শিষ্যরা অধঃপতনে যাবে তার আর এমন বেশি কথা কি।

ভাইস-রেইড-এর কথা ঘোষিত হবার দুদিন বাদে ভ্যাটিক্যান থেকে প্রকাশিত এক সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয়তে চরম আক্রমণ করা হল লিজ টেলরকে, অভিনেত্রীর কলঙ্কজনক ব্যবহার, বিবাহ জীবন এবং সন্তান-সন্ততিদের প্রতি অবহেলা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ইত্যাদি নিয়ে। তীব্র ভর্ৎসনা করলো। স্বয়ং পোপও এ মতামত-এ সমর্থন জানালেন এবং একই ব্যাপারে ভ্যাটিকান রেডিওকেও তিরস্কার ঘোষণায় অনুমতি দিলেন। পোপ একটি স্পেশাল মেসেজ-এ রোমানদের যৌন অনুরক্তি থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিলেন।

যাই হোক, মাঝখান থেকে এলিজাবেথ টেলর মিছিমিছি অপবাদ কুড়োলো। কারণ 'এক্সট্রা' মেয়েদের ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ব্যাপারে এই

অভিনেত্রীর কোন হাত থাকবার কথা নয়। না ভালয় না মন্দয়।

অবশ্য রোমানরা ভুলে গিয়েছিল যে এই ধরনের যৌন হৈ-হুল্লোড়জনিত অর্জি বা উন্মাদনা আর গণিকাবৃত্তির বয়েস ওদেশে রোম নগরীর বয়সেরই সমসাময়িক। সুতরাং এখন হৈ-চৈ করা নিরর্থক। তবে একটা মাত্র ছায়া-ছবির ব্যাপারে এতগুলি আন্তর্জাতিক যুবতীর গণিকাবৃত্তিতে নেমে যাওয়া একটা ঐতিহাসিক ঘটনাই বটে।

ভয়ঙ্কর সেই মেয়েটি

জাপানী গ্রাম। নাম, মিটস্নি। সেখানে বিরাট ট্রাকটা এসে পৌঁছানো মাত্র অজস্র নারী ঘিরে ধরলো তাকে। নানা রকমের নারী, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পোষাক, প্রায় অর্ধ উলঙ্গ অবস্থা। হাবভাব চাউনী তাদের উদ্‌ভ্রান্তের মত।

মেয়েগুলো যেন পড়ি-মরি করে ছুটে এসে গাড়িটাকে ঘিরে ধরেছে, গাড়ির উপর থেকে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ এক মার্কীন যুবক চীৎকার করে বলে উঠলো, আহ্ হা, কী হচ্ছে কি! আমি আপনাদের খাদ্য দিতে এসেছি। এখানে আমার আসাও সেই উদ্দেশ্যেই। তোমাদের ভাষায় এদের বুঝিয়ে দাও সাইজো।

জাপানী যুবক একথা শুনে একলাফে গাড়ির চালে উঠে গিয়ে হাত তুলে মাতৃভাষায় বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। মেয়েগুলো মোটামুটি শান্তভাবে শুনে গেল।

যুদ্ধের আগে সাইজো টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরে এক বছর হার্ভার্ড-এ অধ্যয়ন করে ফিরে এসে কিয়টো কলেজে ইনসট্রাকটরের চাকরী নিয়েছিল।

যুদ্ধের সময় জাপানী ইম্পিরিয়াল হোম ফোর্স-এর ৪ নম্বর ব্রাঞ্চ-এ (গুপ্তচর বিভাগে) কাজ করেছে। আপশোস কিঞ্চিৎ যে না ছিল তা নয়। সামরিক বিভাগে থেকেও এযাবৎ একটা গুলি করবার সুযোগও তার হল না শত্রুর প্রতি।

আর সময়ও নেই উপায়ও নেই। শত্রু আর শত্রু নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। মার্কীন শত্রুরা বর্তমানে দখলকারী মিত্র,সৈন্য। মাসখানেক আগে ১৯৪৫-এর ২রা সেপ্টেম্বর ইউ এস এস মিসৌরি জাহাজে বসে আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় গেছে। সম্রাটের ইচ্ছাই শিরোধার্য। তাই সে আমেরিকানদের গ্রাম পুনর্গঠন কার্যে সাহায্যার্থে যোগ দিয়েছে। পূর্বের বৈরীভাব ভুলে, স্বদেশ জাপানকে নতুন ভাবে গড়ে তোলবার জন্য বর্তমানে মিত্র মার্কীনিদের সঙ্গে সে সানন্দে হাত মিলিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে।

এই মার্কীন যুবকটির নাম শেরম্যান লেগ। একজন মিলিটারী সার্জেন্ট। এর সঙ্গে বেশ ভাল মনের মিল হয়েছে সাইজোর। দুজনই দুজনকে বর্তমানে প্রকৃতই বন্ধু ভাবে।

কিন্তু সাইজো জানে এখনো জাপানের কিছু লোক মার্কীনদের মিত্রভাবে ভাবতে পারছে না। তাদের শপথ দেহে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত তারা শত্রুর

সঙ্গে লড়ে যাবে। লড়ে যাবে অনন্তকাল। সেই মানুষগুলি নিজেদের "সান্স অফ জিম্মু" নামে অভিহিত করে।

জাপানের আত্ম-সমর্পনের পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১৮২ জন মার্কীন সামরিক দখলকারী অফিসারসহ সৈনিক পুরুষ রহস্যজনক ভাবে মারা গেছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে বিভিন্ন দুর্ঘটনা কিন্তু অচিরেই প্রমাণ হয়েছে এসবই ঐ 'সান্স অফ জিম্মু' (জিম্মুর সন্তানদল)-দেরই প্রত্যক্ষ কাজ।

কেননা একটা ব্যাপারে ধরা পড়ে গেল। রাত এগারটায় টোকিওর গ্যারেজে সংবাদ এল তিনটি ট্রাক পাঠাও, ইয়োকোহামা থেকে সৈন্যদল আনতে হবে। তিনটি গাড়ি অন্ধকার রাতে রওনা হয়ে গেল। একশ গজ দূরেই কান-ফাটা আকাশ-আলো-করা প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে তিনটে গাড়ি ও তিনজন মার্কীন ড্রাইভার টুকরো টুকরো হয়ে গেল। চতুর্থ একজনও মারা গেল। সে জাপানী মানুষ। গাড়ি তিনটেকে সংযুক্ত তার দিয়ে ধ্বংস করবার মুখে সে নিজেও জালে আটকা পড়ে গেছে। তার বুকে একটি চামড়া বাঁধানো বই পাওয়া গেল। তাতে 'জিম্মু সন্তানদলের' যাবতীয় তথ্য পাওয়া গেল। এই সন্ত্রাসবাদীদলের মূখ্য উদ্দেশ্য হল, শত্রুকে পরম নিষ্ঠুরতায় খতম করে দাও, নিঃশেষ করে দাও, টুকরো টুকরো করে নিশ্চিহ্ন করে দাও।

এরা সম্রাট হিরোহিতোর কার্যকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করে। ঈশ্বর সহায় আছেন, যতদিন না মার্কীনদের এই পুণ্যভূমি জাপান থেকে উৎখাত করা যায় ততদিন লড়াই চালিয়ে যাব। হ্যাণ্ডবিল, প্রাচীর পত্র, মানচিত্র এবং বহু হত্যার হিসাব। মৃত লোকটির নাম ওটাকো মারু। সে নিজের হাতে ৩১ জন মার্কীনকে খতম করেছে বলে উল্লেখ ছিল সে বইতে। আরও উল্লেখ ছিল এদের দলীয় লোক ছড়িয়ে আছে সমাজের সর্বস্তরে। বিদগ্ধ সমাজ থেকে নগ্নিকা নর্তকীর অপেরা, গেইশা মেয়ে এমন কি সাধারণ গণিকাদের মধ্যেও তীব্র ঘৃণা নিয়ে ছদ্মবেশে রয়েছে এই দলের সভ্যসভ্যারা।

শুধু মার্কীন শত্রু নয় এরা ৬০০/৭০০ স্বদেশীয় জাপানীকেও মেরে ফেলেছে, একথা জানে সাইজো। অপরাধ হল শত্রুর সাহায্য করা, শত্রুর তাঁবেদারী করা, শত্রুর চামচেগিরি প্রভৃতি নানাবিধ কাজের জন্য নিহত হয়েছে তারা।

সাইজো কিছুতেই বোঝাতে পারে না এই মার্কীন সার্জেন্ট লেগ-কে যে জাপানে বিশেষ করে জাপানী গ্রামে ঘোরা ফেরার সময় তারা যেন খুবই সাবধানতা অবলম্বন করে।

হেসে উড়িয়ে দেয় লেগ। সে বিশ্বাস করে না 'সান্‌স অফ জিম্মু' বলে কোন দল আছে।

—তুমি নিজের ছায়াকেও ভয় পেতে শিখেছ সাইজো। হেসে কথাটা উড়িয়ে দেয় লেগ, কিংবা অবচেতনে হয়তো তোমার একটা অপরাধ-বোধ জন্ম নিচ্ছে। হয়ত ভাবছ তুমি শত্রুকে সহায়তা করছ। আচ্ছা তোমার কি মনে হয় নিজ দেশকে পুনর্গঠিত করতে নেমে তুমি দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকা করছ ?

—কথাটা আংশিক সত্য সন্দেহ কি, হেসেই বলে সাইজো।

আজ মিটসুনি গ্রামে এই মোটর ট্রাকের হুডের ওপর দাঁড়িয়ে সহসা একটা মৃদু কাঁপনে শিহরিত হয়ে উঠল তার দেহ। একটা অজানা আশঙ্কায় মন গেল আচ্ছন্ন হয়ে। যদি এখানে এই গ্রামে কোন 'সান্‌স অফ জিম্মু' থেকে থাকে তাহলে···সে চারিদিকে ভয়ে ভয়ে তাকালো, ভয় হল এখুনি হয়ত দেখবে তার বুক নিশানা করে একাধিক রাইফেল উঁচিয়ে উঠেছে। জিম্মুর সন্তানদের চোখে সে তো শত্রুর চামচে।

—হে মিটসুনির মেয়েরা, বলে সাইজো তার কথা শুরু করল। চতুর্দিকে মেয়েরা। ঘিরে এল সব সাগ্রহে শোনবার জন্য। অবাক কাণ্ড: চারদিকে কোথাও একটি পুরুষ মানুষ চোখে পড়ল না। এ দলের মধ্যে একটি দ' র্গাঙ্গী মেয়ের প্রতিই সর্বাগ্রে নজর যায়। সে একটু আলাদা দাঁড়িয়ে, চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন কঠোর বৈরীভাব মূর্ত হয়ে উঠছে। বোধকরি ক্ষুধায়, পেটে ভাত নেই কদিন কে জানে। অনাহারেই বোধকরি ওদের আকৃতি অমন উগ্র হয়ে উঠেছে। না না ভয়ের কোন কারণ নেই। তার আশঙ্কা প্রকৃতপক্ষে অমূলক।

—হে মিটসুনির মেয়েরা, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। একথা কি আপনারা জানেন না ?

কোন উত্তর পাওয়া গেল না মেয়েদের পক্ষ থেকে। এদের লড়াই ক্ষুধার লড়াই, বাঁচার লড়াই। আগে খাদ্য দাও, খেতে দাও।

—লাইন করে দাঁড়ান। প্রচুর খাদ্য এনেছি সবার জন্য।

বলে পেছনে গিয়ে দরজা খুললো। প্রচুর খাবারের প্যাকেট। তা দেখে হুলুস্থুল পড়ে গেল মেয়েদের মধ্যে। তাদের আর তর সইছে না। ঠ্যালাঠেলি পড়ে গেল গাড়ির কাছে এগোবার জন্য, কেউ লাফিয়ে উঠেও গেল চাকার ওপর।

—আঃ কি হচ্ছে কি ! অসভ্যতা করবেন না। ভেতরে আরো জিনিস

রয়েছে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। পোষাক আছে, ওষুধ আছে, বাড়ি ঘর তাঁবুর নানা দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে, বিরক্ত সার্জেন্ট লেগ গর্জে ওঠে।

ইতিমধ্যে বহু মেয়ে গাড়িতে উঠে এসেছিল। সাইজো ও লেগ দুজনে জোর করে ঠেলে ঠেলে সবাইকে নামিয়ে দিল।

মেয়েরা চীৎকার, গালাগালি, অবাক্য কুবাক্যে, ক্যানকেনে চীৎকারে চতুর্দিক মাতিয়ে তুললে। জাপানী ভাষায় বললেও লেগ তার অধিকাংশই বুঝতে পারল। ঘৃণা এবং ভয়েব অভিব্যক্তি মেয়েগুলির।

—লাইন করে আসুন, বলে খাবারের প্যাকেট একে একে হাতে তুলে দিতে লাগলো মেয়েগুলির। সে কি আগ্রহ, কি লোলুপতা, খাদ্যের প্যাকেট নিমেষে খুলে গপাগপ গোগ্রাসে কয়েক মুহূর্তেই খেয়ে ফেলতে লাগলো সব বয়সের মেয়েরা।

—আচ্ছা এদের পুরুষেরা কোথায়? লেগ প্রশ্ন করে।

মৃদু হাসি দেখা দেয় সাইজোর মুখে, নিষ্প্রাণ হাসি, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে সে, ওদেরই জিগ্যেস করুন।

খাওয়া শেষ করেছে এমন একটি তরুণীকে ডাকলো লেগ। বছর কুড়ি বয়েস। পেটে খাদ্য পড়ায় হিংস্র জান্তব চাঞ্চল্য ও উগ্রতা যেন মিলিয়ে গেছে। মেয়েটি এগিয়ে এল। সারা অঙ্গ লাবনী-ছানিত। কিন্তু মেয়েটির অভিব্যক্তিতে জাপানীসুলভ ভীরুভাব বা চোখ নিচু করা সলাজ ভাব আদৌ নেই। দৃষ্টিতে একটা চটুল ইসারা মনে হয়। ছেঁড়া একটা জামায় তার সুপুষ্ট বক্ষ আংশিক-ভাবে ঢাকা পড়েছে মাত্র। তন্বী তরুণীর জঙ্ঘা প্রদেশও কিঞ্চিৎ উন্মুখ হয়ে পড়েছে। লীলায়িত পদক্ষেপে সে এগিয়ে এল।

—তুমি ইংরেজি বলতে পার? লেগ প্রশ্ন করে।

—সবাই পারে না, আমি পারি, মেয়েটি জবাব দেয়।

—তোমাদের পুরুষেরা কোথায়?

—যুদ্ধ থেকে কেউ ফিরে আসেনি, মেয়েটি নিষ্কম্পকণ্ঠে বললে, তারা সব মরে গেছে।

—না না তা কেন, তারা হয়ত বাড়ির পথে রওনা হয়েছে, লেগ সান্ত্বনা দেয়, যুদ্ধ তো মাত্র কয়েক সপ্তাহ শেষ হয়েছে।

—না আমরা শুনেছি তারা সবাই মরে গেছে, এই বলে সেই তন্বী তরুণী তার লোভনীয় আকর্ষণী দেহ নিয়ে লেগ-এর আরও নিকটে সরে এসে, আসেপাশের অপর মেয়েরা যাতে শুনতে না পায় এমনি অস্ফুট কণ্ঠে, চোখে

অবৈধ চাঞ্চল্য নাচিয়ে বললে, আমি আপনার মেয়ে মানুষ হতে চাই। আমি আপনাকে তৃপ্ত করে দেব। আমার নাম টোসিই। আপনি দেখবেন—'

অপর একটি মেয়ে কাছাকাছি এসে পড়ায় সহসা সে থেমে গেল। জাপানী ভাষায় কি দু তিনটে কথা সাইজোকে বলে সে ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

একে একে বহু নারী এসে প্রায় ঘিরে দাঁড়ালো লেগ-কে। সবশুদ্ধ ৩০।৪২টি মেয়ে। এদের মধ্যে জনাদশেক তরুণী, দশ জন বৃদ্ধা, বাদবাকী ২৮।২৯ থেকে ৩৬।৩৭ এর মধ্যে বয়েস। শিশুদের চীৎকার চলছিল। বৃদ্ধাদের চোখে হতাশার চিহ্ন। কিন্তু বাকি মেয়েরা লেগ-এর পানে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছিল।

—আমাকে পাঠানো হয়েছে আপনাদের সাহায্য করবার জন্য, লেগ বলে যায়, আমি এনেছি খাদ্য, পোষাক, মাছ ধরার জাল, শস্য বীজ, যন্ত্রপাতি, তাঁবু স্টোভ ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভীড়ের মধ্য থেকে সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি সবাইকে ঠেলে পথ করে নিয়ে এগিয়ে এল। লেগ-এর সামনে এসে উদ্ধত ভঙ্গীতে কোমরে দু'হাত চেপে দাঁড়ালো, মুখে ভ্রূকুটি। সবাই যেন সভয়ে বলে উঠলো ঃ ইসিজু!

—ঐ মেয়েটা আপনাকে কি বলছিল? অদূরে দাঁড়ানো টোসিই-র প্রতি আঙ্গুল দেখিয়ে ইসিজু কঠোর স্বরে লেগকে প্রশ্ন করে।

টোসিই অব্যক্তে একবার মুখ খুলে নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল। তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠল অকল্পনীয় ভীতিভাব। সেটা দেখে লেগ ইসিজুকে বললে, ঠিক মনে নেই। তাছাড়া এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথাও বোধ করি না।

মেয়েটা ভয় পেল কেন লেগ ঠিক বুঝে উঠতে পারল না!

—সত্যি করে বলুন ও কি বলে গেছে। আরো কঠোর কণ্ঠে যেন দাবী করে ইসিজু।

টোসিই উপর-পড়া হয়ে নিজেই বলে ওঠে, কেন মনে নেই, সেই যে আমাদের পুরুষরা কোথায় গেল, তারা ফিরে আসছে না কেন?

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ তাই। আমি জানতে চাইলে ও জানিয়েছিল তারা নাকি সব মরে গেছে।

—শুধু ঐ কথা?

—দেখুন, আপনি এমন কে এলেন যে এত সব প্রশ্ন করছেন?

—জিজ্ঞেস করুন মেয়েদের, ইসিজু সগর্বে বলে, আমি এখানকার একজন নেত্রী। অতএব খুলে বলুন ও আর কি বলেছিল।

ঐ কথা ছাড়া আর কিছু নয়।

শুনে টোসিইর বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল। তার ভীত সন্ত্রস্ত মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সারাদিন ধরে ওরা দ্রব্য সামগ্রী নামালো এবং তাঁবু খাটালো।

সোজির মুখ কিন্তু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাকালেই বোঝা যায়। সন্ধ্যে হলে অন্ধকার নামলো। ওরা ক্যাম্প ফায়ারের সামনে বসে রাত্রের আহার সারতে লাগলো। সাইজোর নীরবতা দেখে লেগ প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার বলতো? কিছু গোলমাল মনে করছ?

—হ্যাঁ।

বিছানা পেতে সার্জেণ্ট লেগ শোবার জন্য প্রস্তুত হল। বগলে জড়ানো একটা কম্বল নিয়ে স্থানীয় একটি কুটিরে শুতে যাবার মুখে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, বুঝলেন ঐ টোসিই নামে মেয়েটা বললে এ গ্রামে নাকি "সান্‌স অফ জিম্মুরা রয়েছে।

সহাস্যে লেগ বলে ওঠে, মেয়েটার মাথা খারাপ।

—না, মেয়েটা—

—চেপে যাও, ভুলে যাও এসব আবোল তাবোল কথা। গুড নাইট সাইজো, আশা করি যেন তোমার রাত্রে সুনিদ্রা হয়।

জাপানী যুবা কিঞ্চিৎ ইতস্তত করল, কি যেন ভাবলো, তারপর ঠোঁট উলটে কম্বল বগলে চলে গেল স্থানীয় একটা কুটিরের দিকে।

…কি একটা খসখস শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল সার্জেণ্ট লেগ-এর। কে যেন আসছে! ত্রস্তে সে বালিসের তলা থেকে তার কারবাইন পিস্তলটা ডান হাতে নিয়ে তাগ করল। শব্দটা থেমে গেল বেশ কয়েক মিনিট। ফের শুরু হল। কম্বলের তলায় শুয়ে দু কনুইতে ভর দিয়ে সে উৎকর্ণ হয়ে রইল। মুহূর্তখানেক বাদে একটি মাথা গাড়ির পাশে উঠতে লাগলো। লেগ দমবন্ধ করে রইল, অপেক্ষা করল আগন্তুক গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াক, তখন কয়েকটা বুলেটে শেষ করে দেওয়া যাবে।

—খবরদার! ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়। আমার হাতে কিন্তু খেলনা পিস্তল নয়, গর্জে ওঠে লেগ।

—গুলি ছুঁড়বেন না প্লিজ। আমি টোসিই। আমি…আমি এসেছি আপনার সঙ্গে শুতে।

বলেই মেয়েটা এসে ওর বিছানায় বসলো।

—কি হচ্ছে কি! চলে যাও এখান থেকে। আমি ফাজলামী ইয়ার্কির জন্য আসিনি। যাও, আমি ঘুমবো, আমার ঘুমের খুব প্রয়োজন।

—আহা রে! সত্যিই ক্লান্ত ছেলে, নাও আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমোও বলে টোসিই তার সুপুষ্ট নধর বক্ষে দুহাতে জোর করে লেগ-এর মাথাটা চেপে ধরলো।

—ফর ক্রাইষ্ট সেক, প্লিজ চলে যাও, জোর করে ছাড়িয়ে নিতে, ফের প্রবল বিক্রমে উন্মাদিনী তরুণী ওকে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরে। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা। মেয়েটার গা বেশ মনোহর গরম। লেগ, মেয়েটার দ্রুত বক্ষ স্পন্দন অনুভব করতে পারছিল।

—শোন, শান্ত হও। ঠাণ্ডা হয়ে শোন। এসবের জন্য আসিনি, পছন্দও করিনা। আমার কর্তব্য কর্ম শেষ করে ফেলতে হবে কালই, সেটা আমায় নির্বিঘ্নে করতে দাও। ঘুম আমার সবিশেষ দরকার। আহা আমার পা দুটো ছাড়ো, প্লিজ।

মেয়েটা যেন ক্ষেপে গেছে। দু'পা দিয়ে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরেছে লেগে-এর পা। লেগ জোর করে ছাড়াতে গিয়ে চিৎ হয়ে গেল। মেয়েটা আধাআধি উপরে উঠে এল, আধো আধো আদুরে গলায় বললে, নাও চুমু খাও। আমায় কামড়াও।

—আমি কুকুর নই যে কামড়াব। কেটে পড় দিকিনি।

—তাহলে আমি কামড়াই, এই বলে কানের লতিতে প্রবলভাবে দাঁত বসাবার পূর্বেই লেগ এক ঝটকায় মাথা সরিয়ে নিল। মেয়েটা খিল খিল করে কি উচ্ছসিত হাসি হাসতে আরম্ভ করল।

—কি হবে, যদি ঐ বড় টমেটো তোমায় এখানে দেখে?

—বড় টমেটো কে?

—ঐ যে তোমাদের ইসিজু!

—ও ষাঁড়ের মত ঘুমায়। ও অঘোরে ঘুমচ্ছে। ও জানতেই পাবে না। ও জাগবার আগে আমি তাঁবুতে চলে যাব। কিন্তু…কিন্তু…উঃ তুমি ওর নামোচ্চারণ করলে। ওর নাম শুনলেই আমার ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে জানো! দেখো আমি কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেছি, কেমন কাঁপছি, হি-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ—

যথেষ্ট হয়েছে! লেগ-এর সততার বাঁধ বুঝি এতক্ষণে ভেঙ্গে গেল, মনে রেখো আমিও কচি খোকা নই আর আমার শিরায় জল চলাচল করে না, এই

বলে সর্ব প্রথম পুরুষের আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে তরুণীর যৌবনোজ্জ্বল কোমল দেহকে এক ঝটকায় কম্বলের মধ্যে টেনে নিয়ে দুজনের গায়ে কম্বল টেনে দিল।

পরদিন সকালে বিরাট ভারী একটা বস্তু দেহের ওপর ধপাস শব্দে পড়াতে সার্জেন্ট লেগ চমকে জেগে উঠল। উপুড় হয়ে শুয়েছিল, পিঠে যেন কি একটা ভারী বস্তু পড়ে আছে। দু কনুইতে ভর দিয়ে উঠবার চেষ্টা করতে পিঠের বোঝা পাশে পড়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে লেগ-এর চক্ষু স্থির হয়ে গেল।

সাতঙ্ক বিস্ময়ে। একটি মৃতদেহ। এবং সে মৃতদেহ গতরাত্রের অভিসারিকা মেয়ে টোসিই-র। গলায় ও দু'পায়ে একটি দড়ি বাঁধা। তাকে ফাঁস দিয়ে হত্যা করে, শব এনে ওর পিঠে স্থাপন করে দিয়ে গিয়েছে কারা। যৌবনোচ্ছল তরুণী এখন হলদে ফ্যাকাশে বীভৎসভাবে চোখ বেরিয়ে-আসা এক শবে পরিণত।

সামনে দেখা গেল বিরাট এক মেষের পাল দাঁড়িয়ে রয়েছে। নীরবে সবাই দেখছে ওকে। তার মধ্যে সেই দীর্ঘাঙ্গী ইসিজুও দাঁড়িয়েছিল। মুখে তার বিজয়িনী এবং তীব্র বিদ্রূপের হাসি।

—কি ব্যাপার সার্জেন্ট? ঠাট্টার স্বরে সে প্রশ্ন করে, তোমায় যেন কেমন অসুস্থ-অসুস্থ মনে হচ্ছে। আহা অকালে ঘুম ভেঙে গেছে। ঠিক আছে আমি দেখব এমন কষ্ট যেন তোমার আর না হয়।

—তোমায় আমি টোকিও নিয়ে যাব এক্ষুনি, সার্জেন্ট লেগ ওর সামনে এগিয়ে গেল, তোমায় সেখানে মিলিটারী পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে ফের এখানে এসে কাজ শেষ করব।

—ঐ মেয়েটার তোমার কাছে যাওয়া অন্যায় হয়েছে, ইসিজু গম্ভীর হয়ে যায় এবার, নির্বোধটা ভেবেছিল আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। বোকাটা জানে না কিন্তু আর সবাই জানে যে যখন একটিও জাপানের শত্রু আমাদের মধ্যে থাকে তখন ইসিজু দুচোখের পাতা এক করতে পারে না।

—যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, লেগ বললে। লেগ বলে যায়, অতএব ঐ মেয়েটা এমন কিছু অন্যায় করেনি। সে শুধু—

—কে বলেছে যুদ্ধ শেষ! যুদ্ধ এখনও চলছে, চলবে। শুধু এ যুদ্ধের ধরনটা অন্যরকম। যতদিন না প্রতিটি মার্কীনি শূয়োরকে জাপান থেকে তাড়াতে পারছি ততদিন এ যুদ্ধ চলবে।

—এখন বোধহয় মাথা ঠাণ্ডা করে ভাববার সময় এসেছে, সার্জেন্ট লেগ

বলে যায়, তুমি একজন 'সান্‌স অফ জিম্মু'র সভ্যা, তাই না? মূর্খ তোমরা ভেবেছিলে মেয়েটা আমার কাছে এসে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাই না?

—সম্রাট আদেশ করেন, ইসিজু সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, আমরা শুধু তাঁর আদেশ পালন করি মাত্র।

[এক্ষেত্রে বলে দেওয়া প্রয়োজন যে এই সম্রাট বর্তমান সম্রাট হিরোহিতো নয়। ইনি হলেন খৃষ্টপূর্ব ৬৬০ অব্দের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট জিম্মু। সন্ত্রাসবাদীদের এই সম্রাটের আত্মাই এখন পরম গুরু।]

—ঠিক আছে, এইসব কথা গিয়ে জজের কাছে বলবে, লেগ হাতের পিস্তল ওর দিকে নিশানা করে, উঠে এস জলদি এই গাড়িতে। দেরী ক'—

কথা শেষ হবার আগেই কেন যেন মনে হল লেগ-এর, কোথায় কি একটা গোলমাল হয়ে গেছে। মেয়েটা একচুলও নড়ল না। বরং নির্লজ্জের মত হাসছে। লেগ-এর পেছন দিকে কার পানে যেন চাইল ইসিজু। সহসা পদক্ষেপ শুনল সে পেছন দিকে। ত্রস্তে সে পেছন ফিরলো। কিন্তু ততক্ষণে বড় দেরী হয়ে গেল। তিনজন পুরুষ পেছনে দাঁড়িয়ে। সামনের লোকটি ধীর স্থির গম্ভীর সম্ভ্রান্ত, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। কিছু ভাববার পূর্বেই লৌহকঠিন একটি হাত এসে তার গলায় আঘাত করল। ছিটকে পড়বার সঙ্গে আরেকটা আঘাত। ব্যাস, সব অন্ধকার। মূর্ছা।

জ্ঞান ফিরতে দেখলো, সে শুয়ে আছে একটি গুহার অভ্যন্তরে। গুহার বাইরের দিকের মুখে ওরই ট্রাক গাড়ি দরজার কাজ করছে। দুটো হেড লাইট জ্বলছে ওর মুখের ওপর ফোকাশ করে। গাড়ির ফাঁকে ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশ, রদ্দুর, তাহলে এখন দিন বাইরে। ভেতরে মনে হয় গভীর রাত্রি। মনে হল কে যেন ড্রাইভারের সিট-এ বসে আছে তাকে পাহারা দেবার জন্য। হাতে নিশ্চয়ই তার আগ্নেয়াস্ত্র, এবার পেছনে চাইল। গুহার অভ্যন্তরে একটা অনতিদীর্ঘ সুড়ঙ্গ বর্তমান। কে জানে কতদূর গেছে সেটা। এবং নিশ্চয়ই ওদিকে বাইরে বের হবার কোন সুযোগ নেই।

সহসা গাড়ির হেড লাইটের সামনে কজন লোক দেখা গেল এগিয়ে আসছে ভেতরে। পেছনে আলো থাকায় মুখ ভালভাবে দেখা যাচ্ছিল না বটে তবে বুঝলো দুজন পুরুষ এবং অপর জন হল দীর্ঘাঙ্গী সেই মেয়ে ইসিজু। পুরুষদের হাতে রাইফেল।

তাদের একজন কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করে, তোমার নাম বুঝি লেগ? তুমি

তো জেনারেল ম্যাকআর্থারের দখলদারী সেনাদের একজন সার্জেন্ট? বড়ই দুর্ভাগ্যের—

—হিডেকি, বুঝলে এ ইডিয়েট লোকটা কিনা বলে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধ শেষ। যুদ্ধ শেষ। যুদ্ধ শেষ। হা হা হা হা বলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে মেয়েটা।

পুরুষটা সঙ্গে সঙ্গে এক চড় মারে মেয়েটার মুখে, মেয়েটা স্তব্ধ হয়ে যায়।

—আমরা সোজা সাদা সরল কথার মানুষ, হিডেকি বলে, আমরা হলাম 'সান্‌স অফ জিম্মু'র ঘাতক। এ বিষয়ে কোন আলোচনার অবসর নেই। প্রাণ ভিক্ষা করে নিজেকে আর ছোট কোরো না। কোন ফল হবে না। তোমার কাছে গতরাত্রে মেয়েটি গিয়েছিল সেটাও যেমন সত্যি তোমার মৃত্যুদণ্ডও বর্তমানে অমোঘ সত্যি! তোমার সহচরের মৃত্যুদণ্ড ইতিমধ্যেই কার্যকরী করা হয়েছে।

—সেকি! সাইজো নেই।

—না, বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীকে তার সাধনোচিত ধামে চালান করে দিয়েছি। তোমার মৃত্যু হবে সূর্য অস্ত গেলে, আমরা এখন চলি। আকিরা পাহারায় রইল। কোন প্রকার চালাকী করলে আগেই তোমার মৃত্যু ডেকে আনবে। আকিরার হাতের নিশানা সাংঘাতিক।

—আমায় কিভাবে মারা হবে, লেগ নিষ্প্রাণ কণ্ঠে অবান্তর এই প্রশ্ন করে।

—যেমনভাবে তোমার প্রণয়িণী মেয়েটাকে হত্যা করা হয়েছে।

—তার মানে আমায় দড়ির ফাঁস দিয়ে মারবে?

—হ্যাঁ।

সার্জেন্ট লেগ কিছুক্ষণ চিন্তালেশহীন মন নিয়ে বসে রইল। তারপর মনে মনে কি মতলব ভাবলে। বলে ওঠে, ওখানে বসে আছ আকীরা?

—হ্যাঁ, হে মরা মানুষ।

—একটা প্রশ্ন করি তোমায়, এই 'সান্‌স অফ জিম্মু'দের হেড কোয়ার্টার কোথায়?

—তোমার জানার প্রয়োজন নেই মরা মানুষ।

—আকীরা!

—বস মরা মানুষ।

—একটা সিগারেট খাওয়াবে?

—তা একটা দিতে পারি, মরা মানুষ, তবে সোজা হেড লাইটের আলোয় হাত তুলে এগিয়ে এস।

লেগ তাই করলে। আকিরা একটি সিগারেট ধরিয়ে ওর হাতে দিল। পরম তৃপ্তিতে সেটা টানতে টানাত ফিরে এল লেগ পেছন দিকে। সোজা না এসে সে কিঞ্চিৎ বেঁকে চলতে লাগলো পেছনের সুড়ঙ্গ মুখের পানে।

—এই ওদিকে নয়। ওদিকে নয়, গাড়ি থেকে অদৃশ্য আকীরা চিৎকার করে ওঠে।

চোখের পলকে হামাগুড়ি দিয়ে সে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ে! সেই মুহূর্তে কয়েকটা গুলি এসে গুহার দেয়ালে লাগে। সামান্যর জন্য লেগ রেহাই পায়। সে তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে যাচ্ছে।

কানে আসে লোকজনের চিৎকার, নারী কণ্ঠের চিৎকার। বোঝা গেল হৈ হৈ পড়ে গেছে বাইরে। সবাই বোধকরি খুঁজতে আসছে ভেতরে। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে লেগ এগোতে লাগলো, ভেতরে, আরও ভেতরে, আরও···। কখনো মাথায় ঠোক্কর খাচ্ছে, কখনো পা পিছলে আঘাত খাচ্ছে। তবু থামলে চলবে না, চলো চলো এগিয়ে চলো। দেয়াল ধরে ধরে যেতে যেতে সহসা মনে হল বিপরীত দেয়াল কত দূরে দেখা যাক। পা গুনে গুনে প্রায় পঞ্চাশ পা যেতে হঠাৎ পায়ে জল স্পর্শ করল, সে জল বাড়তে বাড়তে হাঁটু অবধি উঠল। ফের কমে এল জল।

এমন সময় টর্চ লাইটের আলোর রশ্মি এসে পড়তে লাগলো। দূরে শোনা গেল কোলাহল। সর্বনাশ, ওরা আসছে তো ধরতে। দেয়ালে দেয়ালে আলোর ফোকাস পড়ছে। সেই আলোতে নিমেষে দেখে নিল কিছুদূরে দেয়ালের গায়ে কতকগুলো গর্তের মত খাঁজ। সেই খাঁজে পা দিয়ে দিয়ে লেগ উঠে যেতে লাগলো ওপরে। প্রায় তিরিশ ফিট যাবার পর একটা বড় গর্ত পাওয়া গেল, তার মধ্যে সে ঢুকে গেল।

ইতিমধ্যে টর্চের ফোকাস ক্রমশ এগোতে এগোতে একেবারে লেগ-এর লুকিয়ে থাকা গর্তের নীচে এসে গেল। একটা টিলার ফাঁকে এক চোখ রেখে দম প্রায় বন্ধ করে লেগ দেখতে লাগলো হিডেকী এবং তার দুজন সহচর ক্রুদ্ধ মুখে কি যেন গজগজ করছে আর চারদিকে আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আরো কাছে অর্থাৎ ওর গর্তের ঠিক নিচে এসে রাইফেলসহ তল্লাসকারীরা দাঁড়ালো।

বিরক্ত কণ্ঠে হিডেকী বললে, কোথায় পালাবে ব্যাটা। পালাবার কোন পথ নেই। লুকিয়ে আছে কুত্তাটা। ঠিক হায়, আমিও জানি, কি করে ব্যাটাকে বের করে আনতে হয়।

এই বলে দলটি গুহার মুখের পানে ফিরে যেতে লাগলো। আস্তে আস্তে এক সময় তারা ও তাদের টর্চ লাইটের আলো মিলিয়ে গেল। আবার ঘন অন্ধকারে চতুর্দিক ছেয়ে গেল।

খুব সতর্কতার সঙ্গে সে নেমে এল সেই উপরকার গর্ত থেকে নিচে। এখন কি করা যায়? কিই বা করবার আছে। হয়ত নিয়তি তাকে মৃত্যুর দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ হোঁচট খেয়ে নিচে হাত বুলিয়ে দেখলে। বেশ বড় একটা চতুষ্কোন পাথর, গোটা চারেক ইটের সাইজ কি? ভেবে সেটাকে কোমরের বেল্ট খুলে বেঁধে নিল। মরতে তো হবেই। সম্মুখ সমরে ওদের দু'একটাকে ও অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যাবে পরপারে।

চুপচাপ চিন্তাবিহীন ফাঁকা মন নিয়ে বসেছিল লেগ। প্রায় একঘণ্টা কেটে গেছে। এমন সময় নাকে এল একটা অতি পরিচিত গন্ধ। হ্যাঁ হ্যাঁ এত ধোঁয়ার গন্ধ। প্রথমে কম, তারপর প্রবল বাতাসে নাক জ্বালা করা তীব্রগন্ধী ধোঁয়া আসতে লাগলো। লেগ কাশতে লাগলো অসহ্য!

এখানে বসে থেকে দম বন্ধ হয়ে মরার কোন মানে হয় না। তার চেয়ে গুহামুখে গিয়ে শত্রুর সঙ্গে সামনা সামনি পড়ে মৃত্যু হবে বীরের মৃত্যু!

সজল চোখে, কাশতে কাশতে সে যথাসম্ভব দৌড়ে ফিরে আসতে লাগলো গুহামুখের দিকে। দু'চারবার সে হোঁচট খেয়ে পড়লো, গা হাত পা ছড়ে গেল। তা সত্ত্বেও থামলে চলবে না। উঠে আবার সে ছুটতে লাগলো।

অবশেষে এক সময় নজরে এল গুহামুখ। সমস্ত মুখটা জুড়ে ভীষণ আগুন জ্বলছে। প্রচুর কাঠ এনে দাউ দাউ আগুন জ্বালিয়ে ঠিক গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে হিডেকী, আকীরা, আরও একজন ঘাতক এবং সঙ্গে সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে ইসিজু। পেছনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিটসুনির যাবতীয় নারীর পাল।

লেগ-কে দেখে 'সান্‌স অফ জিম্মু'র দল উল্লাসে প্রায় লাফিয়ে উঠল। হিডেকীর হাতে ফাঁসির দড়ি রেডি।

মুহূর্তে মন স্থির করে নিল লেগ। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। এমনিও মরেছে অমনিও মরেছে।

মিনিট খানেক তাকিয়ে রইল আগুনের পানে। মাঝখানে কয়েকটা মোটা কাঠের টুকরো জ্বলছে কিছু কম গনগনে অবস্থায়। ত্রস্তে লেগ বসে পড়লো হাঁটু গেড়ে আগুনের সামনে দুই হাত ঢুকিয়ে দিল জ্বলন্ত কাঠটার তলায়, চোখের নিমেষে প্রবল বিক্রমে সেটাকে ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। সেগুলো সটাং গিয়ে আঘাত করল হিডেকী ও আকীরার গায়ে, দাউ দাউ করে আগুন লেগে গেল তাদের পোষাকে। ততক্ষণ লেগ আগুনের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তার শরীরেও আগুন ধরে গেছে। সে যেন একটা জ্বলন্ত গোলাবিশেষ। হাতে তার বেল্ট বাঁধা সেই পাথরের টুকরোটা সেটাকে দুলিয়ে দুবার নামিয়ে আনলো হিডেকী ও আকীরার মাথায়, একে জ্বলন্ত দেহে আধমরা ছিল তারা, তারপর সেই পাথরের আঘাতে মাথা তাদের চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।

কাছে দাঁড়িয়ে অদম্য ক্রোধে কাঁপছিল দীর্ঘাঙ্গী ইসিজু, সে চিৎকার করে বলে ওঠে, ইয়ইচি, এই শ্বেতাঙ্গ কুত্তাটাকে খতম করে দে।

বিকট দর্শন অপর ঘাতক ইয়ইচি ভীম বেগে ছুটে এল লেগ-এর পানে। হাতের পাথরের টুকরোটাকে হাঁকড়েছিল লেগ—সামান্যের জন্যে লাগলো না। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ভীষণ লড়াই শুরু হয়ে গেল তাদের। লেগ প্রায় কাবু করে এনেছিল ঘাতককে কিন্তু পেছন থেকে দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে ইসিজু লেগ-এর কেড়ে নেওয়া সেই পিস্তলের বাট দিয়ে দুবার প্রচণ্ড আঘাত করল লেগ-এর মাথায় আর কানের পাশটায়। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ সরষে ফুল ঝিকিমিকি করে উঠে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। লেগ মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

৮

যখন জ্ঞান ফিরলো, প্রচণ্ড অসহনীয় বেদনায় সর্বশরীর খেয়ে যাচ্ছে। মনে হল মরে যাচ্ছে সে। চোখ মেলে চাইতে দেখলো মিটসুনির একজন নারী বসে আছে, তার কোলে ওর মাথা।

নারী আধো-আধো ইংরেজীতে বলে, তুমি আমাদের খাদ্য দিয়েছিলে, আমরা ভুলিনি।

সস্নেহে সেই নারী ওর দেহের বিভিন্ন স্থানে মলম জাতীয় কি যেন লাগিয়ে দিচ্ছে। ওদের নিজেদের তৈরী মলম। পরে প্রমাণিত হয়েছে এই স্নেহময়ীর মলমই তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সর্বাঙ্গে আগুনে পোড়া ঘায়ের যে কি যন্ত্রণা তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

তাঁবুর মধ্যে শুয়েছিল সে, ফাঁক দিয়ে দেখলো বাইরে তিনটে গাছের সঙ্গে

তিনজনকে আষ্টে পৃষ্টে বেঁধে রাখা হয়েছে। তিনজনই ওর চেনা। ইয়ইচি, আকীরা এবং দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে ইসিজু। মিটসুনির কয়েকজন মেয়ে ওদের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতেই তিনজন বিশেষ করে ইসিজু আর্তনাদ করে উঠল। লেগ বুঝলো স্থানীয় মেয়েরা ওদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। পাশেই পড়ে আছে হিডেকীর ভয়াবহ মৃতদেহ, ফুলে ফেঁপে ঝলসে বিকটাকৃতি।

—ওদের কাছ থেকে তুমি যদি কিছু জানতে চাও তো বল, সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে নারীটি বললে, এখন ওদের কাছ থেকে যে কোন কথা বের করে নেওয়া সম্ভব।

আধা-অচেতন লেগ কোন মতে বললে, শুধু জেনে নাও 'সান্‌স অফ জিম্মু'দের হেড কোয়ার্টারটা কোথায়? আর কিছু নয়। শুধু—'

ব্যস, কথা শেষ না করে ফের মূর্ছিত হয়ে পড়ল লেগ। টানা আটদিন তার জ্ঞান ফিরলো না। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হল টোকিওর আর্মি হাসপাতালে। সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ, শুধু চোখ কান নাক প্রভৃতি স্থানের জন্যে কয়েকটা মাত্র ফুটো রেখে সব বাঁধা। একজন নার্স ওকে জানায় শরীরের সত্তর ভাগেরও বেশী স্থান পুড়ে গেছে। বিরাট আকারে ও বহুস্থানে নতুন চামড়া লাগাতে হবে (স্কিন্ গ্র্যাফটিন) তবেই সে মোটামুটি সুস্থ হবে।

এরপরের ঘটনা সংবাদ প্রতিষ্ঠান মারফৎ সারা বিশ্বে প্রচারিত হল।

টোকিও, ৮ই অক্টোবর, ১৯৪৫—জেনারেল ম্যাক আর্থারের দখলদারী বাহিনী তিনটে পদাতিক বাহিনী, ট্যাঙ্ক ও প্লেন-এর সাহায্যপুষ্ট হয়ে মাটসু উপসাগরের তীরবর্তী কাকাটসু গ্রামে হানা দেয় এবং কিছুক্ষণের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর আজ সকালে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী দল 'সানস অফ জিম্মু'র ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকলাপের দফারফা করে তাদের হেড কোয়ার্টার ধ্বংস করে দেয়। তেইশ জন বাঘা বাঘা নেতৃস্থানীয় সন্ত্রাসবাদী মারা যায় এবং ষাটজনকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রচুর কাগজপত্র হস্তগত হয়। এদের হেড কোয়ার্টার এতকাল অজানা ছিল দখলদারী বাহিনীর কাছে। সম্প্রতি নাগাসাকি উপসাগরের তীরস্থ মিটসুনী গ্রামের একটি যুবতীর কাছ থেকে জেরা করে এ সংবাদ বের করা হয়েছে।

এইভাবে 'সানস অফ জিম্মু' নামক ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদী দলটির অস্তিত্ব নিঃশেষিত হয়ে গেল। ধরে আনা সদস্যদের খুন খারাপির অভিযোগে

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল। এই দলে ইয়ইচি, আকীরা এবং দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে ইসিজুও আছে।

চামড়া সংস্থাপনের জন্য হাসপাতালে যাতায়াতে সময় নিল পাক্কা দু'বছর। তারপর সেরে উঠে সে সামরিক বিভাগেই কাজ করে গেছে পরবর্তী কয়েক বছর।

অবশ্য তার দেহের ক্ষত চিহ্ন এবং তার সেই অকল্পনীয় দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতার বেদনাময় কাহিনী সে যতদিন জীবিত থাকবে ভুলতে পারবে না, মনে পড়লেই চমকে চমকে উঠবে।

তিন টেক্কা এক রাণী

তিন টেক্কা এক কুইন ব রাণী আর একজন কিং অফ হার্টস-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একদা রাজকীয় রক্তের ঝলসানি। ইতালীর রাজবংশের ঝলসানি। এ যুগের কিং কুইন অর্থাৎ রাজা রাণী আর তিন টেক্কার চমকপ্রদ এক কাহিনী।

না, এটা কোন পোকার গেম ছিল না, তাদের। এটা ছিল চটচটে ভালবাসার এক আজব ব্যাপার। আর রাজকীয় ঝলসানি ঝলসিত হয়েছিল সুন্দর লাবণ্যময় মুখাবয়বের কিং অফ হার্টস-এর। যিনি বাস্তবে ছিলেন ঠিক কোন রাজা নয়, তবে একজন ক্রাউন প্রিন্স রাজপুত্রের কাহিনী। ইতালীর রাজপুত্র।

বিশদভাবে বলতে গেলে তিনি ছিলেন হিজ রয়্যাল হাইনেস প্রিন্স ভিক্টর এমানুয়েল অফ স্যাভয়।

খোলসা করে বলতে গেলে চরিত্রগুলির টেক্কারা ছিল তিনজন ইতালীয় সাদা পোষাকের পুলিস। আর রাণী ছিল, সারা ইয়োরোপের 'দিল কা রাণী' অসাধারণ যৌন আবেদনময়ী যুবতী বারবারা ব্রেন। সারা ইয়োরোপে যে মেয়ে 'কন্টিনেন্টের সেরা নগ্না রাণী' রূপে প্রসিদ্ধা ছিল। স্ট্রিপটিজ গার্ল।

এ বিদ্যুৎপ্রভ মেয়ের আদি নিবাস ছিল ব্রিটেন। অর্থাৎ এ মোহিনী ছিল ইংরেজ তনয়া।

রাজকীয় ঝলসানি প্রকাশ পেল যখন পিস্তলধারী তিন পুলিস অফিসার গিয়ে হানা দিল সেই হোটেল সুইটে যেথায় প্রিন্স ভিক্টর আর 'কুইন' বারবারা কোর্টসিপে মত্ত ছিল। পুলিসদের অবশ্য রাজকীয় এই প্রেম পিরীতের রোমান্সের ঘটনায় কোন আপত্তি ছিল না। তারা গিয়েছিল অন্য এক কারণে। প্রিন্স ভিক্টরের স্বদেশের মাটিতে পদার্পণ ছিল আইনত নিষিদ্ধ।

দীর্ঘদেহী বালসুলভ মুখাবয়বসম্পন্ন কুড়ি বছর বয়সের প্রিন্স হল ইতালীর নির্বাসিত নৃপতি কিং উমবার্টোর জ্যেষ্ঠ সন্তান।

যুদ্ধোত্তর ইতালীয় রিপাবলিকের আইনে কিং উমবার্টো এবং তার পরিবারের যাবতীয় লোকের ইতালীতে প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়েছিল। রাজা এবং রাজপরিবারের যাবতীয় নরনারী কিন্তু এ জন্মের মত নির্বাসিত হয়েছিল ইতালী থেকে। তাদের ইতালীতে প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

তথাকথিত ইয়োরোপের নগ্না 'দিল কা রাণী' উনিশ বছর বয়স্কা অপরূপা তরুণীর ঢং ঢাং ও দেহাবয়ব ছিল মেরিলিন মনরো, জেন ম্যান্সফিল্ড ও লিলি সেন্ট সি-র যাবতীয় হাইপার যৌন আবেদনরূপী আকর্ষণ। যেমন রঙ, তেমন ঢং, তেমন স্তন, তেমনি নিতম্ব এবং নগ্ন নাচের যাদুমাখা ভঙ্গি।

এই মেয়ে ভাগ্যান্বেষণে এসে প্রথম মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে প্যারিসের প্রসিদ্ধ ফোলি বারজারেতে।

ইতিপূর্বে সে বহু নামকরা স্থানে নিজের নগ্ন দেহ দেখিয়ে মডেলের কাজ করে এসেছে। এ মেয়ের দেহ সৌষ্ঠব এমনই চটকদার ও নিদারুণ আকর্ষণীয় ছিল যে অপরাপর নগ্নিকা যুবতীদের অনায়াসে পেছনে ফেলে সে বিজয় গর্বে এগিয়ে গেল। ওর দেহে তুলনা বুঝি বেহেস্তের হুরী, প্যারাডাইসের অ্যাঞ্জেল বা স্বর্গের উর্বশী। দুর্নিবার দেহলতার অধিকারিণী। যেখানেই তার বিবস্ত্র দেহ প্রদর্শন করেছে, সেখানেই দর্শক সাধারণ ওর রূপ হেরি পাগলপারা হয়ে গিয়েছে। নাচিয়ে গাইয়ে মেয়েরাও হার মেনেছে ওর কাছে। কাজেই অতি দ্রুত এ মেয়ে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে গেল কাঙ্ক্ষিত তার নিশানায়।

ফোলি ছেড়ে বাঘা বাঘা প্যারিসের নাইট ক্লাবে ক্লাবে বারবারা তার দেহকে বস্ত্র শূন্য করে দর্শাতে লাগল কামোন্মাদ নাইট ক্লাবের পেট্রনদের লুব্ধ দৃষ্টির সামনে। শুধু বস্ত্র ত্যাগ নয়, নগ্ন দেহকে সে এমন ভাবে অভূতপূর্ব কামনা ফেনিল ভঙ্গিতে খেলাতে লাগল যে প্যারিসের রসিক সমাজের চোখ যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসার দাখিল হল।

যে সময় প্যারিস-এ স্ট্রিপটিজ অর্থাৎ নগ্ন নৃত্যের ফ্যাশনে মানুষজন পাগল হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সে সময়েই ঐ লাইনে এ পেশায় বারবারার আবির্ভাব। যখন নগ্না নর্তকীরা প্যারিসের সিনস্পটের ক্যান ক্যান কার্লকের স্থান অধিকার করে নিল, তখন বারবারা নিজ গুণে নগরীর শ্রেষ্ঠা নগ্না মেয়ের মুকুটধারিণী হিসেবে গণ্য হয়ে গেল। সে যে কোন হাউসেই যেত সেখানেই হাউসফুল হয়ে যেত রাতের পর রাত। এমন কি যে প্যারিসীয় যুবকেরা বিদেশী পর্যটকদের সুবিধার জন্য নাইট ক্লাবসমূহে যাতায়াত ছেড়ে দিত, তারাও বারবারায় কণ্ঠ্যাগ মসৃণ ত্বক ও মোহময়ী যৌন আবেদনের আকর্ষণে বারবারার নাইট স্পটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত।

প্যারিস থেকে বারবারা এক সময় চলে গেল সুইজারল্যাণ্ডের প্রখ্যাত জেনেভার বাটাক্ল্যান নাইট ক্লাবে তার নগ্ন সৌন্দর্য দর্শাতে।

এবং এখানেই তার সাক্ষাৎলাভ হল প্রিন্স ভিক্টরের সঙ্গে, যিনি ছিলেন স্বর্ণ কেশী নারীদের দেহাবয়বের একনিষ্ঠ পূজারী।

প্রিন্স সে সময় উইণ্টার স্পোর্টস্-এর সাময়িক প্রমোদের জন্য সুইজারল্যাণ্ডে অবকাশ যাপন করছিলেন।

বারবারাকে দেখামাত্র তিনি স্কি-ইং থেকে সী-ইং-এ নেমে গেলেন. তিনি বুঝি বুঝতে পারতেন যে বারবারার দেহশীর্ষগুলি আলপস্-এর শীর্ষদেশ থেকে কোন অংশেই কম আকর্ষণীয় নয়। আর বারবারার দেহের নানাবিধ ঢেউসমূহ আল্পস পর্বতের মধ্যে বিরল। আল্পস্-এর চেয়ে বারবারার দেহ অনেক বেশী বন্ধুর। পাহাড়ের ঢেউ-এর চেয়ে এ মেয়ের শারীরিক ঢেউ অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। অনেক বেশী উত্তাল।

সেই বৃত্তান্ত, যাকে বলে 'লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট'। অবশ্য সত্যি সত্যিই বারবারা একটি 'সাইট'ই বটে দেখবার মত। বাটাক্ল্যান নাইট ক্লাবে বনের পাখী আর খাঁচার পাখীর দর্শনলাভ হল। নগ্ন নৃত্যাদি শেষ, ভিক্টরের ব্লাড-প্রেসার যখন নেমে নর্মাল হল, তখন সে হোটেল প্রদত্ত কাগজের ন্যাপকিনে এক চিরকুট লিখে হেড ওয়েটারকে দিয়ে বারবারার ড্রেসিং রুমে তা পাঠিয়ে দিল।

পরে বারবারা প্রথম সাক্ষাৎকারের রাতটির বর্ণনা দিয়ে বলেছে, আমায় ওঁর টেবিলে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তরুণ ভদ্রলোক। ভারী সুন্দর কমনীয় চেহারা, তেমনি কোমল নম্র স্বভাব। তাই ওঁর সঙ্গে বসে মদ্যপান করতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। ও আমায় বলেনি যে ও একজন রাজপুত্র। আমি প্রথমে ভেবে নিয়েছিলাম কোন ধনী পুত্র অবকাশ বিনোদনের জন্য এ শহরে এসেছে। পরদিন আবার দেখা, তারও পরের রাতে পুনরায় সাক্ষাৎকার। আমি শুধু ওকে ভিক্টর বলেই জানতাম।

প্রায় হপ্তাখানেক বাদে ও আমায় ওর ফোন নাম্বার দিল এবং পরদিন ফোন করবার অনুরোধ জানাল। কথামত পরদিন আমি ফোন করতে এক অপরিচিত পুরুষ কণ্ঠস্বর 'হ্যালো' করল। তখন আমি ভিক্টরকে চাই জানাতে সেই পুরুষ কণ্ঠস্বর সসম্ভ্রমে বললে, আমার মনে হচ্ছে আপনি বোধকরি হিজ রয়েল হাইনেস দি প্রিন্স অফ স্যাভয়কে চাইছেন।

শুনে কি বলব শুধু আমার মাথা নয়, পারিপার্শ্বিক দেওয়ালগুলোও যেন চোঁ করে ঘুরে গেল একপাক। বলে কি! এক প্রখ্যাত রাজবংশের প্রখ্যাত রাজপুত্রের সঙ্গে আমি কিনা সাধারণভাবে মেলামেশা করে চলেছি। স্ট্রেঞ্জ।

মুখে বললেও বারবারা কিন্তু আদৌ দমে যায়নি। তার প্রেম পীরিতের খেলায় এতটুকু হীনমন্যতা প্রকাশ পায়নি। সে তার অফ ডিউটি ঘণ্টাগুলি রাজপুত্রের সঙ্গেই যথারীতি অতিবাহিত করতে লাগল। বাটাফ্ল্যান নগ্ন নাচের আগে ও পরে এই দুজনকে একই টেবিলে কুজনে, হাস্যে লাস্যে কাল কাটাতে দেখা গেল। এমন কি যৌন আবেদনে মাখো মাখো নাচের প্রাইভেট রিহার্সাল-কালীনও ভিক্টর নৃত্যরতা বারবারার কাছাকাছি বসে তা রসিয়ে রসিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল। অর্থাৎ দুজন দুজনকে প্রায় নয়নে হারায় এমনি প্রগাঢ় অবস্থা তাদের প্রেমলীলার।

সেইসব রিহার্সেলে বারবারা অনেক সময় ভিক্টরকে টেনে নিয়ে দ্বৈত নৃত্য করতে আহ্বান জানাতো। ওকে 'সাম্বো' এবং 'চা-চা-চা' নৃত্যে তালিম দিত।

সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায় বেশ চলছিল স্রোতের মত তরতরিয়ে প্রেম-পীরিতের লীলাখেলা। দিন এবং রাত।

এমন সময় ঘটনার গতি অদ্ভুতভাবে বাঁক নিল। বারবারা এক লোভনীয় কণ্ট্রাক্ট পেয়ে বসল। তাকে এবার ইতালীর রসাল সব নাইট স্পটে স্পটে নিজের নাগর মোহন নগ্ন দেহ দেখিয়ে বেড়াতে হবে। নগরে বন্দরে ঘাটে ঘাটে রসিকজনের কামার্ত দৃষ্টির সামনে বিবস্ত্র হয়ে সেইসব দর্শকবৃন্দের দেহেমনে কামনার সুড়সুড়ি দিতে হবে।

সুইজারল্যাণ্ডছেড়ে অবিলম্বে যুবতীকে ইতালীর মিলান শহরে যেতে হবে।

বারবারা ভেবেছিল, ভিক্টরকে একটা বিরাট সারপ্রাইজ দেবে এই শুভসংবাদ দিয়ে ও তাকে সেখানে ওর সঙ্গে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়ে। বারবারা জানত না যে ভিক্টরের স্বদেশের মাটিতে পদার্পণ আইনত ছিল নিষিদ্ধ।

যখন বারবারা তাকে ওর সঙ্গে মিলানে যাবার আমন্ত্রণ জানাল, ভিক্টরের শিশুসুলভ মুখ হতাশায় ধপ করে ঝুলে পড়ল, যেমনভাবে ঝুলে পড়ে বারবারার নগ্ন নৃত্যকালীন ব্র্যা।

ডার্লিং, ওখানে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। বিষণ্ণ মুখ ও কণ্ঠে ভিক্টর বলে, ওরা আমাকে ইতালীতে ঢুকতে দেবে'না।

শুনে অবাক হয় বারবারা। কিন্তু উপায় কি! তা'বলে সে তো আর লোভনীয় কণ্ট্রাক্ট ছেড়ে দিতে পারে না। অতএব···সুতরাং···চুম্বন···বিদায়। চুম্বনান্তে নায়িকা বিদায় নিয়ে যাত্রা করল নায়কের পক্ষে নিষিদ্ধ দেশ ইতালীর মিলানের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু এই বিরহকাল আদৌ দীর্ঘস্থায়ী হল না। বিরহের জ্বালায় দেহমনে

দগ্ধ হতে হতে ভিক্টর স্থির করে ফেলল সে নিষিদ্ধ সীমান্ত পার হয়ে অবশ্যই গিয়ে মিলিত হবে তার দয়িতের সঙ্গে।

ইতালীয়ান আইনের ক্যাথায় আগুন বা নিকুচি করেছে, এই ধরনের একটি বেপরোয়া বাণী সঘোষে উচ্চারণ করে এক অন্ধকার রাত্রে ভিক্টর রওনা হয়ে গেল স্বদেশাভিমুখে।

কাজলকালো সেই রাতে দেখা গেল একটি টুরিং সিডান গ্রাম্য রাস্তা ধরে সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে সুইচ-ইতালীয় সীমান্তের দিকে। রাস্তাটি বাজে, তাই খুব বেশী প্রহরা ছিল না। পুলিস পেট্রোল এদিকে বড় একটা আসেই না। বিরাট গাড়িটি হেডলাইট সহ যাবতীয় লাইট নিভিয়ে সেই গাঢ় তমসার মধ্য দিয়ে সাবধানে অতি ধীর গতিতে এবং প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছিল। যদি বর্ডার গার্ডরা আদৌ দেখেও থাকে এ গাড়িকে, তারা ব্যাপারটা কিন্তু রিপোর্ট করেনি।

অতি প্রত্যুষে সেই সিডান গাড়িটি নিয়ে উপস্থিত হল টুরিন-এর শহরতলীর মারকুইস অফ মন্টেজে মোলোর এস্টেট-এ।

মারকুইস সানন্দে আন্তরিক এবং রাজকীয় সম্বর্ধনা সহকারে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন তাঁর দেশের প্রাক্তন নৃপতির পুত্রকে। তিনি বর্তমান সরকারের কঠোর শাস্তি প্রভৃতির ভয়কে পর্যন্ত তোয়াক্কা না করে নিজ গৃহে রাজপুত্রের যতদিন খুশী থাকবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এবং রেখেও দিলেন। বর্তমান সরকার আর কোন ব্যাপারে কঠোরতা দেখাক চাই নাই দেখাক এই নির্বাসিত রাজবংশের দিকে তাদের কড়া নজর দিল।

এ বাড়ির যুবতী মেয়ে কাউন্টেস দি ব্রিয়েঙ্গার সঙ্গে এককালে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল রাজপুত্র ভিক্টরের, লুসার্নে। এমন কথাও তখন রটেছিল যে এই দুজনে বিবাহ বন্ধনে অচিরেই আবদ্ধ হয়ে সুখে শান্তিতে কালাতিপাত করবে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তা শেষ পর্যন্ত ফলবতী হয়নি। তবে ঐ হবু বিয়ে না হওয়ায় একটি কারণ অনুমান করা হয়েছিল একটি 'ছায়াছবি'কে ঘিরে। সেই সিনেমাটির নাম 'দি বেয়ার ফুট কণ্টেসা'। সে ছবির বিষয়বস্তু ছিল এই যে তার নায়িকা কণ্টেসা ছিল প্রেমপ্রণয় দেহ দানের এক উন্মাদিনী বিশেষ। সেই অনন্ত কামুকা কণ্টেসার ভূমিকায় চুটিয়ে অভিনয় করেছিল প্রখ্যাত অভিনেত্রী আভা গাডনার। যেহেতু নায়িকা অধিকাংশ সময়েই নাগর নিয়ে বিছানায় বিছানায় কাটাত, তাই তার আর জুতো পরার সুযোগ হত না। সেইজন্যই ছায়াছবিটির নাম দেওয়া হয়েছিল "দি বেয়ার ফুট কণ্টেসা' বা নগ্ন

পায়ের কণ্টেসা। গুজব ছিল যে এ ছবির নায়িকা চরিত্র কল্পনা করা হয়েছিল ঐ কাউন্টেস দি ব্রিয়েঞ্জাকে দেখে। তার জীবনযাত্রা প্রণালীর অনুপ্রেরণায়। তার চরিত্রের অনুসরণে।

ভিক্টর আবার ফিরে এসেছে, এ খবর পাওয়া মাত্র সেই ভূতপূর্ব নায়িকা কণ্টেসা এসে ফের জোঁকের মত লেগে গেল। রাজপুত্রকে বেশ কিছু ভাব ভালবাসার অভিনয়ের কাঠ খড় পুড়িয়ে প্রমাণ করতে হল যে সেবার যা হয়েছিল—ফরগেট ইট লেট দ্য বাই গন্স বি বাইগন্স। এবারে আমি 'তোমারই'। এবারের প্রেম নিখাদ, নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু ভবি বুঝি তাতে ভুলল না। অবশ্য পুরাতন প্রেমিকা গোপনে শপথ করে প্রতিশ্রুতি দিল যে সে তার পুরনো প্রেমিককে পলাতকরূপে নির্বিঘ্নে দেশে থাকতে প্রাণপণ সাহায্য করে যাবে। অবশ্য অনেক পরে ভিক্টর বুঝেছিল এ হল কোবরা সাপ যেভাবে তার আহার্য জীবকে সাহায্য করে, তেমনি সাহায্য করেছিল এই আহতা যুবতী তার প্রাক্তন প্রেমিককে। যার জীবনে বহু নারী এসেছে এবং যে প্রচুর নারী নিয়ে খেলেছে তার কিন্তু বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যম্ স্ত্রীষু · এই বেদ বাক্যটি শেখা উচিত ছিল। বিশেষ করে পরিত্যক্তা প্রেমিকাকে বিশ্বাস তো কোন মতেই নৈব নৈব চ। কিন্তু ভিক্টরের সে শিক্ষা হতে বুঝি তখনো বাকি ছিল। তাই সে সরল মনে আস্থা স্থাপন করেছিল কালনাগিনীসমা তার ভূতপূর্ব প্রেমিকা কণ্টেসার প্রতি।

ফলে যা হবার তাই হল।

এদিকে ভিক্টর গোপনে গোপনে মিলানে গিয়ে বারবারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এল। যে নাইট ক্লাবে বারবারা নগ্ন নৃত্য করত সে ক্লাবের ধারে কাছে সে ভুলেও যায়নি, পাছে কেউ দেখে ফেলে। ভিক্টরের ধারণা ছিল এতাবৎ কেউ তাকে চিনতে পারেনি। তাই তার কোন দুর্ভাবনাও হয়নি এ ব্যাপারে।

এদিকে ইনফর্মাররা এক সময় পুলিসকে সংবাদ দিয়েছিল যে নির্বাসিত প্রিন্স এ শহরেই আছে অজ্ঞাতভাবে।

ইতিমধ্যে প্রচণ্ড এক গুজব রটে গেছে যে রাজার স্বপক্ষীয়েরা অবিলম্বে দেশের অভ্যন্তরে এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের চক্রান্ত করছে। উদ্বিগ্ন সরকার সঙ্গে সঙ্গে টপ লেভেল এনকোয়ারী বসিয়ে দিল।

সরকারী চরদের প্রতি নির্দেশ হল, ভিক্টরকে দিবারাত্র ছায়ার মত অনুসরণ করে ফেরবার।

ভিক্টরের অত সব জানবার কথা নয়। সে নিশ্চিত ছিল, কেউ টের পায়নি তার এ দেশে আগমন। তাই সে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল।

একদা ফাঁদ উন্মোচিত হল বারবারার হোটেল সুইটে, এক রাত্রে। সেদিনই পালে বাঘ পড়ল। নগ্নিকা-রাণী এবং তার প্রিন্স চার্মিং দুজনে যখন প্রেম কুজনে মত্ত, এমন সময় সুইটের দরজায় প্রবল করাঘাত হল।

বারবারা গিয়ে দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে তিন টেক্কা অর্থাৎ তিনজন ইতালীয় সাদা পোষাকের ডিটেকটিভ হুড়মুড় করে ঢুকে গেল সুইটের অভ্যন্তরে এবং ভিক্টরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল, আইডেন্টিফিকেসন পেপার্স কোথায়?

ছদ্মনামে তৈরী কাগজপত্র এগিয়ে দিয়ে ভিক্টর পুলিসদের জানাল যে সে একজন ভ্রাম্যমান সেলসম্যান। পুরনো প্রেমিকার সঙ্গে হঠাৎ দেখা, তাই সে এখানে এসেছে।

আমাদের ভুল বোঝাবার চেষ্টা করবেন না, পুলিসেরা বলে ওঠে, আমরা কিন্তু আপনাকে চিনি।

অনন্যোপায় প্রিন্স ভিক্টর অবশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, তিনি রাজা উমবার্টোর উত্তরাধিকারীই বটে।

তাঁর ইতালীতে প্রবেশ যে স্রেফ ব্যক্তিগত সামাজিক এক কারণের জন্যেই হয়েছে একথা পুলিসদের বোঝাতে তাঁকে সাংঘাতিক বেগ পেতে হল। পুলিস কর্তৃপক্ষ বিপ্লবের গুজবকে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারছিল না। অবশেষে যখন পুলিসরা বুঝল যে রাজপুত্র শুধুমাত্র রাজকন্যার লোভেই এখানে এসেছিল, রাজত্বের লোভে নয়, তখন তারা আর কখন এ দেশে ঢোকবার চেষ্টা করবেন না এই উপদেশবাণী শুনিয়ে দিয়ে তাঁকে সশস্ত্র প্রহরায় সীমান্ত পার করিয়ে দিয়ে গেল।

বারবারা যথারীতি নাইট স্পটে স্পটে নগ্ন নৃত্য দেখিয়ে ফিরতে লাগল। তার রাণীর রোজগার ফেলে রেখে একজন নির্বাসিত রাজপুত্রের পেছন পেছন প্রেম পীরিতের ধান্ধায় যাবার মত এতটা নির্বোধ মেয়ে ইয়োরোপের 'দিল কা রাণী' বারবারা ব্রেন মোটেই নয়।

সহচরী

দুনিয়ার বহুস্থানে প্রায়ই নানা ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নিউ দিল্লি থেকে হংকং-হনলুলু, কাগজ খুললেই দেখবেন কোথাও না কোথাও কিছু একটা বিরাট সম্মেলন হচ্ছে কিংবা হবে। হিল্লি বিল্লি দিল্লি থেকে গাদা গাদা প্রতিনিধি এইসব বৈঠকে হাজির হন। হরেক রকম কারবার, হরেক রকম ব্যাপার! কখনো নিরস্ত্রীকরণ, কখনও সামাজিক, কখনো অর্থনৈতিক, কখনো রাজনৈতিক কখনো বা বৈঠকের বৈঠকী! আর এইসব বৈঠকের মধ্যে কত কিই না হয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য, আন্তর্জাতিক মৎস্য, আন্তর্জাতিক সিভিল বিমান, মোদ্দা কথা রাজজ্যোতিষীও জানেন না কাল কোন বৈঠক বসবে! বেশির ভাগ সময়ে জেনিভা, হেগ প্রভৃতি শহরে এইসব বৈঠকগুলো হয়। একটু কম নামী শহরের মধ্যে লুকার্নো ঘেণ্ট, আপসালা, স্ট্রাসবুর্গেও এইসব বৈঠক মাঝে মাঝে যে বসে না, তা নয়।

যে কথাটা বলতে চাই, চিড়িয়াখানায় যেমন শীতের মরশুমে ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ে আসে দূরের জায়গা থেকে, তেমনি এইসব বৈঠকেও, ঝাঁক ঝাঁক রূপসী মেয়েরা এসে ভীড় জমায়, প্রতিনিধিদের আনন্দবিধানের জন্যে। এদের কলগার্ল বললে ভুল হবে বরং এদের ভি, আই, পি বান্ধবী বলাই ভালো। পথেঘাটে বা হোটেলে দেখা কলগার্লদের সঙ্গে এদের পার্থক্য প্রচুর। এরা ভালো করে জানে যে, যেসব মানুষ ঠাণ্ডা লড়াইকে বরফ চাপা দেবার চেষ্টা করছেন, কয়েক সেন্টিগ্রেড জমে যাওয়া বরফ বাক্সের মধ্যে তাদের জমাট ঠাণ্ডা ভেঙে দেওয়ার জন্যে কিছু উত্তাপের, কিছু ওমের দরকার এবং এই দরকারটা মেটাতে পারলেই কিছু নগদ নারায়ণ হাতে আসবে!

সেবার উনিশশ' ষাট সালের মাঝামাঝি, জেনিভায় নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক বসেছে শীতের মাঝামাঝি।

প্রখ্যাত এক হোটেলের কোনো একটি ঘরের বাথরুমে জনৈকা সোনালি-চুল সুইস সুন্দরী একজন ফরাসী ভদ্রলোককে বাথটাবের মধ্যে প্রায় ঠেলে বসিয়ে দিয়ে গরম জলের কলটা খুলে দিলেন।

আহা! শোন, আমার এখন মোটেই সময় নেই, ফরাসী ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বলেন, প্রায় ন'টা বাজে, আমায় এখুনি নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে যেতে হবে।

সেখানে বেলা এগারোটায় গেলেও চলবে, মধুর হেসে সুন্দরী জবাব দিলেন, কিন্তু আমার মত সুন্দরীর হাতে স্নান করবার মজাটা তোমার নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক পাবে না!

আরেক হোটেলের কোন এক ঘরে।

জনৈকা ফরাসী রূপসী তার ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে মার্কিন প্রতিনিধিকে বললেন, আমায় আরও আটকে রাখলে কিন্তু ফেরবার প্লেন ভাড়াটা দিতে হবে।

তৃতীয় এক হোটেলের অভ্যন্তরে।

বার্লিন থেকে উড়ে আসা লুফথ্‌হানসা প্লেন থেকে নেমেই এক জার্মান তরুণী সরাসরি চলে আসে নির্দিষ্ট এক হোটেলে। সেখানকার ৮৪২ নম্বর রুমের দরজায় এসে সে নক করতেই দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল এক মদিরাক্ষী মার্কিন তরুণী, প্রশ্ন করল, কি চাই?

এটা কি ইংলিশ নেভাল এ্যাটাশের ঘর?

হ্যাঁ সখি, ঘুমে টুলটুলে মুখে হাই তুলে মার্কিন সুন্দরী উষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে, তুমি কে?

আমি? আমি হলাম গিয়ে—মার্লিন—মানে ওর—ওর কাজিন মানে ওর এক বোন। ও আমায় বার্লিনে টেলিগ্রাফ করেছিল এখানে এসে ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে!

তাই বুঝি, কৌতুকে চোখ নাচিয়ে মার্কিন রূপসী বলে, তবে শোন। আমিও হলাম ওর কাজিন গ্লোরিয়া। সিটি কাউন্সিলের ওয়েলকামিং বল্‌-এর আসরে এই ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমারও দেখা হয়। ওখানেই বোধ করি তোমার আসার কথা ছিল, কিন্তু তুমি সময়মত আসতে পারনি। অতএব ফ্রাউলিন, তুমি এবারকার মত বিদেয় হও।

আমি কী একবার নেভাল এ্যাটাশের সঙ্গে দেখা করতে পারি?

না, তা পার না। তিনি বেসামাল হয়ে ঘুমচ্ছেন। তা ওর দিকে আর নজর দিয়ে লাভ নেই, কিন্তু আমি তোমায় একজন ইতালিয়ান মার্শালের টেলিফোন নম্বর দিতে পারি? ইতালিয়ান চলবে তোমার? একটা কাগজের টুকরোয় টেলিফোন নম্বর লিখে জার্মান তরুণীর হাতে গুঁজে দিল সে। বললে, দেখ চেষ্টা করে। ভাল না লাগলে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিও।

ধন্যবাদ, কাজিন গ্লোরিয়া। জার্মান রূপসী বিদায় নিলো।

চতুর্থ হোটেলে।

স্থলযুদ্ধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বেলজিয়ান ভদ্রলোক বিছানাতে একটা চাদর গায়ে টেনে শুয়ে শুয়ে প্রায় অধৈর্য হয়ে ঢোকা দুজন পুলিশ অফিসারের বিরক্তিকর অভিযোগগুলো শুনছিলেন। পাশে আধশোয়া অবস্থায় অর্ধনগ্না স্প্যানিশ তরুণী। পুলিশদের আপত্তি এই তরুণীটিকে নিয়ে। এর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়েই তারা এসেছে।

একজন অফিসার বলছিল, আপনার ঠিক নিচতলার ঘরের নেদারল্যাণ্ড নিবাসী ভদ্রলোক পুলিশে এই বলে নালিশ জানিয়েছেন যে ভোর পাঁচটার সময় এই তরুণীটি সাংঘাতিকভাবে বিরক্ত করছিলো তাঁকে। ব্যালকনিতে বিবস্ত্র অবস্থায় চলাফেরা করছিল, ফুলের টবগুলো ছুড়ে ছুড়ে ফেলছিল আর অকথ্য চিৎকারে বলছিল, ফ্র্যাঙ্কোর মাথা গুঁড়িয়ে দাও। ফ্র্যাঙ্কোর মাথা গুঁড়িয়ে দাও।

বেশ তো, আমি স্প্যানিশ ডেলিগেশনের কাছে এজন্যে ক্ষমা চেয়ে নেব। মিটমাটের উদ্দেশ্যে বেলজিয়ান ভদ্রলোক বললেন।

না। এ মহিলাকে এখুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে, পুলিশ অফিসার কঠোরকণ্ঠে বলে।

কী! সহসা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে বসলেন বেলজিয়ান ভদ্রলোক। বললেন, ভুলে যাবেন না আমি ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটির অধিকারী।

সে অধিকার অবশ্যই আপনার আছে, শান্তকণ্ঠে পুলিশ অফিসার বলে, তবে আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের উপকারের জন্যই এই মেয়েটির অবিলম্বে জেনিভা থেকে সরে পড়াই ভাল। নয়ত আমরা যদি ওর পূর্বজীবনের বিভিন্ন ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তাহলে বোধকরি ব্যাপারটা খুব সুখকর হবে না।

কথা শুনে বেলজিয়ান ভদ্রলোক খুবই চটে গেলেন, বললেন, তবে শুনুন, আপনাদের নিজেদের উপকারের জন্যেই বলছি কথাটা। কোন মানুষের বিগত জীবনের তথ্য সংগ্রহ ও তাকে দেশ থেকে বিতাড়নের পূর্বে আপনাদের উচিত হবে আপনাদের উপরওয়ালার সঙ্গে সলা-পরামর্শ করা বা তাকে এখানে ডেকে আনা।

আন্তর্জাতিক কুটনীতিজ্ঞ অধ্যুষিত এই জেনিভায়, সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করে পুলিশ অফিসার বাক্যব্যয় না করে টেলিফোন ডায়াল করে উপরওয়ালাকে ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই অফিসারের সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। ফোন ছেড়ে দিয়ে সবিনয়ে বেলজিয়াম

ভদ্রলোককে এসে বললে, আমরা কি সাংঘাতিক কেয়ারলেস স্যার। কিছু মনে করবেন না স্যার। এই মহিলা…মানে, আ প না র এই সেক্রেটারী… এঁরও স্বাভাবিকভাবে অবশ্যই ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটি রয়েছে। তবু একটা অনুরোধ করব স্যার, ইনি যে আপনার সেক্রেটারী, সেটা অবিলম্বে রেজিস্ট্রি করিয়ে নিন। দেশের আইন এটাই।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, বেলজিয়াম ভদ্রলোক টেলিফোনের রিসিভার তুলে তরুণীর দিকে চেয়ে বললেন, ডার্লিং চুল আঁচড়ানোটা এখন একটু থামাও। ভাল কথা, তোমার নামটা যেন কি বলেছিলে আমায়? আবার বল, প্লিজ!

পঞ্চম হোটেলে।

তুমি ফিরবে কখন? আমি কি অপেক্ষা করব? ঘুমে আচ্ছন্ন কণ্ঠে দীর্ঘাঙ্গী ইতালিয়ান সুন্দরী প্রশ্ন করল কম্বলের তলায় শোওয়া অবস্থায়।

দেখছি। আজ ল-প্যানেলে কয়েকজনের সঙ্গে আবার দেখা করতে হবে। কিছু এজেণ্ডা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সবই প্রাথমিক আলাপ আলোচনা, আমেরিকান ভদ্রলোক বললে, ফিরতে পাঁচটার বেশী দেরি হবে না।

অতক্ষণ আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে কিনা বলতে পারছি না।

চুপ কর। তুমি আর কিছু অনাঘ্রাতা কুমারী মেয়ে নও। ন্যাকামি ছাড়।

অনাঘ্রাতা হই আর না-হই, আমি যা বলছি তা হক কথা।

বেশ বাবা বেশ, রেগে যেও না। আমিই বরং তাড়াতাড়ি ফেরবার চেষ্টা করব। তুমি ডার্লিং থেকে যেও।

পাঁচটি বিভিন্ন জাতীয় মেয়ে। পাঁচজন নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের ডেলিগেট। আর শহরের পাঁচটি হোটেলে অনেক ঘরে খোঁজ করলে এই ধরনের মোটামুটি আরও ঘটনার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নয়।

এইসব মেয়েরা, না সেক্রেটারী, না অ্যাসিস্টেণ্ট, কিংবা কারুর কাজিন বা ভগ্নীও নয়। এরা ডেলিগেট নয়, কনফারেন্সের উদ্দেশ্যে আসে নি। এসেছে কনফারেন্সের সুযোগে। যতক্ষণ সম্মেলন চলে ততক্ষণ এরা এখানেই থাকে। এইসব মেয়েরা যুদ্ধোত্তরকালের ইউরোপীয় নৈতিক অবনতির আবহাওয়ায় জাত ও পুষ্ট। এইসব মেয়েরা নিজেদের পেশায় বিশেষজ্ঞা। এরা সম্মেলন-শহরে ঘোরা ফেরা করে। এদের কথাবার্তা, আলাপ আলোচনাও সম্মেলন ঘেঁষা। মজা এই, এরা বুঝি একমাত্র এই কনফারেন্স আবহাওয়াটাকেই নিজেদের ব্যবসায় প্রকৃষ্ট স্থান হিসেবে নির্বাচিত করে নিয়েছে। অন্য কোন

পরিবেশ এরা পছন্দ করে না। এরা জন্মেছে বিগত যুদ্ধের সময়, লালিত পালিত হয়েছে শোচনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে। অভাব অনটন অনাহারের মধ্যে এদের অধিকাংশের বাল্য ও কৈশোর কেটেছে। তাই বুঝি যখন যৌবনে পৌঁছল, তখন এদের ধ্যানজ্ঞানের বাণী হল, ব্যবসা ব্যবসাই। আমোদ প্রমোদ আমোদ প্রমোদই। আর বিবেক? সে তো ধনীদেরবিলাস বস্তু বিশেষ।

তবুও বলতে হয়, এ জাতের আর পাঁচটা মেয়েদের থেকে এদের ধরন-ধারণই আলাদা। প্রধানত দেখা যায় এরা ইয়োরোপীয় মেয়ে। কিছু এশীয় এবং আমেরিকান যে নেই এমন নয়। এরা প্রত্যেকেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী। বিজ্ঞ ডেলিগেটদের সঙ্গে এদের সমানে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়। এদের সর্বপ্রধান গুণ হল এদের রূপ। এরা প্রত্যেকেই অসামান্যা রূপসী। কুৎসিত সাধারণ চেহারারও এখানে প্রবেশাধিকার নেই।

এইসব শহরে দেখা যায় স্থানীয় একদল বিশিষ্ট ধনী বিদেশী ডেলিগেটদের সম্মানে পার্টি দেন। সেখানে ডেলিগেটবর্গ তাঁদের সহচরীদের নিয়ে গিয়ে নাচ-গান খানা-পিনা প্রভৃতিতে সন্ধ্যেবেলাটা নিজেদের চাঙ্গা করে তোলেন।

এইরকম একটি পার্টিতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন জনৈক মার্কিন সাংবাদিক। উদ্দেশ্য ছিল এই ধরনের মেয়েদের সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা। খানা-পিনা, নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড়ের মাঝখানে তিনি একটি সুন্দরী জার্মান মেয়েকে বেছে নিলেন আলাপ-আলোচনার জন্য। ঐ মেয়েটি এসেছে জনৈক ফরাসী ডেলিগেটের সহচরী হয়ে। উক্ত ফরাসী ভদ্রলোক সে সময় ভীষণ চটে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। কে যেন জেনারেল দ্য গলের প্রতি নিন্দাবাণী উচ্চারণ করেছিল। আর যাবে কোথায়! উভয় পক্ষ প্রবল তর্কাতর্কিতে মত্ত, কিঞ্চিৎ সুরামত্ত অবস্থায়। এই ফাঁকে সেই জার্মান সহচরীকে একান্তে নিয়ে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন সাংবাদিক ভদ্রলোক। সেই আলাপের সূত্রে জানা যায়: প্রথমে মেয়েটি স্বীকার করতে চায়নি তার পেশাগত পরিচয়।

আপনি কি করে বুঝলেন যে আমি ঐ ধরনের জঘন্য জীব?

তা বুঝিনি। তবে সন্দেহ করেছি, সাংবাদিক ভদ্রলোক এরপর একটি অমোঘ বাক্যবান ছাড়লেন। বললেন, এ পার্টিতে উপস্থিত দশটি অপরূপ রূপসীর মধ্যে তুমি যে একেবারে ওপরের সারিতে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

এতেই কাজ হল। মেয়েটি গললো। তারপর যথাযথ উত্তর দিয়ে যেতে লাগলো সাংবাদিকের প্রশ্নগুলির।

এরা কি কোন সঙ্ঘবদ্ধ সংস্থার হয়ে কাজ করে? না, এরা স্বাধীন এককভাবে কাজ করে। এদের কোন সিণ্ডিকেট নেই। ব্যক্তিগত আমন্ত্রণেই এরা সাড়া দেয়। অনেক সময় একাধিক আমন্ত্রণ এলে সম পেশার সখিদের মধ্যে তা বিলিয়ে দেয়। কনফারেন্স-এর মানুষই হল এদের একমাত্র লক্ষ্য। শুধু দৈনিক পত্রিকার ফরেন অ্যাফেয়ার্স কলমের দিকে নজর রাখতে হয়। প্রতিটি মেয়ের অবশ্যই থাকা চাই, ইভিনিং গাউন এবং বিকিনি। বারোমাসে তেরো পার্বন। বিভিন্ন শহরে সারাবছরই কোন না কোন কনফারেন্স লেগেই আছে। তাই বেকার বসে থাকতে হয় না কখনো। অবশ্য গেলেই যে কাজ হবে, এমন কোন কথা নেই। অনেক ক্ষেত্রে নিরাশ হয়েও ফিরতে হয়। ডেলিগেটদের কাজ এক হিসেবে কঠোর ও বিরক্তিকর অন্য হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব তাঁদের কেউ কেউ যদি সঙ্গিনীসহ সন্ধ্যা বা রাত্রি কাটাতে চায়, তো দোষ দেওয়া যায় কি? সারাদিনের গুমোট ও কঠোর আবহাওয়ার পর একটু বসন্তের বাতাস। অবশ্য এ জাতের ডেলিগেট সংখ্যায় কম, ব্যতিক্রমই বেশ। জার্মান মেয়েটি জানায় সে দৈনিক তিনশো পঞ্চাশ টাকা চার্জ করে, এর ওপর হোটেল খরচা, প্লেনের ভাড়া প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের যাবতীয় খরচা প্রতিনিধি নায়কের।

সাংবাদিক ভদ্রলোকের সবিস্ময় প্রশ্ন, ডেলিগেটদের পক্ষে এত খরচা করা কি করে সম্ভব?

না না, ডেলিগেটদের বিশেষ কিছু পকেটে হাত পড়ে না। সম্মেলনে তাঁদের নিমন্ত্রণকারীরাই তথাকথিত মিসেস ডেলিগেট-এর প্লেন ও হোটেলের খরচা দিয়ে থাকে।

সাধারণতঃ ফোনে ফোনে ওঁদের সংবাদাদি আদান প্রদান হয়ে থাকে। বেশীর ভাগই পুরনো পরিচিত মানুষরা ডেকে থাকেন। এই জার্মান মেয়েটির এমনি পনের-কুড়িজন পরিচিত খদ্দের আছেন। ক্রমানুসারে এঁদের কাছ থেকেই ডাক আসে। ডাক এলে অন্য কাজ ফেলে এরা চলে যায় সেখানে। কেননা সম্মেলনী আবহাওয়াই হল এদের প্রাণ, ধ্যান এবং জ্ঞান। এদের অনেকের বাৎসরিক আয় (উপহারাদি সমেত) অবিশ্বাস্য ধরনের অর্থ।

এবারকার প্রশ্ন হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এইসব মেয়েরা যেভাবে প্রতিনিধিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেশে তাতে অনেক কিছু গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ জরুরী সংবাদাদি এদের গোচরে অবশ্যই আসে।

সেইসব সংবাদ ফাঁস করা বা ফাঁস করার ভয় দেখানো, কিংবা অপরাপর

ব্যক্তিগত ব্যাপারে ঐ সব ভি, আই, পি মানুষদের ব্ল্যাক-মেইল করবার সম্ভাবনা তো সর্বাধিক। এসব ব্যাপারে অনেক সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে। এক দেশের গোপন কথা অপর দেশে বিক্রি করলেই তো সব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। ব্রিটিশ কনজারভেটিভ গভর্নমেণ্ট এবং ক্রিশ্চিন কিলার ঘটিত সেই ধরনের কেলেঙ্কারীর উদ্ভব হওয়াও বিচিত্র নয়।

এর জবাবে মেয়েটি বলে, কথাটি ঠিক। তারা অনেক কিছুই জানে এবং শোনে। যেগুলো অপর কান বা পাঁচকান হলে প্রকৃতই সর্বনাশ। কিন্তু কথনো সে মুখ খুলেছে কি? না, কক্ষনো নয়। কথনো খোলেনি এবং যাবজ্জীবেৎ ভবিষ্যতেও খুলবেও না। অর্থ, প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন, কোন কিছুতেই না, আর আমাদের পেশার কোন মেয়েই মুখ খোলার বোকামী করবে না এ ব্যাপারেও আমি ধ্রুব নিশ্চিন্ত, জার্মান মেয়েটি জোর দিয়ে বলে। প্রতিনিধিদের জগৎ আলাদা, আমাদের জগৎ আলাদা। তারা নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে আলোচনা চালায়, কিন্তু অনেকেই এ ব্যাপারে বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি। কেননা এইসব বৈঠক কমে গেলে আমাদের ভবিষ্যৎও তো অন্ধকার। অতএব আমাদের নিজেদের রুজিরোজগারের কথা ভেবেই আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করি না। অ-ব্যাপারে মাথা ঘামাই না। যেখানে বাস সেখানে চাষ করতে যাই না।

আর একটি ব্যাপার হয় অনেক কনফারেন্স-শহরে। সেখানে আরেক ধরনের মেয়েদের ভীড় হয়। ঘরোয়া মেয়ে, ভদ্রঘরের মেয়ে। যারা ডেলিগেটদের সঙ্গে মেলামেশার জন্যে দারুণ আগ্রহী হয়। যে কোন ধরনের মেলামেশা। কেননা তাদের কাছে এইসব ডেলিগেটরা মহৎ মানুষ। এরাই নিজ নিজ দেশ এমন কি দুনিয়ার গতি-প্রকৃতিও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এদের সঙ্গে মেলামেশা বা ঘনিষ্ঠতা করার সুযোগ সুবিধেই বা ক'জন পায়? এটা প্রকৃতই একটা গৌরবের স্মৃতি। তাই এই সমস্ত ভদ্রমেয়েরা হন্যে হয়ে ধাওয়া করে প্রতিনিধিদের সান্নিধ্যে। এদের পেছনে পয়সা খরচের তো প্রশ্নই নেই, বরং এরা উল্টে নিজেরাই খরচ-খরচা করতে প্রস্তুত। আহা, বিশ্বশান্তির জন্য যাঁরা চেষ্টা করছেন তাঁদের একটু সাহায্য করা আর কি।

সাংবাদিক ভদ্রলোকের এবারকার প্রশ্ন হল: ব্যাপার যদি এই হয়। বিনা ব্যয়ে যদি এমন তরুণী সব সঙ্গিনী পাওয়া যায়, তাহলে কেন মিছে ঐ সব ভি, আই, পি কলগার্লদের পেছনে অত টাকা খরচা করতে যাওয়া?

এর জবাব হল: ধরতে গেলে এইসব ভাড়া-করা সঙ্গিনীদের জন্ম

প্রতিনিধিদের আদৌ গাঁটের পয়সা বিশেষ খরচা হয় না।

সম্মেলন হওয়া দেশ, ইউ-এন কিংবা অন্য কেউ প্রতিনিধিদের হোটেল খরচা, রাহা বা যাতায়াত খরচা বহন করে থাকে অ্যালাউন্স হিসেবে। বাড়তি খরচা কিছু লিখে, কিছু বক্তৃতা দিয়ে, কিছু স্থানীয় নারী রূপ গুণমুগ্ধাদের সৌজন্যে অনায়াসে চলে যায়।

দ্বিতীয় ব্যাপার হল এইসব বাইরে থেকে আসা ভাড়া-করা মেয়েদের নিয়ে কোন ঝামেলা নেই, জটিলতা নেই। আমোদ আহ্লাদ অন্তে যে যার দেশে ফিরে যাও। আবার দেখা হবে পরবর্তী বৈঠকে। কোন ঝঞ্ঝাট নেই; কেলেঙ্কারী নেই, নেই কোন গর্ভবতী হবার ঝামেলা কিংবা বিয়ে করবার বিরক্তিকর বায়নাক্কা।

অতএব স্থানীয় ভদ্রঘরের সুন্দরীদের চেয়ে হাজার গুণে ভাল উড়ে আসা উড়ে যাওয়া তথাকথিত ভি. আই, পি সহচরীরা।

সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয় হল এমন একজন মার্কিন ভদ্রলোকের যিনি এই ধরনের একটি ভদ্রলোকের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে একদা মহা বিপদে পড়েছিলেন। তিনি শহরের স্থানীয় বাসিন্দা এক ধনী কন্যার সঙ্গে পরিচিত হলেন। যুবতী কন্যাটি তাঁর সঙ্গে প্রায় জোঁকের মত সেঁটে রইল। ধনী কন্যা দু'হাতে পয়সা ওড়াতে লাগল তার ডেলিগেট দয়িতের জন্য। নিজের মোটরে করে যত্রতত্র গমন, হোটেল মোটেলে আহার বিহার, চূড়ান্ত ফূর্তিতে দিনরাত সরগরম হয়ে উঠল তাদের। আত্মহারা বিহ্বল ডেলিগেট তরুণ ভদ্রলোক চরম চমকে উঠলেন একদিন, যখন এক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে মেয়েটি জানালো তার মনোগত বাসনা। সে নাকি ওঁর সঙ্গে নিউ ইয়র্কে যেতে চায়। সেখানে যা হয় কিছু একটা পড়াশোনা করবে। মোটমাট মেয়েটি তাঁকে ছেড়ে আদৌ থাকতে পারবে না। অর্থাৎ বিয়ে কর তাকে। সর্বনাশ, বলে কি! কিছুদিন বাদে আরেক বজ্রাঘাত। মেয়েটি জানালো সে গর্ভবতী। পাগল হবার অবস্থা প্রতিনিধি ভদ্রলোকের। এরপর অবশ্য মেয়েটির পিতা মধ্যস্থ হয়ে তাঁকে বাঁচালেন বলা যায়। মেয়েটিকে ডাক্তারী পরীক্ষা করে দেখা গেল সে আদৌ সন্তানসম্ভবা নয়। বিয়ে করবার ওটা ছিল একটা অপকৌশল মাত্র। আর নয়। সুতরাং যঃ পলায়তি! প্রতিনিধি ভদ্রলোক বৈঠকের অনুমতি নিয়ে কিছু পূর্বেই সে স্থান ত্যাগ করলেন। সময় সমস্ত কিছুর নিরাময় করে। কিছুকাল পরে ফের তিনি সে শহরে গিয়েছেন কনফারেন্সে। তখন উভয় পক্ষই, উভয় পক্ষের কথা যথারীতি ভুলে গেছে। অতএব এ কাহিনীর নীতিকথা হল: ভদ্র-মেয়ে নৈব

নৈব চ। তার চেয়ে ঐ উড়ে আসা উ:ড় যাওয়া মেয়েরাই শতগুণে ভাল।

সাংবাদিক ভদ্রলোকের এবারকার জিজ্ঞাসা হল, কিভাবে গ্রেপ্তার এড়িয়ে এইসব মেয়েরা কনফারেন্স শহরগুলিতে অবাধে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে? যখন ইয়োরোপের অধিকাংশ শহর বন্দরেই গণিকাবৃত্তির ওপর কর্তৃপক্ষ খড়্গহস্ত, তখন এটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে।

এর জবাব পাওয়া গেল একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে। তিনি এর জবাব দিলেন দুটি শব্দে 'ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটি'।

কিছু ডেলিগেট বলেন, তাঁরা নারী সান্নিধ্য চান মানসিক অবসর বিনোদনের জন্য। মনের শান্তি হলে সব শান্তি! কনফারেন্সগুলি সাফল্যলাভ করে। কনফারেন্স-শহরে ডেলিগেটরা যা কিছু চান তাই তাঁরা পেয়ে থাকেন। এইসব বৈঠক বসায় শহরেরও নানাদিকে ব্যবসা বাণিজ্য সমেত নানাবিধ উপকারই সাধিত হয়। এখানে ঝামেলা হলে তখন আবার অন্য শহরে বসবে সম্মেলন। সেটা আদৌ কাম্য নয় এ শহরে।

আমরা মনে রাখি 'ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটি' আর তাই ভেবে চুপ করে থাকি। যদি তা না করি ডেলিগেটরা ঐ সব মেয়েদের কাজিন, এ্যাসিস্টেণ্ট, স্ত্রী, সহচরী ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করে থাকেন। আর আমাদের পক্ষে তখন আর ওদের স্পর্শ করা সম্ভব হয় না। ডেলিগেটদের ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটি তাঁদের সঙ্গে যারা বাস করে তাদের মধ্যেও বর্তায়। উপায় নেই। ওরা বাইরে থাকলে আমরা নজর রাখতে পারি, যাতে কোন কিছু ঝামেলার শুরু না হয়। আরেকটা কথাও আমরা ভাবি, যে-সব মানুষ দুনিয়া থেকে বোমা ও অস্ত্রাদি চিরতরে বিলুপ্ত করার মহান প্রচেষ্টায় ব্রতী রয়েছেন, তাঁদের যারা দু'দণ্ড শান্তি দিচ্ছে, তাদের প্রতিও আমাদের কেমন একটা প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদও রয়েছে। বিশ্ব শান্তি আসুক প্রতি মানুষের মত আমাদের কাম্য।

অবশ্য সেবার কিন্তু ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটিও রক্ষা করতে পারল না ওদের। সেবার ফিনল্যাণ্ডের কোন এক শহরে সম্মেলকালীন একরাত্রে একজন ডেলিগেট ও এক সহচরী বিছানায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। কাজটা যদিও ছিল পেশাদার দুর্বৃত্তদের। কিন্তু স্থানীয় সরকার প্রচণ্ড ক্রোধে 'ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটির' তোয়াক্কা না করে ঐ শহরের যাবতীয় বহিরাগত তরুণী, যারা আদেশপত্র বা বিবাহের সার্টিফিকেট দেখাতে পারিবে না, তাদের কালবিলম্ব না করে ঐ দেশ ত্যাগ করবার নির্দেশ দিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল স্থানীয় বিমান বন্দর শহরত্যাগী তরুণীতে ভরে গেছে।

কিন্তু হলে কি হয় আবার ভিন্ন শহরে ভিন্ন রূপে ভিন্ন কনফারেন্সও তাদের দেখতে পাওয়া যায়!

অতি নিষ্ঠুর কণ্ঠে তীব্র একটা আর্তনাদ করে উঠল মানুষটা। তারপর জান্তব গোঙানী, দাঁতে দাঁত চেপে মুখটা বিকৃত করে প্রবল বেদনাকে চাপবার চেষ্টা করল। উন্মুক্ত পিঠে এক একটা নিদারুণ কশাঘাত পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহটা তার দুমড়ে মুচড়ে পাক খেয়ে উঠছিল অসহ্য ব্যথায়। ব্যালেন্স রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল সে, সারা দেহ বেয়ে দরদর স্রোতে ঘাম পড়ছিল।

সপাং সপাং সপাং—এক একটা চাবুক সমস্ত দেহকে কাঁপিয়ে দিয়ে নেমে আসছিল। মুখে বের হচ্ছিল উঃ আঃ, মনে মনে বাপাস্ত করছিল সে। ভীত সন্ত্রস্ত চোখ নিয়ে সে উপর দিকে তাকালো। দুহাত তার দড়ি দিয়ে একটা গাছের ডালের সঙ্গে এমন ভাবে বাঁধা যে মাটিতে পুরো পা রাখতে পারছিল না, পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। দুহাতের কব্জীতে দড়িটা যেন কেটে বসে যাচ্ছিল, রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হাতদুটো যেন অসাড় হয়ে গেছে। আর উন্মুক্ত পিঠটা...উঃ দেখতে সে পাচ্ছেনা কিন্তু অনুভবে বুঝতে পারছে দগদগে ঘা হয়ে গিয়েছে চাবুকের পরপর আঘাতে।

ওর নীল সার্টটাকে এরা দানবীয় শক্তিতে ছিঁড়ে দিয়েছে।

এরপর সহসা সেই বনভূমির মধ্যে নিঃশব্দতা নেমে এল। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। তিনদিকে পাহাড় ঘেরা নির্জন এলাকাটায় শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। নাম না জানা সুগন্ধী ফুলের সুবাসে স্থানটা আমোদিত। গাছের ডালে হাত বাঁধা লোকটার কাছে অবশ্য এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মূল্য এক কানাকড়িও ছিল না।

ওর মুখে জিভে চোখে অভিব্যক্তিতে চরম ভয় পরম আতঙ্ক।

সপাং সপাং সপাং। আবার শুরু হল চাবুকের আঘাত। পুনরায় আর্তনাদ করে উঠতে লাগলো বন্দী যুবক।

—পাঁচটা আরও? একটি নারীকণ্ঠ প্রশ্ন করে।

—না আরও দশটা; একটু ভারী কণ্ঠের অপর একজন নেতৃস্থানীয়া নারী বলে উঠলো, তবে তার আগে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম।

সবসুদ্ধ দশজন ঘিরে রয়েছে পুরুষ বন্দীটিকে। ঘিরে দাঁড়ানো সবাই মেয়ে।

এবং হাত পা ও দেহের অংশ বিশেষ দেখে বোঝা যায় তারা প্রায় সকলেই যুবতী। মুখ কারুরই দেখা যাচ্ছে না, কেননা কাঁধ অবধি নেমে এসেছে মুখ ঢাকা কালো রঙের ভারী কাপড়ের মুখোস। শুধু চোখ দুটি ও মুখের সামনেটায় ছোট ফুটো। লাল বা কালো টাইট স্কার্ট পরা সবাই। সুগঠিত পা কালো মোজায় আবৃত। কিন্তু সবচেয়ে কৌতুকপ্রদ মনে হয়, মার্কীন দেশের টেনেসির পার্বত্য অঞ্চলে কিনা এসব মেয়েরা চমৎকার ঝকঝকে কালো রঙের হাইহিল জুতো পরে আছে। এই জুতোগুলোর মধ্যেই মনে হয় ভয়ংকর এক নিষ্ঠুরতার ভাব বিদ্যমান। মেয়েগুলির অনেকের যৌবন ঢল ঢল দেহ সৌষ্টব প্রকটিত হয়েছিল সেই লো-কাট টাইট স্কার্টগুলির সৌজন্যে। প্রতিটি মেয়েই দীর্ঘাঙ্গ।

কিন্তু গাছের ডালে বাঁধা বন্দী পুরুষটির কাছে এই মেয়েগুলির লাবণ্য ছানিত দেহ এবং গা শিরশিব করা সেক্স আদৌ উৎসাহ ব্যঞ্জক ছিল না। নিদারুণ ভয় ও আতঙ্কে দ্রুতলয়ের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে সে প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিল। তার পিঠে লম্বা লম্বা রক্তাক্ত দাগ ফুটে উঠেছিল ভীষণ ভাবে। সেখানে বুনো কয়েকটা বৃহদাকার মাছি এসে বসে বসে রক্ত খাবার চেষ্টা করছিল।

লোকটা চারদিকে কাতর ভাবে চাইল। ক্রন্দন রুদ্ধ কণ্ঠে মিনতি করে উঠলো, আমায় ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন। এবার থেকে আমি ভাল ভাবে চলব।

চারদিক থেকে এর প্রত্যুত্তরে বিদ্রূপের কশাঘাতের মত কলকল খলখল হাহাধ্বনীর অট্টহাসি হেসে উঠলো মেয়েরা।

ক'মিনিট বাদে তারা ওর চার দিকে বৃত্তাকারে ঘোরা বন্ধ করে দিল।

—সময় হয়ে গেছে। শাস্তি শেষ,' একটি দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে ঋজুকণ্ঠে বলে ওঠে।

এবার মেয়েরা তাদের বৃত্ত আরও কমিয়ে আনলো বন্দীর চারদিকে। সহসা সেই ঘোড়ার চাবুকটা শূন্যপানে তুলে ধরলো একটি মেয়ে।

এখন কথা হল কে এই বন্দী? কে সে বন্দী? আর মুখোসধারী মেয়েগুলিই বা কে? কেনই বা চাবুক মারছে বন্দী পুরুষটাকে!

এত কথা জানতে হলে কিছু পূর্ব কথার অবতারণা প্রয়োজন।

ছোট্ট শহর, নাম লিভিন্সে। জনসংখ্যা হাজার চারেক মাত্র। ধর্মভীরু মানুষ সব। প্রতি রোববার গীর্জায় ভীড়ে ভীড়। বিনোদনের ব্যবস্থা যে নেই এমন নয়। দু দুটি মদ্যশালারূপ সেলুন আছে। আগে ভীড় হত কিন্তু বর্তমানে অকস্মাৎ ঐ দুটি দোকানের বিক্রি একেবারে কমে গেছে। কারণ? সেকথা পরে আসছে।

একটি সেলুনের মালিক তো বলেই ফেলেছে, এ শহরের লোকগুলি কাপুরুষ হয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। তারা মদ খেতে আসতে ভয় পায়।

এ শহরের আরেকটি প্রাকৃতিক অসাম্য রয়েছে। অর্থাৎ পুরুষদের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ। অতএব কিছু লচপচে ধরণের পুরুষ এই ব্যাপারটার সুযোগ সুবিধা পুরো মাত্রায় গ্রহণ করে চলেছে। মাঝে মাঝেই "ঘটনা" ঘটছিল। ঘটছে নয় ইতিপূর্বে ঘটেছিল। এখন সেসবও একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

জেক লিঙ্ক-এর নাম সম্প্রতি লোকের মুখে মুখে ফিরছিল। আরেকটি শব্দও খুবই শোনা যাচ্ছিল, সেটা হল : ভিজিল্যান্টিস্। এই দুটি শব্দ উচ্চারিত হলেই সবাই সচকিত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। জেক-এর নাম উঠলে মেয়েদের মুখে হাসি দেখা দেয়। অপরদিকে পুরুষদের মুখ হয়ে যায় গম্ভীর।

কে এই জেক লিঙ্ক? লোকটা এখানে এক কৃষকের হয়ে কাজ করতে এসেছিল। সে এখানকার মিসেস পটার নাম্নী বিবাহিতা এবং কয়েকটি সন্তানের জননী। এক শান্ত স্বভাবের ভদ্রমহিলাকে নিয়ে গাড়ি করে লাভার্স লেন ইত্যাদি নিরালা স্থানে যাতায়াত করতে লাগলো। ফেরবার মুখে দুজনকেই বেশ পা টলটল অবস্থায় দেখা যেত।

এই ধরণের ঘটনাই লিভিল্লে শহরের পক্ষে যথেষ্ট। সবাই লিঙ্ক-এরই দোষ দিল। কেননা বিবাহিতা মহিলাটি নাকি ভাল স্বভাবেরই ছিল। এ ব্যাটাই ফুসলেছে ভাল স্বভাবের মেয়েটিকে।

চারদিকে চাঞ্চল্য দেখা দিল এ ঘটনায়। চাঞ্চল্য দেখা দিল আরেকটি দলেও, যারা শহরের সামাজিক জীবনে ইদানিং সবিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছিল। তারা ভয়ংকর ভাবে হিংস্র তৎপরতায় মেতে উঠল।

দিন চারেক বাদে "রীতার রেষ্টুরেন্টে" বসে কফি খাচ্ছিল এক বুড়ো, সে কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো একটা দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ মেয়ের পানে তাকিয়ে সহাস্যে বলে ওঠে, জানলে রীতা, উঃ দেখলাম বটে লিঙ্ককে আজ সকালে, কাল রাত্তিরে বাছাধনকে কারা যেন বাজিয়ে ছেড়েছে। সারা পিঠটার ওপর দিয়ে যেন গাধা বা খচ্চর লাফালাফি করে গেছে। ডাঃ হেনার ওকে বর্তমানে চিকিৎসা করছে।

নিরুত্তাপ উৎসুকহীন কণ্ঠে রীতা বলে ওঠে, তাই বুঝি। সত্যি? রেষ্টুরেণ্ট ভর্তি মানুষ যেন রীতার একটা সরাসরি মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করছিল। লম্বা চওড়া এই মেয়েটিকে দেখলে মনে হয় ওর দেহমন যেন ইলেকট্রিক চার্জ করা।

এই রেষ্টুরেণ্টে বসে কেউ উলটো পালটা ব্যবহার করতে সাহস পায় না।' কেননা সবাই জানে একবার দুজন কথা না শোনা অসভ্য ট্রাক ড্রাইভারদের এই রীতা প্রায় ঘাড়ে ধরে ঠেলে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছিল। রীতা হল সেই ধরনের দুর্দান্ত মেয়ে। চোখে যেন আগুন দেখা দিল রীতার। কঠোর কণ্ঠে বললে, লিঞ্চ-এর এটা প্রাপ্য ছিল, সে পেয়েও গেছে তা।'

খদ্দের শুধু শুনলো, একটি মন্তব্যও করল না, সবাই যেন খাওয়ার দিকে সবশেষে নজর দিল।

—ঐ ভিজিল্যাণ্টিস্‌দের ঈশ্বরের কৃপায় শক্তি আরও বাড়ুক, রীতা যেন নিজ মনেই বলে, এই লোকগুলির জন্যে এতটুকু করুণা বা দয়ার উদ্রেক হয়না আমার। এদের ঘোড়ার চাবুক দিয়ে উচিত শিক্ষা দেওয়াই উচিত।

ছোট্ট শহরটির পুরুষ মানুষদের মধ্যে এক অকথ্য ভীতির সঞ্চার হয়েছে, বিচিত্র ভয়, অসহায় ভয়। শহরের আকাশে বাতাসে যেন এই অজানা ভয় ভেসে বেড়াচ্ছে। এটা শুরু হয়েছে বছর খানেক পূর্বে যখন পিটি হারগ্রোভ নামক একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী স্থানীয় এক ব্যাঙ্কারের স্ত্রীকে ফুসলে নিয়ে গিয়েছিল।

পিটির বিরুদ্ধে মামলা হ'ল। কিন্তু অসহায় আইন কোন শাস্তি দিতে পারল না তাকে। কয়েক ঘণ্টা বাদে তাকে ফের দেখা গেল তার দোকানে বসে থাকতে। শহরের ভদ্র মেয়েদের ক্রোধের আর সীমা পরিসীমা র ল না। প্রতিটি অবিবাহিতা মেয়ে যেন কোরাসে গর্জে উঠল, কেন ; কেন, কেন !!! ব্যাঙ্কার প্রথমটা হুঙ্কার ছাড়লেও বর্তমানে ঘটনাটা ধামা চাপা দিতেই সবিশেষ উৎসুক দেখা গেল।

এর কদিন বাদেই গঠিত হল তথাকথিত এই ভিজিল্যাণ্টিসের মারাত্মক দল। কেউ অবশ্য খুব নিশ্চিত নয় কিন্তু একটা দৃঢ় সন্দেহ চতুর্দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল যে এই সুস্থ সমর্থ লম্বা চওড়া মেয়ে রীতা বোধকরি এ দলের নেত্রী। সন্দেহ অমূলক ছিল না, তবে সন্দেহ হিসেবেই চলছিল বহুদিন।

এরা যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে কোথায় যেন অশুভ একটা রিরংসা খেলা করছিল এ শহরের তথাকথিত বদমাইস পুরুষদের সায়েস্তা করবার ব্যাপারে। রীতার এই নিষ্ঠুরতার পেছনে রয়েছে তার সম্প্রতি একটি প্রেমে পড়ার করুণ ঘটনা। এ শহরেয় আপাত দৃষ্টিতে জনৈক ভদ্র মানুষের প্রেমে পড়েছিল মেয়েটি এবং ভেবে নিয়েছিল যে উভয়ের শুভ পরিণয় খুবই আসন্ন। এরপর বলতে গেলে চার্চের প্রায় দোড় গোড়া থেকে সেই আপাত দৃষ্টিতে জনৈক ভদ্র মানুষটি একটি খামার বাড়ির স্বাস্থ্যবতী মেয়ে লোপাট করে নিয়ে

হাওয়া হয়ে গেল।

রীতার আঘাতের পরিমাণ শুধু বুঝি রীতাই জানে? সেই থেকে তার মনে জন্ম নিল প্রতিহিংসার। অবশ্য তার প্রেমিক ভাগ্যবান সে এ শহর ছেড়ে চিরদিনের মত চলে যাওয়ায় কঠোর অপমান ও শারীরিক নিগ্রহ থেকে রেহাই পেয়ে গেল। তখন ঠিক হল এই ধরণের চপলমতি, চরিত্রহীন মানুষদের কিঞ্চিৎ শিক্ষাদান ব্যবস্থা না করলেই নয়। এই চরম গরমের মুখে গড়ে গেল পিটি হারগ্রোভ।

সে রাত্রে ঘুম এল না রীতার। সে তার পরিচিত শহরের তাগড়া তাগড়া অসম সাহসী মেয়েদের একটা দীর্ঘ তালিকা করে ফেললো। তার মধ্য থেকে কমিয়ে দশজনের নাম লিখলো ফাইনাল।

পরদিন রেষ্টুরেণ্ট বন্ধ হবার পর গাড়ি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো তালিকা ভুক্ত মেয়েদের বাড়ি বাড়ি। প্রস্তাব শুনে সমস্ত মেয়ে যেন এক পায়ে খাড়া হয়ে সম্মতি জানালো। কয়েকজন মেয়ের স্বামী প্রবরেরা যাকে বলে ধোয়া তুলসী পাতা, সাধু নয়। তারাও যোগ দিল। মেয়রের নির্যাতিতা এক বোনও এ দলে যোগ দিল। দলটি গঠিত হল হৃষ্টপুষ্ট ভীষণ স্বাস্থ্যবতী তিনজন ফার্মের মেয়ে, একজন ছ ফুট দীর্ঘ রক্ত কেশী নার্স এবং একজন তিরিশ বছর বয়স্কা জনৈকা বিদ্যালয়ের ফিজিকাল ইনস্ট্রাকট্রেসকে নিয়ে। প্রত্যেকেই শক্তিশালী দেহধারিনী কেউ কেউ ব্যায়ামবীরও।

অতীব সংগোপনে এই ভিজিল্যাণ্টিস দল গঠিত হল। গুপ্ত এক নির্জন পাহাড়ী পরিত্যক্ত ফার্ম বাড়িতে সদস্যরা মিলিত হয়ে কঠোর শপথ নিল, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্, এই হল আদর্শ। কানা ঘুষায় এ সংবাদ কানে যেতে পরম কৌতুক ভেবে শহরের অনেক পুরুষেরা পরিহাসের অট্টহাসি হেসেছিল। তারপর দু'একজনের পিঠে পড়তেই চমকে উঠল সবাই, ক্রমে ক্রমে ভীতির সঞ্চার হল। অপরাধী মানুষেরা খোঁড়াতে খোঁড়াতে, টলতে টলতে এসে যখন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হতে লাগলো তখন সবারই মুখ শুকিয়ে গেল।

কোন না কোন ধরণের চাল-বেচালে পথের পথিক মানুষেরাও ভীষণ দমে গেল। এরপর কার পালা? এই ভেবে সবাই অস্থির। মুস্কিল যে কখন কোথায় কবে এবং কার উপরে যে আঘাত আসবে পূর্বাহ্নে কেউ তা আঁচ করতে পারছে না। শাস্তির স্থানও প্রতিবারে পালটাচ্ছে। বিস্তৃত পাহাড়ী অঞ্চলের এক একটা নির্জন স্থান বেছে নিয়ে, সেখানে গাছের ডালে বেঁধে পিঠ খুলে

চাবুক মারা হয়। প্রথমে আসামীকে শোনানো হয় তার বিরুদ্ধে কি কি জঘন্য অভিযোগ রয়েছে।

ব্যাভিচার হল চরমতম অপরাধ এদের কাছে। চাবুকের আঘাতে আহত আসামীর চিৎকার এমন মর্মান্তিক হয় যে বনের পশুরাও সে আর্তনাদে থমকে গিয়ে নীরব হয়ে যায়।

দ্বিতীয় অপরাধ হল স্ত্রীকে প্রহার করা। রাস্তায় মাতলাম করা এর পরবর্তী অভিযোগ। এ ছাড়া আর লোক নিয়ে এরা মাথা ঘামাত না। পিটি হারগ্রোভই হল প্রথম হতভাগ্য ব্যক্তি যে এদের ক্রোধের শিকার হল।

এ শহরেই পিটির দোকান। লম্বা, পাখীর মত নাক, চোখে শয়তানী। দেখতে খুব খারাপ না এই পিটি। কি দুর্মতি হল তার। রোজ দোকান বন্ধ করে সে রীতার রেষ্টুরেণ্টে এসে বসত, এবং রীতাকে, রীতার সাংঘাতিক যৌবন ঢলঢল দেহকে যেন চোখ দিয়ে গিলে খেত। দু'চারটে ফষ্টি নষ্টি করবারও চেষ্টা করতে লাগলো অশোভন ইঙ্গিত সহকারে। প্রথম থেকেই লোকটার প্রতি নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মে ছিল রীতার মনে। শেষে একদিন ওর নিতম্বে চিমটি কাটার পর রীতা স্থির করে ফেললো সংকল্প। শহরের বাইরে কোথাও বেমক্কা পাওয়া চাই বদমাইশটাকে।

দীর্ঘ দেহেনী নার্স এসে সংবাদ দিল একদিন বিকেলে শহরতলীর এক জনবিরল স্থানে মাছ ধরতে রওনা হয়ে গেছে পিটি। মিলিটারী তৎপরতায় কাজ হয়ে গেল। সব মেয়েরা জড়ো হল। দুখানা গাড়ি হু হু শব্দে সেই শহরতলীর পথে রওনা হয়ে গেল রীতার নেতৃত্বে। গাড়ির মধ্যেই লাল স্কার্ট ও কালো মুখোস পরা হয়ে গেল!

কিছুক্ষণ বাদে এক মেঠো রাস্তায় দেখা গেল পিটি হুইল বর্শি নিয়ে হেঁটে চলেছে। দুখানা গাড়ি নিয়ে ওর সামনে অকস্মাৎ ব্রেক কসলো। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে পিটি দেখলো মুখোস পরা কতগুলো অদ্ভুত মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে তাকে ঘিরে ধরলো। একজন মেয়ের হাতে ধরা '৪৫ পিস্তল মারাত্মক ভাবে তার দিকে নিশানা করা। ভয়ে তার সর্বশরীর কাঁপতে লাগলো, চোখ হল ছানাবড়া। মুহূর্তে দেখলো সে তার দুহাত পিঠ মোড়া করে বেঁধে ফেললো এই ডাকাত মেয়েরা। তারপর তাকে মোটর গাড়ির পেছনের ট্রাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে ডালা নামিয়ে দেওয়া হল। দুটি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে হু হু করে চলতে লাগলো কোন্ দিকে কে জানে।

প্রথম কাজ তাই বুঝি নিষ্ঠুরতার কোন সীমা রইল না। শহরে টলতে

টলতে সবার অলক্ষে ফিরে পিটি বাড়ি গিয়ে শয্যা নিল। তার দোকান বন্ধ রইল দিন পনের।

খবর চাপা রইল না। ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়লো সারা শহরে। তৃপ্তির হাসি হেসে মেয়েরা বললে, বেশ হয়েছে, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

পুরুষরা 'হুম' শব্দে গুম হয়ে রইল।

খুব নিখুঁত ভাবে কাজ হল। রীতা আগের মতই স্মিত হাস্যে কাজ করে যেতে লাগলো। পুরুষ খদ্দেররা সভয়ে মেপে মেপে কথা বলে, হাসি হাসে।

শহরের নির্যাতীত নিপীড়িত স্ত্রীরা এসে গোপনে নালিশ জানাতে লাগলো ভিজিলেন্টিস এর নেত্রী রীতার কাছে।

একদিন মিসেস স্ট্যাফ নামে এক মহিলা এল রীতার কাছে। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেছে তার। দোকানের পেছনের ঘরে নিয়ে বসালো রীতা। মিসেস স্ট্যাফ বললে, রীতা আমি শুনেছি···মানে সব জেনেছি তোমাদের মহৎ ওষুধের কথা···জানো ভাই আমার স্বামী আমায় প্রায়ই মারে। আজ সকালেই কি মার মেরেছে। আবার বলেছে একথা যদি কাউকে জানাই তো আমাকে খুন করে ফেলবে।

রীতার চোখ জ্বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলে, তা আপনি কি চান!

—আমি চাই আমার স্বামী গুণ্ডাটার মনে একটু ভয় ধরিয়ে দাও।

—তিনি কি রাত্তির বাস করেন বাইরে?

—প্রায়ই করে। জুয়োর পোকা। রাত তিনটে চারটের সময় রোজ ঐ জঘন্য জুয়ার আড্ডা থেকে বাড়ি ফেরে।

—ঠিক আছে বাড়ি যান মিসেস স্ট্যাফ, রীতার চোখে কঠোরতা, মনে ক্রোধের দাউ দাউ আগুন।

সে রাত্রে মিঃ স্ট্যাফ অপহৃত হয়ে এক নির্জন স্থানে ভয়াবহভাবে নিগৃহীত হল, তাও কিনা কতগুলো মুখোশ পরা দানব মেয়ের হাতে। সেই এক কায়দা দুহাত দড়ি দিয়ে গাছের ডালে এমন ভাবে বাঁধা যাতে পায়ের বুড়ো আঙুলদ্বয় মাত্র মাটি ছুঁয়ে থাকে। জামার পিঠ ফস ফসিয়ে ছিঁড়ে, ঘোড়ার চাবুকের শপাং শপাং অসহ্য আঘাত। তার সঙ্গে চলে একটা শক্ত সামর্থ জোয়ান মানুষের আর্ত চীৎকার, কান্না, হা হুতাশ, আর করব না গোছের প্রতিশ্রুতি। নিষ্কৃতির পূর্বে নিম্ন এবং দৃঢ় কণ্ঠে এক নারী হুশিয়ার করে দেয়, এরপর যদি ফের এই অপরাধ পুনরনুষ্ঠিত হয় তো পরের বার দণ্ডদান হবে আরও কঠোর আরও ভয়ংকর প্রাণসংশয়কারী।

একবারই যথেষ্ট। স্ট্যাফ কয়েকদিন শয্যাশায়ী হয়ে থেকে যেন নতুন মানুষ হয়ে যায়। অলৌকিক ঘটনা। স্ত্রীকে এরপর থেকে সে প্রথম বছরের নতুন বউএর মত ভালবাসতে শুরু করে।

এইভাবে কিছু দাওয়াই-এর পর লিভেল্লি শহর সত্যি সত্যি ধর্ম-পুত্র যুধিষ্ঠিরদের শহর হয়ে গেল। সারা দুনিয়ায় এমন ভাল শহর কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

এমন সময় এক শয়তান এল সে শহরে।

চমৎকার পোষাক আশাক পরিহিত, অভিজাত আচার ব্যবহারের এই মানুষটির নাম মিঃ রেমণ্ড ব্লুম। বয়েস বছর পঁয়ত্রিশ।

বিরাট একটা বাইরের কোম্পানীর হয়ে এখানে জমি কিনে বড় কারখানা স্থাপনের জন্য প্রাথমিক কাজে এসেছে।

যথারীতি এক সময়ে সে এল রীতার রেষ্টুরেণ্টে। তারপর নিয়মিত খদ্দের। অভিজাত বিশিষ্ট খদ্দের। প্রথম দিন থেকেই রীতার দৃষ্টি লোকটির ওপর বেশ কিছুক্ষণ নিবদ্ধ থাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত সময়। কঠোর দৃষ্টিতে ঝিলিক মেরে যায় কৌতুহল ও কোমলতা।

ভারী সুন্দর হাসিটি মিঃ ব্লুমের, একটা ষ্ট্রেইট কফি দিন প্লিজ, সহাস্য ব্লুম আকর্ষণীয় দেহবতী রীতাকে বলে। নতুন মানুষ জানে না যে এ মেয়ে কি ভয়ংকর মেয়ে। কিন্তু আশ্চর্য চোখে চোখ পড়লেই রীতার মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠে কেন? পুরুষদের প্রতি আকণ্ঠ ঘৃণাবহ রীতার মন বুঝি ফের প্রেমে পড়ে যায় মিঃ ব্লুমের। উপায় নেই এই যৌবন জলবন্যা রুধিবে কে।

ছয় ফুট বৃষস্কন্ধ দেহী মানুষটা নিজের পরিচয় দিয়ে রীতার করমর্দন করে। রীতার দেহে বুঝি ইলেকট্রিক কারেণ্ট প্রবাহিত হয়ে যায় সে স্পর্শে।

মিঃ ব্লুমের বিরাট লাল কনভারটিবল গাড়িতে করে এরপর দুজনকে যত্র তত্র ভ্রমণরত দেখা গেল। রীতার বান্ধবীরা খুশী। আহা বেচারা এতদিনে উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পেয়েছে। ঘর বাঁধুক। সংসার ধর্ম পালন করুক। কত মেয়ের জীবন সুখী করে দিয়েছে, এবার নিজে সুখী হোক স্বামী সংসার ও সন্তান নিয়ে।

ভিজিলেণ্টিসের কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। স্থানীয় পুরুষরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে।

সাতদিনের মধ্যেই মিঃ ব্লুম জানালো তার বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে ডাইভোর্স হয়ে গেছে। না, কোন সন্তান হয়নি। সে এখন রীতাকে ভালবাসে।

রীতার জন্য সব কিছু সে করতে প্রস্তুত। রীতাও জানায় তার ভালবাসা। কিন্তু সে লোকটাকে বিশেষ এগোতে দেয় না, ঘনিষ্ট হবার সুযোগ দেয় না।

জড়িয়ে ধরে চুম্বনের উদ্যোগ করতেই হাত দিয়ে বাধা দিয়ে রীতা বলেছে, না, এত তাড়াতাড়ি নয়। এখনো আপনাকে আমার সম্পূর্ণ জানা হয়নি মিঃ ব্লুম।

কিন্তু বিশ্বাস করো রীতা, তোমার মত মেয়ের জন্যেই বুঝি আমি এই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর অপেক্ষা করেছিলাম। আমি তোমায় ভালবাসি রীতা!

—আমিও ভালবাসি। তবে আমি আরও নিশ্চিন্ত হতে চাই।

—তুমি আমায় বিশ্বাস করোনা রীতা?

—কিছুকাল আগে আমি আরেকজনকে বিশ্বাস করেছিলাম।

—তাই বুঝি। আফশোস। তবে সবাইকে এক ভেবো না রীতা।

রীতার চাউনী কোমল হয়ে এল। ওরা যেখানে গাড়িতে বসেছিল মনে পড়ে গেল একবার একজন অবিশ্বাসী স্বামীকে উত্তম-মধ্যম দাওয়াই দেওয়া হয়েছিল তার চরিত্রহীনতার জন্য।

এরপর আর বাধা দিলনা রীতা। দুজনের আলিঙ্গনের মাঝে কামনা সিক্ত ঠোঁট দুটি গভীর চুম্বনে লিপ্ত হল। ঘণ্টা দুই বাদে মোটর শহরমুখী হল। লাজারক্ত মুখ রীতার, তৃপ্তও সে। তবে বুঝি এবার বিয়ের ফুল ফুটলো। সত্যি তো? শহরের পুরুষ তার একটাও পছন্দের নয়। সে সুন্দরী নয়, তবে সে যেকোন স্বামীকে সুখী করতে সক্ষম, সে জানে কিভাবে সুখের ঘর সংসার করতে হয়। মিঃ ব্লুমকে মনে হল সত্যি সত্যি সৎ মানুষ। রীতার কাছে সে কোন কথা লুকোয়নি···

—ডার্লিং এখানে নাকি ভিজিলেন্টিস নামে একটি দুর্দান্ত মেয়ের দল আছে। শুনলাম ওদের ভয়ে নাকি সবাই তটস্থ?

এক মুহূর্ত রীতার দৃষ্টি ওর মুখ থেকে অন্যদিক পানে সরে গেল। পরে হেসে বললে, হ্যাঁ কথাটা ঠিকই! ওরা বেশ ভাল কাজই করছে। খুবই নিষ্ঠুরভাবে দুর্জনদের শায়েস্তা করে চলেছে।

—এখানকার পুরুষরা এই ভয়ে যেন একপাল নিরীহ ভেড়া বনে রয়েছে দেখলাম। আমার ভাবতে অবাক লাগে কে এরা?

—কেউ সঠিক করে তা জানে না, তেরছা চাউনী সহ রীতা বলে।

—কিন্তু ডার্লিং, হেসে বলে যায় রেমণ্ড ব্লুম, আমার বড় ইচ্ছে করে ওদের পাল্লায় পড়ি এবং দেখি ওরা আমায় কি করে।

—আহা ! ওকথা বলতে নেই, প্রায় ধমকে ওঠে চমকে যাওয়া প্রেমিকা রীতা।

দিন যায়। দুজনের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চলে। এবার ধ্রুব নিশ্চিত হওয়া গেছে যে দুজনের বিয়ে হবেই। কিন্তু মজা এই মুখ ফুটে ব্লুম কিন্তু এখনো বিয়ের প্রস্তাব করেনি। সকৌতুকে সাগ্রহে সেই প্রস্তাবের অপেক্ষা করে আছে রীতা। এও জানে লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে, যে কোন দিন প্রস্তাব উচ্চারিত হবে।

এ হেন সময়ে যেন হাইড্রোজেন বোমা পড়ল। শত বজ্রপাত হল।

এক সকালে মউড নামে একটি মেয়ে এসে রীতাকে কাউন্টার থেকে পেছনের ঘরে নিয়ে গেল। বলল, সাংঘাতিক জরুরী কথা আছে রীতা।

বুকটা যেন কেঁপে ওঠে রীতার। কি ? কি ব্যাপার বল জলদি।

—রীতা ! ঐ ঐ মিঃ ব্লুম···ওর স্ত্রী এসেছে এ শহরে !

—কী ! কী বললে ? রীতার কণ্ঠস্বর মুহূর্তে পালটে যায়, কক্ষণো হতে পারে না। ও ডাইভোর্স করেছে, ও আমায় বলেছে···

—আমার কথা শোন রীতা। আমি বলছি ভদ্রলোক এখনো বিবাহিত। স্ত্রীলোকটি হোটেলে এসে মিসেস ব্লুম বলে নাম লিখিয়েছে শুধু তাই নয় কিছু বাদে মিঃ ব্লুম এসে অপরাপর কিছু লোককে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় করিয়েছে। আমি বলছি লোকটা একজন প্রবঞ্চক। সে তোমার সঙ্গে ভিড়েছিল শুধু ·· শুধু···তোমার দেহ···।

এক ঝটকা মেরে রীতা বাইরে কাউন্টারের দিকে পা বাড়ালো। তার চোখে দাউ দাউ আগুন ক্রমে খুন বাসনায় রূপান্তরীত হয়ে গেল। তারপর যেন দেহের মাংসপেশী সহসা আলগা হয়ে গেল।

—না না কিছুতেই না, বলে ফুঁপিয়া কেঁদে উঠল। কুলিশ কঠোর মেয়ে রীতা, বলতে লাগল, এ মিথ্যে, এ মিথ্যে !

—এটা মিথ্যে নয় রীতা।

একটা চেয়ারে বসে পড়ে হুহু কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে রীতা। দমকে দমকে কান্নায় দেহ উথাল পাথাল হতে লাগলো।

তারপর এক সময় কান্না থেমে গেল। চোখে ফুটে উঠল বজ্রের বিভীষিকা। অবিশ্বাস্য শান্ত কণ্ঠে বললে, মউড, সবাইকে খবর দাও আজ রাত্রে আমাদের বিশেষ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। পাহাড়ের তলায় ঠিক নটার সময়। আমি ওকে সেখানে নিয়ে যাব। তুমি এক্ষুনি যাও, খবর দাওগে সবাইকে।

চোখ মুছে কাউন্টারে চলে গেল রীতা। মন কাঁদছে, রাগে ফুলছে কিন্তু,

বাইরে সে খদ্দেরদের সঙ্গে দু'একবার হেসে কথাও বললো। সারা অন্তরটা বুঝি তার একখণ্ড জমাট বরফে রূপান্তরীত হয়ে গেছে।

দোকান বন্ধ করবার মুখে সে ফোন তুললো, হ্যালো রে। আজ রাত্রে তোমার সঙ্গে মিলিত হতে চাই। ক্রিপল ক্রিফ-এ, যেখানে সেদিন গিয়েছিলাম সেখানে চলে এস। খুব একটা জরুরী ও মজার কথা তোমাকে শোনাব।

—সিওর হানি, খুশী খুশী কণ্ঠে রেমণ্ড ব্লুম বলে, কটার সময় বলো?

—সাড়ে আটটা, কাঁটায় কাঁটায়।

মনে ক্রোধের প্রলয়, কিন্তু কণ্ঠস্বর অতি কষ্টে শান্ত কোমল রাখল রীতা। জানোয়ার! স্ত্রী এসেছে অথচ তাতেও পরকীয়া প্রেমের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। রাস্কেল, স্কাউণ্ড্রেল। কি করে মানুষ চিনতে তার এত ভুল হল! হাতের কব্জি আঙুল সব যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার।

কিছুক্ষণ বাদে সে তার নিজের গাড়ি একটা সার্ভিস ষ্টেশনে নিয়ে উদ্দেশ্য-মূলক ভাবে ইঞ্জিনটাকে একটু টিউন করবার জন্য রেখে দিল। সেখানকার একটা গাড়ি ধার নিয়ে সে রওনা হয়ে গেল তার গন্তব্যস্থলে। যাবার আগে বেশ বড় একটা সুটকেশ নিজের গাড়ির ট্রাঙ্ক থেকে এ গাড়ির ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে নিতে ভুলল না।

শহরের বাইরে যেতে রাত্রি ঘনিয়ে এল। একটু থেমে সুটকেস থেকে পোষাক ও মুখোস বের করে পরে নিল রীতা। হাতের কাছে রয়েছে বীভৎস দর্শন '৪৫ পিস্তলটা।

ঠিক. মিঃ ব্লুম অপেক্ষা করছে নির্দিষ্ট স্থানে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরলো রীতা। ব্লুমেব গাড়ির পাশে গিয়ে আচমকা ব্রেক কসে নিজগাড়ি থামালো।

চমকে তাকাতেই ব্লুমের চোখ আতংকে ছানাবড়া হয়ে গেল। অদ্ভুত পোষাক পরা একজন নারী তার বুকের কাছে '৪৫ পিস্তল ভয়াবহ ভাবে নিশানা করেছে।

—বেরিয়ে এস!! এই মুহূর্তে নেমে এসে এ গাড়িতে ওঠ নয়ত গুলি করব।

কিং কর্তব্য বিমূঢ় ব্লুম নিজ গাড়ি থেকে নামতে রীতা প্রবল এক ধাক্কায় তাকে নিজের গাড়িতে প্রায় শুইয়ে ফেলে দিল। তারপর "ঐ ভাবেই পড়ে থাকো"—বলে বিদ্যুৎবেগে গাড়ি চালিয়ে দিল। মাথা তোলবার চেষ্টা করতে রীতা তার হাই হিল জুতো সহ এক লাথিতে ব্লুমকে ফের শুইয়ে দিল।

এরপর গভীব বন এলাকায় গাড়ি ঢুকলো। সেখানে পূর্বাহ্নেই অপেক্ষা করছে আরও দুটি গাড়ি ও গাড়ি ভর্তি মুখোসধারী মেয়ে।

নজন মেয়ে এগিয়ে এল রীতার গাড়ির কাছে।

গাড়ি থামিয়ে রীতা ভয়ে শায়িত আধমরা ব্লুমের দিকে চেয়ে বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ করে, দাও, এটাকে বেঁধে টাঙ্গিয়ে ফেল।

কালবিলম্ব না করে, সামরিক তৎপরতায় ভীত সন্ত্রস্থ হতভাগ্য ব্লুমকে ওরা দড়ি দিয়ে বাঁধবার উপক্রম করল। এবার ব্লুম মরণপণে ওদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে চীৎকার করে বলে উঠলো, আমায় ছেড়ে দাও, আমায় যেতে দাও প্লিজ।

গাড়ির হেড লাইটের আলোতে বনভূমি যেন বধ্যভূমির আকার ধারণ করেছে। ঝটাপটি করলে কি হবে মেয়েরাও খুবই শক্তিশালী। তারা ব্লুমকে কিল চড় ঘুসি মেরে কাবু করে ফেললো। কাঁটাওয়ালা হাইহিল জুতোর লাথি খেয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল ব্লুম।

—আমায় ছেড়ে দাও, ঈশ্বরের দোহাই ছেড়ে দাও।

নিমেষে হাতদুটো বেঁধে ফেলে গাছের ডালের ওপর দিয়ে দড়িটাকে ছুঁড়ে দেওয়া হল তারপর বুড়ো আঙুল ছুঁই ছুঁই অবস্থায় ব্লুমকে যথারীতি ঝুলিয়ে দেওয়া হল।

কালান্তক চাবুক হাতে রীতা স্বয়ং এগিয়ে গেল ব্লুমের পিঠের জামা ছিঁড়ে কশাঘাত করবার উদ্দেশ্যে।

তখনই ব্যাপারটা ঘটলো। একটা গাছের ডালে লেগে মুখের মুখোসটা খুলে পড়ে গেল মাটিতে।

ব্লুমের মুখ হাঁ হয়ে গেল অকল্পনীয় বিস্ময়ে, তুমি !!

—হ্যাঁ আমি, রাগে কাঁপতে কাঁপতে রীতা বলে ওঠে, বদমাইস চরিত্রহীন কোথাকার। একজন স্ত্রী থাকতে ফের কিনা···

রীতার মুষ্টিবদ্ধ হাত ও তার এরকম ভয়ংকর মূর্তি তার সঙ্গের মেয়েরাও কখনো দেখেনি। তার চোখে ফুটে উঠেছে অসহ্য খুনে ক্রোধ।

—না না, ফ্যাকাশে মুখে ব্লুম বলে, আমি জানতাম না যে ও আসবে।

—বদমাইশ ফের মিছে কথা !

রীতা কিন্তু এরপর আঘাত করল না। সহসা সে যেন কেমন বিহ্বল হয়ে গেল। তার হাত পা মুখ হয়ে উঠল রক্তশূন্য। সারা দেহ কাঁপতে লাগলো থরথরিয়ে।

তারপর বাঘিনীর মত এগিয়ে গিয়ে ঝুলন্ত দড়িটা খুলে দিল। ধুপ শব্দে ব্লুমের দেহ মাটিতে এসে পড়ল। পরমুহূর্তে একটা ফাঁস লাগিয়ে তা পরিয়ে

দিল ব্লুমের গলায়, একটানে তা টাইট করে দিয়ে দড়ির অপর প্রান্ত ডালের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল।

ব্যাপার বুঝতে পেরে ব্লুম চীৎকার করে কেঁদে উঠে কাকুতি শুরু করল।

—দড়িটাকে টান দাও। বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ দিল রীতা।

প্রথমটা সামান্য ইতস্তত করল মেয়েরা কিন্তু পরমুহূর্তে নেত্রীর আমোঘ আদেশ পালনে ব্রতী হয়ে সজোরে দড়ি ধরে টান দিল। চোখের পলকে ব্লুমের ফাঁসীলাগা দেহটা শূন্যে উঠে গেল যেন কোন দানবের হাতের আকর্ষণে।

গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, পা দুটোর শূন্যে আস্ফালন, সব মিলিয়ে একটা অন্তিম আকুতি ফুটে উঠল ব্লুমের দেহে। মেয়েরা দড়ি আলগা করছিল কিন্তু রীতা ছুটে এসে নিজ হাতে দড়ি টেনে রাখলো।

মানুষটার ঝটপটানি ক্রমে ক্রমে কমে আসতে লাগলো। এবং একসময় সহসা ব্লুমের দেহটা নিশ্চল হয়ে দুলতে লাগলো।

দড়ি ছেড়ে দিতে ব্লুমের প্রাণহীন দেহটা মেঝেতে পড়ে গেল ধপাস শব্দে। সাংঘাতিক ট্রাজেডি ঘটে গেল। এতটা বুঝি ভাবেনি কেউ।

সহসা আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল রীতা। হাঁটু গেড়ে মৃতদেহের পাশে বসে পড়ে তার কালো চুলে আঙুল দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলে, রে, রে, বিশ্বাস করো আমি এটা চাইনি। উঃ ও মরে গেল! হায় হায়।

অবশ্যম্ভাবী যা হবার হয়ে গেছে। এখন উপায়। এতো দণ্ডদান নয়। এযে নরহত্যা। মেয়েরা মুখোশ খুলে ত্রাস মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মৃতদেহের প্রতি। ওরা কিনা একটা মানুষ খুন করে ফেললো! হায় হায় কি সর্বনাশ আমরা করলাম।

অবশেষে রীতা উঠে দাঁড়ালো। পাগলিনী প্রায় চেহারা—ও মরে গেছে? আমরাই মেরে ফেলেছি। তোমরা এ সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলবেনা। এখন শুধু প্রার্থনা করো। মৃতদেহটা যে ভাবেই হোক বেপাত্তা করে ফেলতে হবে এবার।

এখানেই ভিজিলেন্টিকদের কাজের ইতি হয়ে গেল। ব্লুমের মৃতদেহ ওরা নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে? সবাই জানে ব্লুম কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

কয় মাস বাদে রীতাও তার রেষ্টুরেন্ট বিক্রী করে দিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেল। কোথায় গেল কেউ জানে না।

নোবেল—লরিয়েট বিজ্ঞানী ও এক বন্দী ডাক্তার

আমি একজন বিদেশী ডাক্তার, তথাকথিত 'গুপ্তচর' বৃত্তির অপরাধে বন্দী আর সেই আমার অপারেশন ছুরির অধীনে এলেন কিনা রাশিয়ার স্পেস্ রেস-কে যে মস্তিষ্কটি সর্বাধিক এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ফিজিসেস্ট লেভ ল্যাণ্ডাউ। আমার অপারেশন নাইফ-এর কাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুভব করলাম সকলের সতর্ক দৃষ্টি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর আমি এও নিশ্চিতরূপেই জানি যে যদি এই মহান বিজ্ঞানী মারা যান, তাহলে··· তাহলে আমারও মৃত্যুরেব ন সংশয়।

এই কথাগুলো হল ডাঃ লুই ডিলেটুর-এর। তাঁর জীবনে ঘটা এই রোমাঞ্চকর কাহিনীটি তাঁরই জবানীতে শোনা যাক।

*　　　*　　　*

এম. ভি. ডি এজেণ্টরা আমাদের নিয়ে গেল মস্কোর ন্যাশনাল হোটেল-এর কনফারেন্স রুম-এ। এ হোটেলের ১১৫ নম্বর ঘরে একদা স্বয়ং লেনিন এসে বাস করে গিয়েছেন। প্রায় ষাটজন নরনারী একজন বক্তার-টেবিলের মুখোমুখি হয়ে বেতের চেয়ারে বসে পড়ল। টেবিলের ওপর একটি ফিল্ম প্রজেক্টর রয়েছে আর বক্তার পেছনে টাঙানো একটি স্ক্রীন।

সবাই বসলে পর এম. ভি. ডি. এজেণ্টরা দরজা আগলে প্রহরায় দাঁড়াল।

দীর্ঘাঙ্গ টাক মাথা একব্যক্তি বক্তার টেবিল-এর কাছে গেলেন। তিনি হলেন মস্কোর প্রখ্যাত মাইটি শোরা হাসপাতালের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ডাঃ ভিমিট্রি অসট্রভ।

তিনি বললেন, আপনাদের এখানে এক বিশেষ গুরুতর ব্যাপারের জন্য সমবেত করা হয়েছে। কদিন আগে একটি অত্যন্ত ট্র্যাজিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। লেভ ল্যাণ্ডাউ মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত একজন শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে তার ড্রাইভার বেসামাল হয়ে একটা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগায়। পেছনে বসা প্রফেসর ল্যাণ্ডাউ সে দুর্ঘটনায় সাংঘাতিক রূপে আহত হন। তাঁর মৃত্যু হওয়া মানে আপনারা জানেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের অপূরনীয় ক্ষতি। আমরা কোন মতেই ল্যাণ্ডাউকে হারাতে চাই না। আপনাদের ওকে বাঁচিয়ে তুলতে স্ব স্ব-সাধ্যমত চেষ্টা করে যেতে হবে। যদি মৃত্যুর হাত থেকেও হয় তবু ওঁকে

বাঁচিয়ে তুলতেই হবে। মরে গেলেও বাঁচাতে হবে। এটা আদৌ কোন অতিশয়োক্তি নয়, কমরেডগণ।

লেভ্ ল্যাণ্ডাউ। ৫৪ বৎসর অসাধারণ ব্রিলিয়ান্ট ফিজিসিস্ট বিজ্ঞানী যাঁর সক্রিয় সাহায্যে রাশিয়ার প্রথম স্পুটনিক মহাকাশে প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়। চাঁদে প্রথম মানুষ পাঠাবার প্রতিযোগীতায় যাঁর সক্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে, কোন মতেই সাফল্য সম্ভবপর নয়, সেই মানুষ কিনা আজ মৃত্যু পথ যাত্রী।

এই ভদ্র, স্বপ্নালু দৃষ্টি সম্পন্ন মহান বৈজ্ঞানিকের সুবিধার্থে সোভিয়েট সরকার ৫/৬ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ল্যাবরেটরী নির্মাণ করে দিয়েছেন। বারো বছর ধরে মস্কোর ইনষ্টিটিউট অফ ফিজিকাল প্রবলেম-এর নেতৃত্ব করে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন তার পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য। বিজ্ঞান জগতে তখন থেকেই জল্পনা-কল্পনা কথাবার্তা শুরু হয়ে গিয়েছিল যে তিনিই ১৯৬২-তে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হবেন। লিকুইড হোলিয়াম-এর সম্পূর্ণ জিরো টেম্পারেচার-এ আচার আচরণ বিষয়ক আঙ্কিক ব্যাখ্যাই উক্ত পুরস্কার বিজয়ের কারণ হবে, অতএব এই বিজ্ঞানীর মৃত্যু মানে মহাকাশ প্রতিযোগীতায় দশ বছর পিছিয়ে যাওয়া।

—অ্যাটেনসন প্লিজ! বক্তার কথার সঙ্গে সঙ্গে কনফারেন্স রুম-এর আলো নিভে গেল এবং এক রঙিন ছবি প্রতিফলিত হল পেছনের পর্দায়।

ছবিতে দেখা গেল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শুধু একটি মুখ। বেদনা পীড়িত দুটি চোখ। ছবিতে একজন ডাক্তার হাসপাতাল বেডে শোয়ানো পেশেণ্ট-এর গায়ের চাদর সরিয়ে দিল।

অন্ধকার ঘরে ডাঃ অসট্রভ-এর কাটা কাটা কথাগুলো যেন মেশিনগান-এর গুলির মত শ্রুত হতে থাকলো।

—এবারে আঘাত সমূহের বিবরণ শুনুন ফ্র্যাকচারড স্কাল· ব্রেন কনটুশান, নিদারুণ শক·· চূর্ণ বিচূর্ণ নয়টি পাঁজর···পানচারেড চেষ্ট পেলভিক ফ্র্যাকচার ···রাপচার অফ ব্লাডার· বাঁ বাহু প্যারালাইজড, ডান বাহুর আংশিক পক্ষাঘাত, দুপা সম্পূর্ণ অসাড়·· নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এবং সার্কুলেশন ফেল করছে। পর্দায় দৃশ্যান্তর হল। একজন মেডিকাল টেকনিশিয়ান ল্যাণ্ডাউর দিকে ঝুকে পড়ে রোগীর পায়ের ছোট্ট একটা ব্যাণ্ডেজের ওপর ইলেকট্রোডস্ স্পর্শ করালো। কিন্তু কোন রিঅ্যাকসন দৃষ্ট হল না।

ডাঃ অস্ট্রভের কণ্ঠ পুনরায় ধ্বনিত হল: প্রফেসর ল্যাণ্ডাউ কালা-বোবা এবং অন্ধ হয়ে গেছেন·· কোন রিফ্লেক্স পরিদৃষ্ট হচ্ছে না, ব্যথা বা উত্তেজনায়

কোন রিঅ্যাকসন হচ্ছে না। পাঁচদিন পূর্বে দুর্ঘটনা হওয়ার পর থেকে আমরা ওঁকে বাঁচাবার জন্য কি কি প্রচেষ্টা করেছি পর্দায় ভালভাবে তা লক্ষ্য করুণ।

পাঁ-চ দিন! বলেকি! তার মানে ১৯৬২-র ৭ই জানুয়ারী। ডাঃ ল্যাণ্ডাউ যে এখনো জীবিত রয়েছেন এটাই তো এক অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। নিউরো সার্জন হিসেবে আমার যাবতীয় প্রফেসনে ইণ্টারেষ্ট জাগ্রত হল এবার। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ঝুঁকে পড়ে পর্দার দিকে তাকালাম।

—ইনি হলেন লেনিন পলিক্লিনিকের ডাঃ মেলানেক. ডঃ অসট্রভর কণ্ঠ বলে গেল, তিনি এখন পেশেণ্টের মাথা ওপন করে তাতে কেমিক্যাল ইউরিয়া দিচ্ছেন প্রেশার এবং ফোলা কমিয়ে আনবার জন্য। প্রফেসারকে অক্সিজেন দেবার জন্য আমরা পাম্প অক্সিজেনেটর প্রয়োগ করে চলেছি দিবারাত্র নিরবচ্ছিন্ন ভাবে খাওয়ানোর ব্যাপার হয়েছে এক নিদারুণ সমস্যা। শুধু মাত্র আধা তরল খাদ্য নাক দিয়ে প্রবেশ করানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

—এখন ভালভাবে লক্ষ্য করুণ পর্দার দিকে। তাহলে বুঝতে পারবেন ওঁকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কি দুর্লভ বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদের। ওঁর—টেম্পারেচার ১০৭° পর্যন্ত ওঠে এবং ১০৪° এর নিচে বলতে গেলে নামেই না। স্পেশ্যাল ড্রাগ ও অ্যাণ্টিবায়োটিকেও কোন কাজ হচ্ছে না। পরের দৃশ্যে আপনারা দেখতে পাবেন সত্যি সত্যিই মৃত অবস্থা থেকে ওকে কিভাবে ফিরিয়ে আনা হল।

পর্দায় ডাক্তার রোগীর নাড়ি দেখলো। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখের ছিদ্রের সামনে একটা আয়না ধরলো। অসট্রেভ এর কণ্ঠ শোনা গেল, ইনি এখন ক্লিনিক্যালি মৃত। বহু রবার টিউব ও চকচকে ক্রোম পাইপ সমন্বিত একটি মেসিনকে ঠেলে নিয়ে আসা হল ঘরে। ল্যাণ্ডাউর বাম বাহুতে আর্টারীতে রক্ত পাম্প করে দেওয়া হতে লাগলো। জনৈকা মেয়ে ডাক্তার রোগীর পায়ে স্টিমুল্যাণ্ট ইনজেকসন করে দিল। অন্যান্য ডাক্তাররা ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো "মৃত" পেশেণ্টকে। প্রতীক্ষা···প্রতীক্ষা···অধীর প্রতীক্ষা। সিনেমার দর্শক আমরাও রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। রক্ত পাম্প করা চলতে লাগলো নিরবচ্ছিন্ন ভাবে।

উত্তেজনায় আমার গলাও শুকিয়ে কাঠ। তিন মিনিট···চার···পাঁচ—রক্ত পাম্প চলছে···পর্দা এবং হোটেল রুমের দর্শক সবাই চরম উৎকণ্ঠিত। সাড়ে পাঁচ মিনিট···ছয়। ল্যাণ্ডাউ-র খাটের পাশে ঝুলে থাকা বাঁ হাত-টা সামান্য একটু নড়ে উঠলো।

ক্যামেরা আঙুলের প্রতি জুম হয়ে ক্লোজআপ হল। মরা কীট-এর মত ফ্যাকাশে-শীর্ণ এবং আর্টিস্টিক সেই আঙুলগুলো। সাত মিনিট···প্রায় বার মিনিট স্তব্ধ থাকার পর দেহের আঙুলগুলো নড়ে উঠলো। সন্দেহ নেই ল্যাণ্ডাউ পুনরায় প্রাণ ফিরে পেলেন।

ক্ল্যাম্প খুলে মেশিনটাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। সিনেমা শেষ। ঘরের আলো ফের জ্বলে উঠলো।

অসট্রভ বলে যাচ্ছেন, এ হল বলতে গেলে ওকে পুরোপুরি কবর থেকে ফিরিয়ে আনবার অন্যতম একটি দৃষ্টান্ত। ফিরিয়ে আনা না বলে মৃত্যুর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা বলাই বোধ করি যথোপযুক্ত হবে। আরও কয়েকবার তাঁকে এমনি ভাবে প্রাণ দান করা হয়েছে। এই তো দুদিন পূর্বে নিউরো-প্যাথলজিস্ট ডাক্তার ওঁকে বাঁচিয়ে তুললেন যখন তিনি যাবতীয় ক্লিনিকাল টেস্ট-এ মৃত বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। জনৈক ড্যানিস ফিজিসিস্ট স্পেশ্যাল ওষুধ প্লেন মারফত আনিয়ে ওঁকে তৃতীয় বারের মত বাঁচিয়ে তোলেন ড্রাগ থেরাপি করে ওঁকে ফের চেতনায় ফিরিয়ে আনার মধ্যেও প্রতি মুহূর্তে এই আশংকা দেখা দিচ্ছে যে ওঁকে হয়ত চিরদিনের মতই হারাতে হবে। তবে যে করেই হোক আপনাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ওঁকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে।

আপনারা ভালভাবেই জানেন ল্যাণ্ডাউ আমাদের দেশের পক্ষে কতখানি। তাই আপনাদের এখানে এনে জমায়েত করা হয়েছে। যান নিজ নিজ ঘরে গিয়ে ব্রেকফাষ্ট সেরে ঠিক ৮-৪৫-এ এ হল ঘরে ফিরে আসুন। সে সময় আপনাদের যথাযথ অ্যাসাইনমেণ্ট ঠিক করে দেবেন ডাঃ সি মিয়ন ওব্রিজট্। তিনতলাস্থিত আমার হোটেল রুম-এ আমার জন্যে একজন গাট্টাগোট্টা অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টি সম্পন্ন দারুণ গম্ভীর লোক অপেক্ষা করছিলেন। তাকে দেখে ভয়ে মনটা ধক্ করে উঠলো। এ ধরনের ভয়ংকর লোকেদের সংশ্রবে বহুবারই ইতিপূর্বে আমায় আসতে হয়েছে। //

ইনি আরেকজন এম. ভি. ডি এজেণ্ট। কোন প্রকার গৌরচন্দ্রিকা না করে বজ্রসম কণ্ঠে তিনি সরাসরি বক্তব্যে এসে গেলেন, শুনুন ডাঃ ডিলেটর যদি আমরা আমাদের নিজস্ব ধারায় চলতাম তাহলে এখনও আপনি লৌহগরাদের অভ্যন্তরেই থাকতেন তবে মিনিস্টার অফ হেলথ জানালেন যে বৈজ্ঞানিক ল্যাণ্ডাউর অপারেশন-এর ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আপনাকে প্রয়োজন। অতএব মস্কো থেকে পালাবার চেষ্টা হবে আপনার পক্ষে চরম মূঢ়তা। তাছাড়া আপনার প্রয়োজনীয় পেপার্সওতো নেই। সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও হয়ে যাবেন

আপনি। এই হোটেলে ঐ ক্লিনিকে এবং সেই হাসপাতালে সর্বত্রই লোক রয়েছে আমাদের। যারা অহোরাত্র আপনার প্রতি নজর রেখে যাবার জন্য নির্দিষ্ট। যথাজ্ঞা কাজ করে যান, নিখুঁতভাবে, আন্তরিকতার সঙ্গে কোন বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ব্যস এইটুকুই নির্দেশ রইল এখনকার মত। তিন বছরের নিপীড়িত দেহ মন সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। বলে উঠলাম, আমি যদি আপনাদের সঙ্গে সহযোগীতা করি তাহলে আমার কি লাভ হবে শুনি? আমি আর জেলে ফিরে যেতে চাই না। আমি সম্পূর্ণ নির্দোশ।

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটা উঠে দাঁড়ালো, ও সব আমার এক্তিয়ারের বাইরে। আমার ওপর অর্ডার আছে আপনার প্রতি গোপন নজর রাখবার তবে একথা জেনে রাখা ভাল, সহযোগীতা করলে তার ফল ভালই হবে। প্রফেসার ল্যাণ্ডাউ-র জীবন রক্ষা পেলে তার পুরস্কার অবশ্যই পাবেন।

বলে সে গট গট করে বেরিয়ে গেল। আর যদি প্রফেসর মারা যায়? আমি গালে হাত দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম তার পরিনাম। সহসা প্যারিসে থাকা আমার স্ত্রী জারমেইন ও আমাদের ছোট্ট মেয়ে লিসেত্তির মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমার প্যারিসে গৃহ আমার সুন্দর সংসার। যদি ল্যাণ্ডাউ মারা যায়, তাহলে আমি কি আর আমার পরিবারদের দেখতে পাব এ জীবনে?

আমি ১৯৫৯-তে রাশিয়া এসেছিলাম মস্কোর এক সায়ন্টিফিক কনফারেন্সে যোগ দিতে এবং তিনমাসের জন্য এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম অনুযায়ী সেকেণ্ড মস্কো হাসপাতালে অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে।

মেয়ের অসুখ থাকায় স্ত্রী আসতে পারেনি সঙ্গে। না এসে খুব বেঁচে গেছে বলবো।

মস্কোতে আমার বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডাঃ মিখাইল জুরকেল। এক কালে ইনি ফরাসীদেশে আমার স্কুলের সহপাঠি ছিলেন। ওর অ্যাপার্টমেন্টে আমি বহুবার চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছি। হাস্যরসিক মিখাইল ও তার সদা হাস্যময়ী স্ত্রী লুড মনাকে আমার খুব ভাল লাগত। ওদের আটবছরের ছেলেটিও আমার প্রিয় ছিল। আমি জানতাম না যে মিখাইল কম্যুনিষ্ট সিস্টেমের দারুণ শত্রু ছিল। এবং সে যে এক বিদেশী শক্তি অর্থাৎ তুরস্ককে গোপন সংবাদাদি প্রদান করে গুপ্তচর বৃত্তি করতো তাও ছিল আমার কল্পনাতীত।

মিখাইল ১৯৫৯-র মে মাসে গ্রেপ্তার হয়ে সিক্রেট কোর্টে বিচারাধীন হল।

ওর ছোট্ট ছেলে সহজাত সরলতায় মামলার সময় বলে দিল যে আমি ছিলাম ওদের বাড়িতে একজন নিয়মিত অতিথি। একদিন একরাতে ডিনারেও আমি যোগ দিয়েছিলাম যে আসরে উপস্থিত ছিল ইসমাইল পনণ্ নামক একজন তুরস্কের ব্যবসায়ী।

পনণ্ সোভিয়েতদের কাছে গুপ্তচররূপে চিহ্নিত হয়ে গেল। তার ত্রবছর জেল ও জেলান্তে রাশিয়া থেকে চিরতরে বহিষ্কার হয়ে সে পার পেয়ে গেল। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মিখাইলের মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল। আর আমি? যে প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ নিরপরাধ নিরীহ নির্দোষ, সেই আমাকে সহযোগীতার অভিযোগে দেওয়া হল ১০ বছর কারাদণ্ড। লেনিনগ্রাদের পিটার অ্যাণ্ড পল জেলে বন্দী থাকতে হবে। সেটা তিন বছর পূর্বের ঘটনা।

সেদিন রাত দুটোয়, অর্থাৎ ১৯৬২-র ১২ই জানুয়ারী শেষ রাতে একজন এম. ভি. ডি এজেন্ট এসে প্রবেশ করলো আমার সেল-এ। আমায় টেনে তুলে পোষাক পরে নিতে অর্ডার করলো। প্রথমে আমার অকল্পনীয় ভয় এসে গিয়েছিল মনে। আমি ইতিপূর্বে দেখেছি মাঝরাতে জেলের কুঠরী থেকে অনেক বন্দীদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর তারা ফিরে আসেনি! কিন্তু আমার ভয় ক্রমে বিহ্বলতায় রূপান্তরিত হল যখন দেখলাম একটা কালো ব্যাগ নিয়ে এসেছে উক্ত এজেন্ট। যেটা আমারই ডাক্তারী কিট-ব্যাগ। যদি আমায় টর্চার করত বা মেরে ফেলতো তাহলে ওরা এ ব্যাগটা আনত না বোধ করি।

আমায় কোন কারণ দর্শানো হল না। আমায় ধরে নিয়ে রাস্তায় অপেক্ষমান পোবেডা গাড়ীতে তুললো। আমাকে নিয়ে গেল লেনিনগ্রাদ এয়ার পোর্টে। সেখানে এরোফ্লোট-জেট বিমানটি বুঝি আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল রানওয়েতে। আমি ওঠবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটা আকাশে পাড়ি দিল, আরও চারজন যাত্রী ছিল সে প্লেনে। দুজনকে আমি চিনতে পারলাম তারা অবশ্য স্বভাবতই আমার পরিচয় অগ্রাহ্য করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

সেই দুজনের একজন হলেন লেনিনগ্রাদ সামরিক হাসপাতালের প্রফেসার ইলিয়া করনেভ, যিনি স্ট্যালিনগ্রাদ অবরোধের সময়ে সৈনিকদের প্রায় ছিন্ন হয়ে যাওয়া হাত পা পুনরায় জুড়ে দিয়ে খুব প্রখ্যাত হয়েছেন।

অপরজন হল ডাঃ লিডোভ বেরোনভ নাম্নী মোটাসোটা পুরুষালি পোষাকপরা এক বাজে মনোবৃত্তির মেয়ে ডাক্তার। মনটা যেমন তার বাজে, তেমনি পেশাগত ভাবেও সে একজন হাতুড়ে। সে হল হেমাটোলজিস্ট (রক্ত বিশারদ) কিন্তু

রাজনীতির প্যাঁচ পয়জারের প্রতিই তার যেন বেশী অনুরক্তি। কতকগুলো উদ্ভট টোটকা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী সে।

মস্কো এয়ার পোর্ট থেকে আমাদের একটা বাস এ করে নিয়ে যাওয়া হল ন্যাশনাল হোটেলে। অপরাপর প্লেন থেকে নামা বহু মানুষ একই বাসে এখানে এল। অধিকাংশ ডাক্তার এবং এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। একজনকে চিনতে পারলাম তিনি হলেন ব্লাড ভেসল স্টিচিং মেশিন উদ্ভাবক ডাঃ আইভান পাইজিকেভ।

তারপর কনফারেন্স হলো সেখানেই প্রকাশিত হল কেন আমাদের এখানে আনা হয়েছে।

ফ্যাক্টরী ওয়ার্কারদের বাসস্থান অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত হাসপাতাল নং ৫০। দুর্ঘটনা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসার ল্যাণ্ডাউকে তড়িঘড়ি এনে তোলা হয়েছিল ওই ছোট হাসপাতালটিতে।

আমায় সেখানে নিয়ে যাওয়া হল একটি এম. ভি. ডি. দের গাড়ি করে। আমার সঙ্গে গেলেন ডাঃ ফেওডোর গান্জ। ইনি মৃতদেহ থেকে জীবিত মানুষের শরীরে রক্তপ্রদান করবার ব্যাপারে সর্বপ্রথম পারদর্শিতা দেখান। এর মতে জীবিত রক্তদাতার চেয়ে ছয় থেকে আটগুণ বেশী রক্ত পাওয়া যায় মৃতদেহ থেকে। সদ্য মৃতদেহ থেকে চামড়া কেটে নিয়ে জীবিত মানুষের মুখে তা গ্র্যাফটিং করেও নাম কিনেছেন ইনি।

হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম সরকারী নির্দেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন একাধিক স্পেশালিষ্ট, টিচার, সার্জন, ফিজিওথেরাপিষ্ট, অর্থপেডিষ্ট, নার্সিং একস্পার্ট, ডারমাটোলজিস্ট এবং হেমাটোলজিস্ট।

ওখানে পরিচিত হলাম ডাঃ ডেভিড লুপোর সঙ্গে। চেকোশ্লোভাকিয়ার এই লাজুক ভদ্রলোক সসঙ্কোচে জানালেন তিনি হলেন 'ব্লাড-ষ্টিকস'-এর উদ্ভাবক, সঙ্গেকার আইস-বকসে করে শুকনো মানবিক রক্তে নির্মিত ষ্টিকস নিয়ে এসেছেন।

মস্কোর সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ইনষ্টিটিউট থেকে এসেছে ডাঃ ইগর সেমেন্স। সঙ্গে তার সার্জিক্যাল ক্যামেরা। উক্ত ক্যামেরার সাহায্যে তিনি দেহাভ্যন্তরের রঙিন ফটো নিতে সক্ষম।

সমবেত ডাক্তারদের দলপতি, ডাঃ সেমেয়ণ ওবরাজ্‌ট্‌ বললেন, ডাঃ ডিলিটুর আপনি ষ্ট্যাণ্ড-বাই বেসিসে থাকবেন।

কাল ডঃ কুশকোভো অপারেশন করবেন। আপনি তাঁকে অ্যাসিষ্ট করবেন।

কুশকোভোর চেয়ে ভাল সার্জন হয় না।

আমি সম্মতিতে মাথা নাড়লাম। ঠিকই সন্দেহাতীতভাবে কুশকোভো এ ব্যাপারে মাষ্টার। ব্রিলিয়াণ্ট নিওরো সার্জন তিনি। পশ্চিমী দেশসমূহের ডাক্তারদেব সঙ্গে সখ্যতা রেখে চলেন। স্টালিনের মৃত্যুর কিছু আগে তিন-বছবের জন্য রাজনৈতিক কারণে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় এলে তিনি এই ডাক্তাবকে পুনরায় তার স্বমহিমায় এনে বসান।

সেদিন রাত্তিরে অভাবিতভাবে আমার ন্যাশনাল হোটেল রুমে এসে উপস্থিত হলেন স্বয়ং ওব্রাজট। রাত তখন নটা। আমি যখন দরজা খুলে দিলাম তখন চেয়ে দেখি সেই ডাক্তার মহিলা তাঁর ঘরের দরজা খুলে আমাদের লক্ষ্য করছে। আমি তার মুখের ওপরই দরজা বন্ধ করে দিলাম।

আমি অনুসন্ধিৎসু নয়নে চাইতে ডাঃ ওবরাজট বেশ নার্ভাসভাবেই বলে উঠলেন, ডাঃ ভিলেটুর, এদিকে আমাদের প্ল্যান একটু পালটে ফেলতে হয়েছে। কাল সকালে প্রফেসর ল্যাণ্ডাউকে আপনিই অপারেশন করবেন।

—কেন? ডাঃ কুশকোভোর কি হল?

তিনি চারদিকে তাকিয়ে কোন গুপ্ত মাইক্রোফোন আছে কিনা তা লক্ষ্য করলেন। এম ভি. ডি-র অসাধ্য কিছু নেই। পরে নিশ্চিত হয়ে বললেন, ডাঃ কুশকোভো দেশত্যাগ করে চলে গেছেন। সীমান্ত পার হয়ে সম্ভবত পোল্যাণ্ডে চলে গেছেন। মনে হয় তিনি পশ্চিম জার্মানী চলে যাবেন। তিনি আপনার খুব প্রশংসা করেছিলেন। প্যারিসে অনবদ্য আপনার কার্যাদির খবরাখবর তিনি রাখতেন। আমার মতে প্রফেসর ল্যাণ্ডাউ-র জীবন এখন আপনার সুদক্ষ হাতের উপরই নির্ভর করছে…।

আমি নিরুত্তরে তাকিয়ে রইলাম শুধু। পরদিন সকাল ৭-৩০। আমি গিয়ে অপারেশন রুমে প্রবেশ করলাম। সেখানে সাদা অ্যাপ্রন পরা প্রচুর নরনারী প্রতীক্ষারত ছিল। আমি ঘরে ঢুকতে তাদের গুঞ্জন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। সার্জিকাল মুখোশের ফাঁকে তাদের দৃষ্টিগুলি একযোগে আমার প্রতি তীক্ষ্ণতর হয়ে নিক্ষিপ্ত হল।

আমি একে বিদেশী, তার উপর কিনা এম. ভি. ডি-র প্রিজনার, আর অজ্ঞাত পরিচয় বটে। সেই আমাকে কিনা মহা মহা ভি. আই. পি. ল্যাণ্ডাউ-র অপারেশনের ভার দেওয়া হয়েছে। নিদারুণ একটা শংকাশিহর দায়িত্ব। আমার হাঁটু কাঁপতে লাগলো। অনেক কষ্টে নিজেকে ফের নর্মাল করে তুললাম। এ টেনসনের বুঝি তুলনা নেই।

এই দলে দাঁড়িয়েছিল সেই তথাকথিত রক্তবিশারদ হাতুড়ে মহিলাটি যাকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না।

আমি ডাঃ ওব্‌রাজটকে দিয়ে তাকে ঘরের বাইরে বার করে দিলাম। প্রথমটা ডাক্তার রাজী হন নি কেননা মহিলাটির ওপর মহলে যথেষ্ট হাত আছে। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। আমার কথা রাখতে বাধ্য হল।

মহিলা ডাক্তারটি তীব্র ঘৃণিত দৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুযোগ পেলে সে আমাকে ছাড়বে না এ রকম ভাব। আমি হাতুড়ে নিয়ে কাজ করব না। এ ধরনের একটা সাংঘাতিক অপারেশনে ওর মত লোকের সাহায্যকে বিশ্বাস করা যায় না কোন মতেই।

ওটি-র দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

প্রফেসর ল্যাণ্ডাউ-র জটিল অপারেশনের জন্য আমি প্রস্তুত হলাম। যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও অনেক খারাপ দৈহিক অবস্থা দেখলাম প্রফেসরের। বলতে গেলে তিনি বর্তমানে একটি সব্জি বা ভেজিটেবল স্বরূপ। তিনি কথা বলতে পারেন না। সম্পূর্ণ অন্ধ, একেবারে কালা···কোন ইন্দ্রিয়ই বুঝি কাজ করছে না তাঁর।

উপুড় করে তাঁকে শোয়ানো হয়েছে অপারেশন টেবিলের ওপর। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র রবার টায়ারের দ্বারা এসেছে। এ যন্ত্রকে আমি পায়ের সাহায্যে চালাব। তিনজন ডাক্তার আমায় সহায়তা করবে। অপারেশন টেবিলের ডাইনে বাঁয়ে বিভিন্ন ছুরি কাঁচি যন্ত্রপাতি নিপুণভাবে সাজানো রয়েছে।

একজন সহকারী এক সিরিঞ্জভর্তি লোকাল অ্যানেস্থেটিক আমার হাতে তুলে দিল। অপর একজন মাথার খুলি কামিয়ে তাতে আইওডিন পেইন্ট করে দিল। মাথার পেছন দিকটা প্রথমে কেটে ফেললাম। মনে মনে প্রার্থনা, আমার হাত যেন নিষ্কম্প থাকে, স্টেডি থাকে। আমার প্রতিটি কার্যক্রম শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ করছে আমার চতুর্দিকের মানুষেরা। প্রথমে ইনসিসনে সামান্য পরিমাণ রক্ত বেরিয়ে এল। সহকারী একজন ডাক্তার তুলো দিয়ে সেটা মুছে নিল। আমার বুকের মধ্যে ভয় যেন তোলপাড় করে উঠছে। প্রচণ্ডগতিতে দপ দপ করছে তা।

একজন নার্স আমার হাতে একটি স্কালপেল্ (সার্জিকাল ক্ষুদ্র ছুরি) তুলে দিল। পরবর্তী ইনসিসন করলাম পেরিওস্টেয়াম পর্যন্ত। ব্লাডভেসকে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে যাতে অতিরিক্ত রক্তপাত না হয়। এরপর আমি ড্রিল চাইলাম।

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো দুজন এম. ভি. ডি. এজেন্ট। তাদেরও পোষাক শ্বেতশুভ্রই। ভয়ে আমার হাত কেঁপে গেল কিঞ্চিৎ! সামলে নিলাম এটা কি আমার প্রতি হুঁশিয়ারী? ল্যাণ্ডাউ পুণরায় মৃতাবস্থার কাছাকাছি চলে এসেছে। আমি যদি ওকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি, তাহলে? মনের মত নানান চিন্তা পাক খেতে লাগলো।

মুহূর্তে তা সামলে নিয়ে ফের পেশাগত দায়িত্বে ফিরে এসে মন হয়ে গেল কুলিশ কঠোর শান্ত। আমার হাতের ড্রিল নিঃশব্দে ক্ষুদ্র বৃত্তাকারে মাথার হাড়কে কেটে ফেললো। তিন সেন্টিমিটার দূরে আবার আরেকটি গর্ত করলাম।

"—ফরসেপস্।"

নিজের জরুরী এবং কর্কশকণ্ঠ ধ্বনীত হল। আমি এবার হাড়ের চূর্ণ-বিচূর্ণ অংশগুলিকে তুলে এনে একটা ছোট পাত্রে সঞ্চিত করলাম। উষ্ণ স্যালাইনজলে সেই হাড়ের গর্তগুলো ধুয়ে দিলাম। অ্যাসপিরেসন যন্ত্র দিয়ে তরল পদার্থ সমূহ 'সাক' করে আনলাম। ভিজে কমপ্রেস করলাম খুলির গর্তদ্বয়ে।

এবার সবচেয়ে কঠিন অবস্থা সমুপস্থিত হল। এ অপারেশনে অকৃতকার্য হওয়ার কথা কল্পনায়ও আনতে পারি না। আমার অস্ত্রোপচারকালীন প্রফেসার ল্যাণ্ডাউ-র মৃত্যু হতে পারে না, হতে দেব না। হলে তার পরিণতি আমার পক্ষে হবে বিধ্বংসী।

আমি তারের করাৎ চেয়ে পাঠালাম। খুলি কেটে ব্রেইন উন্মুক্ত করব এখন।

নিজের মনেই নিজ সম্বন্ধে সাবধান বাণী ধ্বনিত হল হুঁশিয়ার। ডিলেটুর স্টেডি হও। স্টেডি। আমি অনুভব করতে পারছি আমার ওপরের ঠোঁট ঘেমে গেছে।

অতি ধীর স্থির অচঞ্চল চিত্তে ও দক্ষ আঙুলে করাত দিয়ে কর্তন কার্য সমাপন করলাম। চকিতে একবার দেওয়ালের ঘড়ির পানে তাকালাম। ১১-৩০ মিঃ তিন ঘণ্টার ওপর অপারেশন করে চলেছি।

মাথার খুলি সরাতে আমার অকস্মাৎ জমে যাওয়া নার্ভহীন আঙুলের সামনে নিরাবদ্ধ ব্রেইন উন্মুক্ত হয়ে পড়লো। আমার ইশারায় একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যাণ্ড বাঁধা একটি ইলেকট্রিক আলো আমার কপালে লাগিয়ে দিল! কড়া অত্যুজ্জল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মেনিংস, ব্রেইনকে আবৃত করা তিনটি মেমব্রেন এবং স্পাইনাল কর্ড।

ডাঃ ডিলেটুর, আমি পাল্‌স্ পাচ্ছিনা।

বজ্রপাতের মত এই লাইনটি কানে আসতে আমার দেহমন ক্ষণিকের জন্য অবশ হয়ে গেল। ল্যাণ্ডাউ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। এই পজিসনে তাঁকে কোন মতেই অক্সিজেন দেওয়া সম্ভব নয়। আর ওকে সরানোও যাবে না এখন।—শক্ মেসিনটা নিয়ে আসুন, দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলাম, পেশেণ্ট-এর ডান পায়ের গোড়ালীতে ইলেকট্রডটা লাগিযে দিন।

তাই হল। এই মেশিনটা এখন কাজ করলে হয়। এর ব্যবহার সম্বন্ধে আমায় বিশদভাবে বলা হয়েছিল। রোজা শালফ নামে একজন সোভিয়েত মহিলা ডাক্তার এটা উদ্ভাবন করেন। এখন রোজা বিচক্ষণতার সঙ্গে এর ডায়েল ঘুরিয়ে দিতে আমি খুব আলতো স্বরে একটা গুনগুন শব্দ শুনতে পেলাম। মেশিন চালু হয়েছে। পেশেণ্টের দেহে কিন্তু কোন প্রকার রি-অ্যাকসন পরিলক্ষিত হল না।

আমি নিজের দুহাতের আঙুল বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে প্রার্থনা করতে থাকলাম। আঙুলগুলো বুঝি লোহার হয়ে গেছে। অনুভূতি নেই।

এম. ভি. ডি. এজেণ্টদের দৃষ্টিতে অভিযোগ মূর্ত হয়ে উঠেছে। কেমন ক্রুদ্ধ ঘোরালো চাউনি তাদের।

হে ঈশ্বর। পরম করুণাময় ঈশ্বর, এতে যেন ফল ফলে। মেশিনট যেন কার্যকরী হয়, ফলবতী হয়।

গুণ গুণ ধ্বনিটা যেন দুবার ফেল করল, ধাক্কা খেল।·· ডাঃ শানফ আরেকটা সুইচ টানলো···আবার গুণ গুণ শব্দ শুরু হয়ে গেল একটানা। অকস্মাৎ দেখলাম লেভ্ ল্যাণ্ডাউ-র ডান কাঁধটা মৃদু কেঁপে কেঁপে উঠলো বারেক।

আবার তাহলে বেঁচে উঠেছেন এই মহামান্য প্রফেসর। ঈশ্বর, ধন্যবাদ তোমাকে।

—ডাঃ ডিলাটুর, আপনি পুনরায় অপারেশন চালিয়ে যেতে পারেন; রোজার শান্ত ও উৎসাহব্যঞ্জক সুমধুর কণ্ঠ যেন কানে সুধাবর্ষণ করলো আমার। ধন্য এই মেয়ে ডাক্তার, ধন্য তার মেসিন।

ব্রেইনের যে অংশটা মানুষের কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে সেখানে কিছুটা জমাট রক্ত চেপে বসে আছে লক্ষ করলাম। সাক্‌সন মেশিনের দ্বারা সে রক্তটাকে বের করে এনে স্থানটা পরিষ্কার করে দিলাম। একই প্রক্রিয়ায় প্রফেসরের চিন্তাধারা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণকারী স্থানগুলোকে রক্তমুক্ত করলাম।

পুনর্বার যখন আমি পেশেণ্টের মাথার খুলিকে যথাযথ স্থানে বসিয়ে সেলাই করছি, তখন মনে হল, দুটো পা আমার যেন দুটো জমে যাওয়া অতি ক্লান্ত স্তম্ভের মত হয়ে গেছে।

ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখলাম, গুড গড্, এখন বেলা ৩-৩০ মিঃ। আমি তাহলে একটানা সাত ঘণ্টা অপারেশন করেছি।

বাহুদ্বয়ও আমার কাঠের মত অসাড় হয়ে গেছে। আঙুলগুলোও সম্পূর্ণ অসাড়। রক্তমাখা অ্যাপ্রণ ও মুখোশ খুলে ফেলবার উদ্দেশ্যে ও. টি. থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

ধোয়া মোছার রুমে আমার জন্যে একজন লোক অপেক্ষা করেছিল। কুলিশ কঠোর নির্দয় হাবভাব। ইনি সেই এম. ভি. ডি. এজেণ্ট যিনি কাল আমার হোটেল রুমে গিয়ে হুশিয়ারী সহ জ্ঞান দিয়েছিলেন। আমাকে ফের সেই পিটার অ্যাত পল দুর্গে নিয়ে যেতে এসেছেন ইনি?

আমি মরণ ক্লান্তি সহ একটা চেয়ারে বসে পড়তে সেই এম. ভি. ডি. ম্যানের গলা কানে এল।

—আপনার ফ্রেঞ্চ পাশপোর্ট ভ্যালিড একৃজিট ভিসার স্ট্যাম্প সহ কাল সকালে আপনার হোটেলের ডেস্ক-এ পৌঁছে দেওয়া হবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে সোভিয়েট ইউনিয়ান ছেড়ে চলে যেতে হবে···।

—আমি মুক্ত। আমি স্বাধীন···

পরদিন সন্ধ্যায় আমি প্যারিস-এ এসে প্লেন থেকে নামলাম। অবশেষে যেন অনন্তকাল পরে, আমার স্ত্রী ও ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে এসে মিলিত হলাম। পশ্চিম ইয়োরোপের কোন পত্র-পত্রিকায় লেভ্ ল্যাণ্ডাউ এবং তাঁর জীবন মরণ সংকটের সংবাদ বা তাঁকে বাঁচাবার আজগুবি প্রচেষ্টা বিষয়ক কোন সংবাদই বের হয়নি।

অতঃপর ১৯৬২-র নভেম্বরে স্টকহলম থেকে সরকারীভাবে ঘোষিত হল যে রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক লেভ্ ল্যাণ্ডাউকে ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

তখনই আমি জানতে পারলাম যে প্রফেসর প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন পুনরায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের পাঠ নিচ্ছেন তিনি এবং হাসপাতালের করিডোরে পঞ্চাশ-ষাট ফিট পর্যন্ত কারো সাহায্য ব্যতিরেকেই ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে

পারছেন। তাঁর বাকশক্তি যদিও একটু বাধো বাধো তাহলেও ফিরে এসেছে। দিনে দুবার দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী ফিজিওথেরাপী নিচ্ছেন তিনি। সোভিয়েত মেডিকাল ম্যানরা আশা করছেন যে ছমাসের মধ্যেই প্রফেসর তার ল্যাবরেটরীতে ফিরে যেতে পারবেন।

আমি আনন্দিত, এই ভেবে যে তাঁকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনবার ব্যাপারে আমারও হাত ছিল।

হিটলার প্রেমিকাঃ ইংরেজ স্পাই

যে কাহিনীটি আজ বলতে বসেছি সেটি বিগত মহাযুদ্ধের বিহ্বল করা রহস্যের একটি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। এক অতি অভিজাত ইংরেজ তনয়া কেন যে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে সহসা গিয়ে এমন একটি মানুষের কণ্ঠলগ্ন হল যে কিনা ব্রিটিশ জাতের পক্ষে তখন সর্বাধিক ঘৃণিত পুরুষ।

"মাথায় বুলেট সহ জনৈকা সুন্দরী রমনী যে কোন ভাষার পক্ষেই চাঞ্চল্যকর সংবাদ"—নিউইয়র্ক টাইমস্-এ হেডিং বের হল সেবার।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে ক'মাস। ব্লিৎসক্রিগ আক্রমণে পোলাণ্ড পর্যুদস্ত হয়েছে। ব্রিটিশ এবং ফরাসীগণ হতভম্ব, হতবল হয়ে ম্যাজিনট লাইনের এপারে বসে কোন সময় জার্মান আক্রমণের প্রতীক্ষায় রয়েছে। এমন সময় প্রতিটি ব্রিটিশ সংবাদপত্রে ছ ইঞ্চি আকারের লাল অক্ষরে হেড লাইন ছাপা হল: হোয়ার ইজ ইউনিটি? ইউনিটি কোথায়? হাউস অব কমন্স, এমন কি হাউস অব লর্ডস-এও একই জাতের ঐক্যের কথা তোলা হয়নি। এখানে ইউনিটি হল একটি সুন্দরী যুবতীর নাম। সোনালী চুল, নীল নয়না, পঁচিশ বছর বয়স্কা এই তরুণীর পুরো নাম ইউনিটি ভ্যালকিরি ফ্রিম্যান মিটফোর্ড। লর্ড রেডেস্‌ডেল-এর কন্যা। এই কন্যাটি সে সময় ইংরেজদের কাছে সবচেয় ঘৃণিত মেয়েরূপে গণ্য হয়ে গিয়েছিল কেননা এই মেয়ে বিগত সাত বছর যাবত দেশের শত্রু হিটলারের "ঘনিষ্ঠতমা বন্ধু" রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। পাঁচমাস যুদ্ধ শুরুর পরও এই মেয়ে জার্মানীতেই রয়েছে তখনও। তবে জোর গুজব যে এই ইউনিটি নাকি সাংঘাতিক আহত অবস্থায় দেশে ফিরছে, মুমূর্ষু হয়ত বা মৃতপ্রায় অবস্থায়।

ডেলী হেরাল্ডে এক সংবাদ বের হল, পাছে হিটলারের কণ্ঠলগ্না কালীন কোন গোপন কথা পরবর্তীকালে ফাঁস করে দেয় এই আশংকায় গেস্টাপো নামে ইউনিটিকে হত্যা করে ফেলেছে, প্যারিসের লা' ওভর পত্রিকায় প্রকাশিত এক কাহিনীতে বলা হল কিভাবে হিটলারের অপর এক প্রেমিকা অগাষ্ট শারণবাচ নামে এক ঘাতকের দ্বারা দু'দুবার গুলি খেয়েছে ইউনিটি। লে সয়ের নামে অপর একটি ফরাসী পত্রিকায় বের হল, ইউনিটি নাকি আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে নিজের মাথায় গুলি করে বর্তমানে প্যারিসের এক হাসপাতালে শুয়ে রয়েছে।

তাতে আরও বলা হয়েছে যে ইউনিটি নাকি বলেছে যে যেহেতু সে জার্মান নাগরিকত্ব নিতে অস্বীকার করেছে তাই হিটলার তার উপর যৎপরনাস্তি বিরক্ত হয়ে গেছে। সংবাদে প্রকাশ হিটলার নাকি পোয়েরিং-এর সম্মুখেই কোন এক প্রণয় কলহে ক্রুদ্ধ হয়ে স্বয়ং ইউনিটিকে গুলি করেন। পরে অনুতপ্ত হয়ে ওকে ওর স্বদেশ ইংল্যাণ্ডে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। সবই নানা দিককার গুজব।

আসল খবর জানেন ওর পিতা স্বয়ং লর্ড রেডেসডেল। কিন্তু তিনি ঘোষিত ৫০০০ পাউণ্ড এমনকি ২০০০০ পাউণ্ডের পরিবর্তেও নাকি মুখ খুলতে রাজি নন।

পরে অকস্মাৎ আবার হেড লাইন: ইউনিটি দেশে ফিরে আসছে! কিন্তু কবে? কোথায়? একথা সংবাদপত্রে উল্লেখ নেই।

তবে ২রা জানুয়ারী বিকেলে দেখা গেল লর্ড রেডেসডেল গাড়ি করে কেণ্টের অন্তর্গত দক্ষিণ সমুদ্রপোকূলস্থ ফোকেস্টোন নামক এক স্বাস্থ্যকর স্থানে চলে গেলেন। এ স্থানের ঠিক বিপরীত পাড়ে অর্থাৎ ইংলিশ চ্যানেল-এর ওপারে প্রখ্যাত ক্যালে বন্দর! লর্ডের পেছন পেছন গেল দশ গাড়ি ভর্তি রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার। তাদের নিশ্চিত ধারণা যে ইউনিটি চ্যানেল ফেরীতে পার হয়ে এদেশে পদার্পণ করবে। সকালে অবশ্য গুজব ছিল যে প্লেনে এসে শোরহাম এয়ার ফিল্ড-এ অবতরণ করবে।

সন্ধ্যের পর ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারের মধ্যে ভিজে স্যাতসেতে সেই ছোট্ট বন্দরে এসে পৌঁছল সবাই। শত চেষ্টা সত্ত্বেও লর্ডের মুখ থেকে একটি বার্তাও বার করতে পারল না সাংবাদিকরা। তিনি ডিটেকটিভ পরিবৃত হয়ে রয়াল প্যাভিলিয়ান হোটেলে প্রবেশ করলেন।

সেদিন গভীর রাত্রি থেকে ফোকেস্টোন একটি রণক্ষেত্রের আকার ধারণ করল। মিলিটারী, পুলিশ সর্বত্র গিজ গিজ করতে লাগল। শহরের যাবতীয় রাস্তার মুখে বেয়নেটধারী প্রহরী অতন্দ্র রইল। সমুদ্র উপকূলে নৌসেনারা পাহারা দিতে থাকল। ডিটেকটিভগণ ভিড়ের মধ্যে মিশে সতর্ক দৃষ্টি রাখল সর্বত্র। অবাঞ্ছিত কাউকে শহরে ঢুকতে দেওয়া হল না, অনেক সাংবাদিকও প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হল। ব্ল্যাক আউটের আইন ভঙ্গ করে ফ্লাস লাইট জেলে ফটো তুললে চরম শাস্তি হবে এই অর্ডার হল।

রাত ৩'৩০ মিনিটে অন্ধকারে মাথার উপর হেলিকপ্টার একটা উড়ে গেল। তারপর ছুটো স্পিটফায়ার বিমান বৃষ্টিঝরা আকাশ চিরে আনাগোনা করতে লাগালো এ পাশ থেকে ওপাশ। ৩'৪৫-এ একটি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি জানালা

দরজায় পর্দা ঘেরা অবস্থায় সোজা জেঠীতে চলে গেল। পেছনের গেট সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। কিছু বাদেই লর্ড পাশের একটি গেট-এর বাইরে গাড়িটাকে দুজন পুলিশ পাহারায় রেখে সোজা জেঠিতে চলে গেলেন।

রাত ৪,০৫-এ কে যেন বলে উঠল, ঐতো শব্দ শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি ও শোঁ শোঁ হাওয়ার আওয়াজ ছাপিয়ে ডিজেল এঞ্জিনের চাগ-চাগ-চাগ ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। ফেরি ষ্টিমার বন্দরে ঢুকছে। জনতার মধ্য থেকে নানা অশোভন ও ক্রুদ্ধ মন্তব্য শোনা যেতে লাগলো—ঐ আসছে নাৎসী প্রেমিকা কুত্তি। ঐ আসছে হিটলারের···। নববর্ষের উপযুক্ত অভিনন্দনই পাবেন···। সেন্ট্রিরা সহুঙ্কারে জনতাকে হটিয়ে দিতে লাগলো।

ফেরি ষ্টিমার এল, তবে নিষ্প্রদ্বীপ অবস্থায়। ভূতুড়ে ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে একজন যাত্রী এল। সব শেষে এল ইউনিটি, অনেক পরে অবশ্য। ঘণ্টা খানেক বাদে দুজন নাবিক একটি ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে এল ইউনিটিকে, পেছনে ওর মা লেডি রেডসডেল, ওর বোন ডেবোরা এবং জনৈকা নার্স। একেবারে পেছনে চীফ অফ দি ফিল্ড সিকিউরিটি পুলিশ। হোম অফিসের দুজন ভদ্রলোকও এল নেমে যারা তালাবন্ধ কেবিনে থাকা ইউনিটিকে কিছু জেরা করতে গিয়েছিল।

লর্ড জেঠিতে এগিয়ে গিয়ে আগাগোড়া কম্বলে মোড়া কন্যার কপাল চুম্বন করলেন। ভীড়ের মধ্য থেকে কোন এক মহিলা কণ্ঠ ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, খুব সাবধান লর্ড, আজ সকালেই হয়ত মেয়ে হিটলারকে চুম্বন করে এসেছে, দেখবেন কোন ছোঁয়াচে রোগে না আক্রান্ত হোন। চারদিকে হাস্যরোল উত্থিত হল।···

চতুর্দিকে মিলিটারী পাইলট পাহারায় অ্যাম্বুলেন্স ও মোটর বাহিনী লণ্ডনের পথে সেই অন্ধকারেই রওনা হয়ে গেল।

এ ঘটনার সাত বছর আগে ইউনিটির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় সেই প্রখ্যাত পুরুষঙ্গের যে ওর জীবন এবং তদানিন্তন বিশ্ব ইতিহাসই পাল্টে দিয়েছিল। ইউনিটির তখন ১৯ বছর বয়েস। সে মিউনিখে আর্ট শিক্ষা করতে যায়। হিটলারের বয়েস তখন ৪৪ এবং সবে ক্ষমতায় এসেছেন।

‘প্রথম দর্শনেই আমার প্রেম হয়,—হিটলার সম্বন্ধে একটিমাত্র লাইনেই নিজ মনোভাব প্রকাশ করেছিল ইউনিটি। হিটলার তাঁর পুরনো কার্ডহল ও প্রিন্স

শহর মিউনিখে এসেছিল কাজ করতে, সভা-সমিতি করতে। ভীড়ের মাঝখানে উনিশ বছর বয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা সুন্দরী ইউনিটি দাঁড়িয়ে থাকত আর শুনতো তাঁর প্রিয় পুরুষের মধুময় বক্তৃতা। কী ইউনিফর্ম, কী চেহারা, কী বলার ভঙ্গী, জনতাকে মুহূর্তে উত্তেজিত করতে, নাচাতে, রাগাতে, হাসাতে পারতেন অনায়াসে। এ নাকি এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। উঃ এমন একজন লোকের সঙ্গে যদি পরিচয় হত···ভাবতে গিয়ে যৌবনময়ী মেয়ে ইউনিটির সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দিল। লোকটাকে মনে হয় দুর্ভেদ্য—উঃ এ সংসারে ও ছাড়া আর কারুর সঙ্গে আমি পরিচিত হতে চাই না।

—অসওয়াল্ড'কে বল না পরিচয় করিয়ে দিতে, পাশে থাকা এক বান্ধবী বলে ওঠে।

—ঠিক বলেছিস। অসওয়াল্ড আমার বোন ডায়নাকে ভালবাসে।

অসওয়াল্ড হলেন স্যার অসওয়াল্ড মোজলি। ব্রিটিশ ইউনিয়ান অফ ফ্যাসিষ্ট এর কালোকোর্তা পরিহিত নেতা। তিরিশ দশকে ইংল্যাণ্ডে এই ফ্যাসিষ্ট দল বেশ ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল।

এই ফ্যাসিষ্ট নেতা মোজলি ছিল মিটফোর্ড পরিবারের একজন ঘনিষ্ট বন্ধু। পরে ঐ বাড়ির ছয়টি সুন্দরী মেয়ের একটি ডায়নাকে বিয়ে করে। অপর বোন জেসিকা বিবাহ করে চার্চিলের ভাইপোকে। ন্যান্সি মিটফোর্ডের অন্য এক বোন হল উপন্যাস লেখিকা।

অসওয়াল্ড-এর বয়েস তখন ৩৫ বৎসর, সুন্দর সুপুরুষ, পূর্বে ছিল ক্যাভালরি অফিসার। স্কুলে থাকা কালীনই ভক্ত হয়ে পড়ে অসওয়াল্ড-এর। এবং অসওয়াল্ড-এর সঙ্গে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতো। গুরুর উৎসাহে রাজনীতিতে অনুরক্ত হয়ে পড়ল মেয়ে। অপরাপর ইংরেজ অভিজাতরা লোহারুর সন্তান ডিক্টেটর মুসোলিনীকে প্রশংসাই করত। কিন্তু ইউনিটি তাকে দুচোখে দেখতে পারত না। ওর মতে মুসোলিনী একটা হোৎকা অশ্লীল চেহারার মানুষ। কোথায় যেন সুদখোর দৃষ্টি। মাগো!

—তুমি তাহলে কী রকম চাও বলতো? অসওয়াল্ড সহাস্তে শুধোয়।

সতের বছরের কিশোরী বিচিত্র হেসে চোখ নাচিয়ে বললে, আমি যা চাই তা ভালভাবেই জানি। আমি প্রকৃত একজন গ্রেটম্যানের ইজেরিয়া হতে চাই।

অসওয়াল্ড প্রশ্ন করে, কিছু মনে ক'রোনা 'ইজেরিয়া'টা কি?

—এও জানোনা, ইউনিটি সকৌতুকে বলে ওঠে, ইজেরিয়া হল রোমান

জলদেবী, সীমাহীন জ্ঞান ও কৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী এই দেবী প্রতিষ্ঠাতা রমুলাসের উত্তরাধিকারা রাজা নুমাকে মন্ত্রণাদান করতেন। এর অর্থ হল এমন একটি মেয়ে যিনি গ্রেটম্যানকে সলাপরামর্শ ও আনন্দদান করে থাকে। তুমি যদি সুযোগ দাও আমি সে কাজ করতে প্রস্তুত।

১৯৩৩-এ ইউনিটি দেখা পেল তার "প্রকৃত গ্রেটম্যানের"।—কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিল গেস্টাপোর লোকেরা। তারা বিদেশী বিশেষ করে বিদেশিনী সোনালী মেয়েদের প্রতি সন্দিগ্ধ। অসওয়াল্ডের লেখা একটি পরিচয়পত্র ও বার্লিনের অফিসার মহলে গ্রাহ্য হল না। ফুয়েরারকে যারা ঘিরে থাকেন সে বর্ম ভেদ করতে পারল না ইউনিটি প্রথম প্রচেষ্টায়।

১৯৩৪-এ ডায়না এনগেজড হল অসওয়াল্ডের সঙ্গে। দু বোনে মিলিত হল বার্লিন-এ।

ডায়না পরামর্শ দিল বার্লিনে তুই সময় নষ্ট করছিস বৃথা। ফুয়েরারের মিউনিখ শহরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। সেখানেই কাজ হাসিল করব। হিটলারের খুব প্রিয় শহর মিউনিখ। এ শহরকে নিজের বলে ভাবে। ঐসব বীভৎস লোক পরিবৃত ঐ বার্লিন শহরের চেয়ে মিউনিখে ফুয়েরার অনেক সহজ সরল স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।

ডায়না আরও জানায়, অসওয়াল্ড আমায় বলেছে ফুয়েরার মিউনিখে একটি নতুন মিউজিয়াম স্থাপন করবেন, নাম হবে দি হাউস অব জার্মান আর্ট। তিনি সেণ্ট মাইকেল চার্চের কাছে একটি রেস্টুরেণ্টে এসে থাকেন, এবারও সেখানেই যাবেন এবং সেখানেই আমাদের খুব সুবিধে হবে।

অস্টেরিয়া নামে ইতালীয় কফি হাউস ও রেস্টুরেণ্টে মিউনিখের অভিজাত ও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় জমায়েত হয়ে পেন্টিং আর্ট ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। হিটলার নিজেকে একজন "আর্টিষ্ট ও কর্মরত বোহেমিয়ান" ভেবে থাকেন। তিনি ব্যাভেরিয়ায় এলেই এই রেস্টুরেণ্টে একবার না একবার আসেনই। মাঝে মাঝে পুরণো দিনের স্মৃতি ভাল লাগে, হিটলার তার সর্বত্র সহচর অ্যাডজুট্যাণ্ট ব্রুরেথনার এবং শাউব-এর কাছে স্বগতোক্তি করেন। সহচররা জবাবে বলে, কিন্তু ফুয়েরার জার্মানির আপনাকে প্রয়োজন কলাশিল্পের চেয়ে অনেক বেশী। হিটলার ম্লান হেসে বলতেন, নেতা হওয়া মানেই একেবারে নিরালা হয়ে যাওয়া।

১৯৩৪-এ বুঝি হিটলার সত্যি সত্যিই নিরালা নির্জন বোধ করতেন নিজেকে সবচেয়ে বেশী। সে বছরই তার কিশোরী ভগ্নি এবং প্রেমিকা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। অপর একজন অভিনেত্রী প্রেমিকা হিটলারের সঙ্গে প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে অন্য নারী সংক্রান্ত ঘটনায় ঈর্ষাবশত একই প্রক্রিয়ায় জীবন নাশের চেষ্টা করে। এই নিয়ে পত্র-পত্রিকায় স্কাণ্ডেল শুরু হতে গোয়েবলস্ আপ্রাণ চেষ্টা করে সেটাকে চাপা দেন। এবং ফুয়েরারকে সাবধান করে অনুরোধ করেন তিনি যেন নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে কিঞ্চিৎ হুঁশিয়ার হন। আর তিনি যেন অবশ্যই বিবাহসূত্রে কখনই আবদ্ধ না হন।

বিরাট অভিনেতার মত জনতার কাছে তিনি ছিলেন ডার ফুয়েরার ইস্ট ভারহেয়ারেটেট নিচ্‌স্ট অর্থাৎ ফুয়েরার বিবাহিত নন। এটাই ছিল বড় শ্লোগান। এর দ্বারা লোকমানসে এই ভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল যে হিটলারের কাছে যে কোন রমণীর চেয়ে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে হল জন্মভূমি জার্মানী। তিনি নারীর চেয়ে দেশকে ভালবাসেন সমধিক। গোয়েবলস্-এর এই প্ল্যানে হিটলার সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন সেই ১৯৩৪-এর মে মাসে যখন তিনি ইতালীয় রেস্টুরেন্ট অস্টেরিয়ায় তার একমাত্র বন্ধু হেনরিখকে নিয়ে প্রবেশ করলেন সেদিন বুঝি তিনি মত পালটে ফেললেন। এই হফম্যান ছিল হিটলারের একচেটিয়া ফটোগ্রাফার। পেছনে অনুসরণ করে গেল দুজন সাদা পোষাকের অ্যাডজুটাণ্ট যাদের মুখে মিষ্টি হাসি কিন্তু পকেটে চেক পিস্তল। 'সবাই আমরা আর্টিস্ট'—এই ভাব বাখতে গিয়ে হিটলার সেখানে ঢুকে সাধারণ মানুষের মত সহজ সরল হয়ে যান।

একটি এমন কেবিনে গিয়ে বসলেন যেখানে থেকে সোজাসুজি দেখা যায় দুটি বিস্ময়কর যুবতীকে যারা দু' কাপ কফি নিয়ে মাঝখানের হল ঘরে বসে সহাস্যে গল্প-গুজব করছিল। অবশ্যই এরা ইংরেজ অভিজাত তনয়া, হিটলার এও বুঝলেন যে যুবতীদ্বয় ইচ্ছে করেই তাকে না দেখার বা না গ্রাহ্য করার ভাব করছে। খুবই মজা লাগল তাঁর।

ওরা ছাড়া উপস্থিত আর সব শিল্পী, বুদ্ধিজীবি নরনারী যুবকযুবতীরা হিটলারের উপস্থিতিতে ভয়ে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় শংকায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, তাদের কথাবার্তা ফিসফিসানিতে নেমে এল। অথচ ঐ দুটি যুবতী এমন ভাবে হাসি উচ্চগ্রামে চালিয়ে গেল যেন যে কোন একজন সাধারণ শিল্পী এসে প্রবেশ

করেছে মাত্র।

হিটলার কৌতুকে হাসলেন। ব্লুকনার মাথা নিচু করে কান এগিয়ে আনতে হিটলার নিম্নকণ্ঠে বললেন, ফ্রেডারিখ, উঠে গিয়ে ঐ দুই ভদ্রমহিলাকে জিগ্যেস কর যে, ওরা জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারেন কিনা। যদি জানেন তবে ওদের অনুরোধ করবে আমার সঙ্গে এ টেবিলে এসে কফি পান করতে রাজি কিনা।

হিটলারের কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে হফম্যান বলে, তুমি একটি আস্ত শয়তান। এসব করছ ফ্রাউ ওয়াগণার একথা শুনলে কি ভাববে বলতো ?

জার্মানীর প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ উইনিফ্রেড ওয়াগনারের বিধবা পুত্রবধূ হল ফ্রাউ ওয়াগণার হিটলার পছন্দ নারীদের মধ্যে অন্যতমা ছিল। সম্প্রতি তাকে আর ভাল লাগছিল না ফুয়েরারের।

—মহিলাটি আমায় বিয়ে করতে চায়। হিটলার বন্ধুকে সঙ্গোপণে বলেছিল, সে চায় রাইখের প্রথম লেডি হতে। কিন্তু সে জানে না যে জার্মানীতে কেবল একটি মাত্র ব্যাপারই আছে প্রথম হবার।

—গেস্টাপোই আমাকে ফ্রাউ ওয়াগনারের হাত থেকে রক্ষা করবে। হিটলার নিষ্পলক নয়নে ইউনিটির পানে তাকিয়ে থেকে বললেন, বুঝলে দুজনের মধ্যে ছোটটি খুবই লাভলি। আই মিন যে কোন রিস্ক-এর উপযোগী বলো ?

হফনার সাগ্রহে বললে, আমি ওর ফটো তুলবো। ফটোর অসাধারণ দেহবল্লরী রয়েছে মেয়েটির।

—ঠিকই বলেছ হেনরিখ, হিটলার রূপমুগ্ধ নয়নে বলেছেন, নিখুঁত সুন্দরী এই মেয়েটি। ওরা আসছে আমাদের টেবিলে।

ব্লুয়েকনার দুটি যুবতীকে পরিচয় করিয়ে দিল ফুয়েরারের সঙ্গে অত্যন্ত জার্মান কেতাদুরস্ত মধুরতার মাধ্যমে। শেষে বললে, এরা হল জার্মানীর প্রকৃত বান্ধব লর্ড রেডেসডেল-এর কন্যা।

—তোমাদের বাবাকে আমার ধন্যবাদ প্রদান করবে, বলে হিটলার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন, তুমি বুঝি এখানে আর্ট শিখতে এসেছ ?

—আমি এখানে সবকিছু শিক্ষা করতেই এসেছি, হিটলারের পাশে উপবেশন করে ইউনিটি জবাব দেয়।

দু'বোনকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে দুজন অ্যাডজুট্যান্ট পাশের টেবিলে সরে গেছে।

আচমকা ইউনিটি প্রশ্ন করে বসে, এটা কি সত্যি যে আপনি অভিনেত্রী পোলা নেগ্রীকে বিয়ে করতে চলেছেন। লণ্ডনের কাগজে এ ধরণের সংবাদই বেরিয়েছে।

শুনে হফম্যানের আশংকায় দম বন্ধ হয়ে যাবার দাখিল। তরুণীর স্পর্ধা দেখে হতবাক হবার মত অবস্থা হল। কিন্তু হিটলার মৃদু হাসলেন, বললেন,—আচ্ছা? তুমি দেখছি ও ব্যাপারে বেশ কৌতূহলী? হিটলারের কণ্ঠ অস্বাভাবিক কোমলমধুর শোনালো। যে মানুষ কর্কশ চিৎকার ছাড়া কথা বলেন না তার কণ্ঠের এ মাধুর্য বিস্ময়কর, মনে হচ্ছে, মিস্ নেগ্রীকে তুমি আদৌ পছন্দ কর না?

—আমার মতে তিনি আপনার পক্ষে কোন দিক দিয়েই উপযুক্ত নন, বোনের দৃষ্টিতে গোপন সাবধানতার ইঙ্গিত উপেক্ষা করে ইউনিটি বলে যায়, তাছাড়া আমার ধারণা পোলা নেগ্রীর মন বলে কিছুই নেই!

—এতে যদি তোমার মনে শান্তি পাও তবে শুনে রাখো, হিটলার কৌতুক-মাখা স্বরে বললেন, আমার মিস নেগ্রীকে বিয়ে করবার কোন পরিকল্পনা নেই। কোনকালে ছিলও না। আর তুমি বোধকরি আমাদের পার্টির সেই শ্লোগানটি জানো: 'হিটলার বিবাহিত নন'। অবশ্য একথা জানোনা যে ঐ শ্লোগানের শেষাংশে ওরা জুড়ে দিতে চায়: 'হিটলারের একমাত্র কনে হল জার্মানী'।

—আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত বাজে হাস্যকর শ্লোগান, ইউনিটি জবা। দেয়।

—ডঃ গোয়েবল্‌স্ কিন্তু একথা মনে করে না, হিটলার বললেন। শুনে সবাই হেসে উঠল, হিটলার স্বয়ং হাসলেন সমধিক। হফম্যান অনেকদিন বাদে বলেছিল যে প্রপাগাণ্ডা বা যে কোন ব্যাপার নিয়ে ডিক্টেটরের এটাই ছিল প্রথম কৌতুক।

বোন ডায়না এবার নিজের কাজ গুছোবার জন্য অসওয়াল্ড মোজলের বিষয়ে কথা তুললো। যদিও হিটলারের নজর তখন ইউনিটির দিকে তবু খুবই ভদ্রভাবে বললেন, আমি যা জার্মানীর জন্য করেছি, স্যার অসওয়াল্ড ইংল্যাণ্ডের জন্য তাই করবার চেষ্টা করছেন। হিটলার ইংল্যাণ্ডের এই 'ফুয়েরারের' সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন।

এইভাবে কফি শপে মিটফোর্ড হিটলারের পরিচয়ের শুরু। এরপর ঝটিকাবেগে ঘনিষ্ঠতা ঘনিয়ে এল। ইউনিটিকে নাৎসী পার্টির ভেতরকার চক্রে অন্তর্ভুক্ত করা হল অচিরে। দলের মেয়েরা ওকে কেউ ভাল চোখে দেখত না। তবে কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষের মতে তরুণীটি রাজনৈতিক এবং শারীরিক

দুদিক থেকেই নাকি দারুণ ইণ্টারেষ্টিং।

গুরুগম্ভীর মুখভাব ও দেহধারী গোয়েরিং তার বিশাল বাহু নিয়ে ওর চারদিকে ক্রীড়ামুখর হাতির মত নেচে বেড়াতো। ষণ্ডগদান 'জাতি বিশেষজ্ঞ জুলিয়াস ষ্ট্রেইচার ইউনিটির ব্রেণ ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে-প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। সবাই বুঝেছিল এ তরুণী হিটলারের সাম্প্রতিক ঘনিষ্ঠতমা অতএব সবাই প্রশংসার বাইরে শতহস্তের তফাতেই থাকত। সংবাদপত্র উভয়কে 'বন্ধু' নামেই অভিহিত করত। ব্রিটিশ সংবাদপত্ররাও সংযত ছিল। কেননা কে এমন দুঃসাহসী যে লিখবে, লর্ড অমুকের কন্যা হিটলারের মিস্ট্রেস! লর্ড রেডেসডেল নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতে, যেহেতু ফ্যাসিজমের গোঁড়া বন্ধু ছিলেন। তাই তার আশা ছিল যে অচিরে ইউনিটি হিটলারকে বিয়ে করে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে পরম আত্মীয়তার সূত্রপাত করবে। পরে যখন জানা গেল ইউনিটি হিটলারের মিউনিখ-এর বাসস্থানে মাঝে মাঝে বসবাস করে এবং তাঁর বাহুলগ্না হয়ে রাষ্ট্রীয় ভোজ সভায় যোগদান করে—তা সত্যেও কোন কাগজ কোন উচ্যবাচ্য বা সমালোচনা করতে সাহস পেল না।

১৯৩৫-এ হেসেলবার্গ হিল্‌স্‌-এ নাৎসী সম্মেলনে হিটলার গোয়েরিং এবং ষ্ট্রেইচার এর সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইউনিটি বক্তৃতা দেয়। ইউনিটি ছিল সম্মানীয়া অতিথি, গেস্ট অফ অনার। সাংবাদিকরা সংবাদপত্রের বিবরণে লিখেছিল, বড়ই অবিশ্বাস্য দৃশ্য মনে হচ্ছিল একটি ২১ বৎসর বয়স্কা শ্লিম চেহারার তরুণী উল্লসিত দুইলক্ষ জমায়েত নাৎসীদের সামনে অকুতোভয়ে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। বক্তৃতা শেষ হলে দেখা গেল ষ্ট্রেইচার লাফিয়ে উঠে ওকে চুম্বন করল। সভা শেষে ইউনিটির আঙুলের ইঙ্গিতমাত্র ২২০০০ স্কুল ছাত্র হাতে টর্চ জ্বালিয়ে মার্চ পাস্ট করে গেল। ইউনিটির জীবনে অভিযানের সবে শুরু এইভাবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাইনল্যাণ্ড জার্মানী থেকে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৩৬-এ পাঠানসৈন্য যখন পুনরায় রাইনল্যাণ্ড দখল করে সে সময় হিটলারের সঙ্গিনী হয়ে কলোন শহরে গিয়েছিল ইউনিটি। ওখানকার ডম হোটেলে দুজনে উঠেছিল পরে সহসা বার্লিনের জরুরী ডাকে হিটলারকে ফিরে যেতে হয়। সে সময় ইউনিটি একবার ইংল্যাণ্ডে এসে অসওয়াল্ড মোজলে'র তথাকথিত ভিক্টরী সেলিব্রেসানে সেই পরিকল্পিত ৭০০০ হাজার নাৎসী পন্থীর মহান মার্চ লণ্ডনের পুলিশ কমিশনার এবং পাবলিক জনসাধারণের বিরোধিতায় ছত্রখান হয়ে যায়। ইটের আঘাতে ইউনিটিও আহত হয়ে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে জার্মানী চলে যায়।

হিটলার তখন মিউনিখে। ওরা দুজনে বারখটেস প্যালেসের পরম ও মনোরম বিলাসিতায় বেশ কিছুকাল কাটায়। এটা শহর থেকে ৬০ মাইল দূরে ব্যাভেরিয়ান আলপস এর উপর অবস্থিত। শোনা যায় ওরা দুজনে, হিটলার ও তার 'নর্ডিক বিউটি' হাত ধরাধরি করে নির্জন বনপথে ঘুরে বেড়িয়েছে। শরৎকালের সৌন্দর্য আর বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওদের আলোচনা হয়েছে।

বহুকাল পরে জনৈক ব্রিটিশ লেখক একটি মার্কীন পত্রিকার সাক্ষাৎকারে বলেন, এটা ছিল এ যুগের বিরাট প্রণয় কাহিনী। ইউনিটি আকণ্ঠ প্রেমে মজেছিল হিটলারের। এবং ফুয়েরারও আর পাঁচজন চন্দ্রাহত প্রণয়ীর মতই হয়ে গিয়েছিলেন।

ইউনিটির পজিসন ওখানে এত পাকাপোক্ত ছিল যে স্বয়ং হেসে ফিসফিসিয়ে জানাতে গিয়েছিল যে ইউনিটি হল ব্রিটিশ গুপ্তচর মেয়ে, কিন্তু হিটলার তাকে থামিয়ে দেন, তিনি এটাকে জঘন্য মিথ্যা রটনা বলে অভিহিত করেন। ১৯৩৭-এ ইউনিটি জনৈক ব্রিটিশ সাংবাদিককে জানায় যে সে অবিলম্বে জার্মান নাগরিকত্ব নেবে কিনা গভীর ভাবে তা ভাবছে। একথা শোনা মাত্র তাকে ব্রিটিশ কাউন্সিল এমারজেন্সি সার্ভিসের সদস্য পদ থেকে খারিজ করে দেওয়া হয়। ঐ পর্যন্তই। সবার উপরে সে লর্ড রেডসডেল-এর কন্যা অতএব সমস্ত রকম সমালোচনার বাইরে।

হিটলার প্রায় প্রতি সপ্তাহেই মিউনিখ-এ আসতে লাগলেন এবং যথারীতি ওদের দুজনকে দেখা যেতে লাগল যত্রতত্র একই সঙ্গে। অভিনেত্রী পোলা নেগ্রী এবং অপরাপর নারীকুল কোথায় বিলীন হয়ে গেল। ফুয়েরার প্রেমে পড়েছেন এই ব্রিটিশ লেডি। এমন কোন ব্যাপার নেই যা তিনি এই নারীর জন্য না করতে পারেন। অবশ্য কোটিপতির কন্যার কাছে মূল্যবান উপহারাদিরও বিশেষ কোন মূল্য নেই। সুতরাং এই ধনী কন্যার জন্য ফুয়েরার এক বিশেষ সম্মানের ব্যবস্থা করলেন। ওকে নাৎসী পার্টির মেম্বার করে নিলেন। এবং যত্রতত্র প্রকাশ্যে পরিধান করে বেড়াবার মত নিজ স্বাক্ষরকরা একটি স্বস্তিকা ব্যাজ প্রদান করেন। এ সম্মান খুবই সীমিত, একমাত্র ক্যাবিনেট মেম্বারদের পত্নীরা ছাড়া কেউ তা অদ্যাপি পায়নি। অতএব এই স্বাক্ষর করা ব্যাজটিকে প্রায় অফিসিয়াল ওয়েডিং রিং (বিবাহের আংটি) বলেই ধরা চলে।

১৯৩৮-এ ইউনিটি এই ব্যাজটি পরে এল হাইডপার্কে নাৎসী বিরোধী এক

সভার কাছে। দাঙ্গা বেধে গেল সেখানে। জনৈকা মহিলা ইউনিটির মুখে এক গাদা থুথু ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠলো—চলে যাও জার্মানীতে যেটা তোমার স্বদেশ। বিশাল এক পুলিশবাহিনী লাগলো মারমুখী এক জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে। জনতা ওকে 'লিঙ্ক' করতে চেয়েছিল। 'এই জনতা মূক ও উন্মাদ জনতা। এদের আমি ভয় আদৌ পাইনা'—ছড়ে যাওয়া অঙ্গে অষুধ লাগাতে লাগাতে ইউনিটি বলেছিল। ইতিমধ্যে এই মেয়ে লণ্ডন সংবাদপত্র সমূহের অতি প্রিয় মানুষ বনে গেছে। যখনই সে শহরে আসে, লোকেরা খুনী ও সিনেমা অভিনেতৃদের কথা ভুলে যায়। পত্রিকায় পত্রিকায় এই তরুণী হেডলাইন হয়ে ওঠে। একথা ইউনিটি নিজেও জানে।

ইউনিটি যথা সময়ে জার্মানী ফিরে গিয়ে হিটলারের সঙ্গে ভিয়েনায় বিজয় মার্চ করে গেল। উল্লাসিত চীৎকারে গলায় ঘা করে ফেলল। ১৯৩৮-এ চেকোশ্লোভাকিয়ার গোলমালের সময় গুপ্তচর বলে ইউনিটি গ্রেপ্তার হয়ে গেল। গাড়িতে দুটি নাৎসী ফ্ল্যাগ উড়িয়ে, চেক সীমান্তের এক নিষিদ্ধ এলাকা পার হবার চেষ্টা করতে চেকরা ওকে গ্রেপ্তার করে। অনেকের মতে এটা ইউনিটির উস্কানির অপচেষ্টা, হিটলারের বাসনা চেক জয় করা, সে ব্যাপারটাকে এগিয়ে আনবার মানসেই এটা ইউনিটির অপকৌশল মাত্র। অবশ্য চেক কর্তৃপক্ষ অতি ভদ্র ও ভাল ব্যবহার করে ওর সঙ্গে। ওকে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা আটক রাখবার পর ছেড়ে দেয়। ওর সঙ্গে পাওয়া যায় একটি ছোট পিস্তল এবং হিটলারের সই করা পারমিট, অবোধ্য লেখা সহ একটি নোটবুক আর ১৪ মিমির দুটি ক্যামেরা। ক্যামেরা ও ফিল্ম আটক রেখে চেক পুলিশ ওকে ছেড়ে দেয়।

ইউনিটি তৎক্ষণাৎ গাড়ি চালিয়ে প্রেগ-এ ব্রিটিশ কনস্যুলেটে গিয়ে এই নালিশ জানায় যে চেক-রা তাকে বিবস্ত্র করে সার্চ করে, হিটলারের সই করা তার ফটোটাকে দু'টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চেকদের কাছে প্রতিবাদ জানায়।

গাড়ি থেকে নাৎসী নিশান নামিয়ে নিতে বলে একজন কেননা চেক-দের মধ্যে নাৎসী বিরোধী ভাবধারা ভীষণ প্রবল হয়ে উঠেছে। তাতে ইউনিটি বলে আমি মরতে ভয় পাই না। বেশ তো আমি মরব এবং শহীদ হব। শহীদ হলে প্রতিবছর নুরেমবুর্গ কংগ্রেসে যেমন শহীদদের নামের তালিকা পাঠ করা হয় তেমনি আমার নামও পড়া হবে।

মিউনিখে ফিরে এসে হিটলারের সঙ্গে বোধকরি স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মত কি এক মৃদু কলহ হয়। হিটলার একটি ক্যামেরা উপহার হিসেবে পাঠিয়ে শান্তি

প্রস্তাব করে। এইভাবে ইয়োরোপের সর্বাধিক শিরোনামা যুক্ত সংবাদের প্রণয় কাণ্ড চলতে লাগল আপন বেগে।

১৯৩৮-এর অগাস্টে হিটলারের সঙ্গে ব্রেসলু ভ্রমণকালে ইউনিটি প্লুরেসি রোগে আক্রান্ত হয়। হিটলার সাংঘাতিক চিন্তিত হয়ে পড়েন। ওর পিতা-মাতার কাছে টেলিগ্রাম যায়। লর্ড ও লেডি রেডেসভেল ইংল্যাণ্ড থেকে উড়ে গিয়ে কন্যা যতদিন না সুস্থ হয় ততদিন ওখানে বাস করে আসে।

এই অসুখে ইউনিটি পিটপিটে দুর্বল ও নার্ভাস হয়ে ওঠে। ফলে সে হিটলারের সঙ্গে অপর এক নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে কলহ বাধায়। বোধকরি এই নারীই, ইভাব্রাউন। ইউনিটি লর্ড বংশের মেয়ে। হিটলার সাধারণ সামাজিক স্তরের মানুষ। ইভাব্রাউন ওঁরই স্তরের মেয়ে। অতএব জার্মানীর ডিক্টেটর হলেও ইভা হিটলারের সামাজিক দিক থেকে অনেক কাছের মানুষ। কলহ চলতে লাগল। হিটলার বহু মাস আর মিউনিখ এলেন না। কিন্তু কমলি ছাড়ে না। ইংল্যাণ্ড থেকে ঘুরে ফের ঝগড়া, ঝগড়া আর ঝগড়া। কথিত আছে হিটলার ইউনিটির এই পাগলামীর জন্য প্রাতেই পুরোপুরি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

১৯৩৯···হিটলারের মনে তখন অন্য এক গুরুতর চিন্তা, গুরুতর কার্যক্রম, নিদারুণ পরিকল্পনা।···১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর, জার্মান পোলাণ্ড আক্রমণ করল। আগের দিন হিটলারের সঙ্গে ছিল ইউনিটি এবং ওদের মধ্যে দীর্ঘ ও গুরুতর আলাপ আলোচনা হয়।

মিত্রপক্ষ জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। জার্মানীর সমস্ত ইংরেজ নাগরিকদের নির্দেশ দেওয়া হল মার্কীন কনস্যুলেটের কাছে যেতে। তারা ব্রিটিশ স্বার্থ দেখবে বলে স্বীকৃত হয়েছে। ইউনিটি এ নির্দেশ মানলো না।

এরপর ওর খবর পাওয়া গেল ১৯৩৯-এর অক্টোবরে। শোনা গেল ইউনিটি মিউনিখের একটি হাসপাতালে মৃত্যুপথযাত্রীনি অবস্থায় শয্যাগত রয়েছে। ৩০শে অক্টোবর সরকারী নাৎসী সংবাদ সার্ভিস জানালো ইউনিটি পরিপূর্ণ সুস্থ আছে এবং জার্মানীতে বসবাস করতেই ইচ্ছুক। এরপর সঠিকভাবে আর কিছুই জানা যায়নি ১৯৪০-এর ৩রা জানুয়ারী ফোকষ্টোন বন্দরে ফেরিঘাটে আসার পূর্ব পর্যন্ত···

ফোকষ্টোন ছেড়ে অ্যাম্বুলেন্স এগিয়ে চললো। পেছনে পেছনে গেল দশ গাড়ি ভর্তি সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারের দল। তাদের মুস্কিল হয়েছে যে তারা না এক ফোঁটা সংবাদ না এক চিলতে ফটো কিছুই করতে সক্ষম হয়নি!

যদি ফোকষ্টোন এবং রেডেসডেলের বাড়ি হাইউইকম্ব এই ছাব্বিশ মাইল পথের মধ্যে কোন অঘটন না ঘটে তবে তাদের পরিপূর্ণ বিফল হয়ে লণ্ডনে দিয়ে যেতে হবে।

তারপরেই অ্যাম্বুলেন্সের একটি স্প্রিং ভাঙলো আর লর্ডের গাড়ির একটি টায়ার ফাঁসলো। কী সৌভাগ্য, মনে মনে ভাবল সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররা। দশ মাইল এসেই এই দুর্ঘটনা। অনেকের মতে এটা নাশকতামূলক কাজ কিন্তু কেউই এবিষয়ে খুব নিশ্চিন্ত নয়।

যখন অ্যাম্বুলেন্সটি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফের ফোকস্টোনে ফিরে এল, তখন সাংবাদিকরা রয়েল প্যাভিলিয়ন হোটেলের সদর দরজায় অপেক্ষারত অবস্থায় দাঁড়িয়ে।

লাল কার্পেট শ্লিপার পায়ে, গায়ে ঢিলে টুইডের কোট পরে ইউনিটি অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে অজস্র ফ্লাশবালভ জ্বলে উঠল ফটোগ্রাফারদের। দুর্বল হাসি সহ ইউনিটি তার পুরাতন বন্ধু সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে কি যেন বললে। শোনা গেল অনেকটা 'ফানি—ফানি' (হাস্যকর) গোছের। এক হাতে ওর রয়েছে শুকনো এক গুচ্ছ লাল গোলাপ, বোধকরি হিটলারের শেষ উপহার। গলায় সিল্কের স্কার্ফটা ভালভাবে জড়ানো, অবশ্য তার তলায় একটা ব্যাণ্ডেজ দেখা যাচ্ছে। এতে মনে হয় যে 'গুলি করা' সংক্রান্ত কাহিনীটি মিথ্যা নয়।

—কোনকিছু বাণী দেবেন কি মিস্ মিটফোর্ড? একজন সাংবাদিক এগিয়ে এসে বলে ওঠে। লর্ডের পালোয়ান শোফার তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দেয় বলে, এই ব্ল্যাক গার্ড—ওঁকে বিরক্ত করো না।

লর্ড রেডেসডেল উচ্চস্বরে বলে ওঠেন, আমার শুরু এইটুকুই বলবার যে আমার প্রিয়তমা কন্যা বেচারা কিছুই জানে না। ইংল্যাণ্ড যে যুদ্ধে নেমে পড়েছে এ সংবাদও ওর অজ্ঞাত। জার্মানীতে আমার কন্যা যা কিছু করেছে তার জন্য আমি বিন্দুমাত্র লজ্জিত নই।

—হিটলার সম্বন্ধে আপনার বর্তমান ধারণা কি? একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করে।

—আমার আর কিছু বলবার নেই, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে লর্ড বলে ওঠেন, আমার আদরিনী কন্যা আজ অসুস্থ। এখন আমার একমাত্র চিন্তা ওকে নিয়েই।

পরদিন ওরা চলে গেলেন। ইউনিটি কিছু সময়ের জন্য পর্দার অন্তরালে চলে গেল। কিন্তু ওকে নিয়ে দেশে হুলুস্থুল পড়ে গেল। হাউস অফ কমন্সে

র্বর ঝড় বইল। কেন দেশের অর্থ, সৈন্য, প্লেন ব্যবহার করা হচ্ছে দেশের কথিত এক শত্রুর জন্যে? কেন তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে এত ঢাক ঢে বাজিয়ে। এই জার্মানীকে বিচারের কাঠ গড়ায় তোলা হবে কিনা? তবে তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী স্যার নেভিল চেম্বারলেন স্বভাবসিদ্ধ মত বলেছিলেন, এর বিরুদ্ধে নাকি বাস্তবসম্মত কোন চার্জই নেই।

ওয়ার্ড প্রাইস নামে জনৈক লেখক বলেন যে গেষ্টাপো ওকে গুলি করেনি। বরঠিক তার উলটো। গেষ্টাপোর চরেরা হিটলারের আদেশে ওর নিরাপত্তার জন্য পেছন পেছন সংগোপনে অনুসরণ করে যাচ্ছিল তারাই ওকে সুইসাইড থেকে রক্ষা করে বাঁচায়' ইউনিটি নাকি মিউনিখের একটি পার্ক ইংলিশার গার্ডেন-এ গাড়ি চালিয়ে গিয়ে সব সময় সঙ্গে থাকা ছোট পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে কিন্তু গেষ্টাপোর এজেন্টরাই ওকে তদবস্থা থেকে প্রাণে বাঁচায়।

হাউস অফ লর্ডস-এ ইউনিটিকে নির্দেশ বলে রায় দেয়। তাদের মতে অভিজাত পরিবারের কেউ কখনো অন্যায় করতে পারে না।

ইতিমধ্যে ইউনিটিকে র‍্যাডক্লিফ ইনফারমারিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। নিউ ইয়র্কটাইমস্-এ খবর বের হল, ওর মাথায় দুটি বুলেট বিদ্ধ হয়েছে এবং স্মৃতিশক্তিহীনতায় ভুগছে। প্রচুর ডিটেকটিভ ওকে হাসপাতালে ঘিরে রেখেছে। একজন বড় ডাক্তার বলেছেন জার্মানীতে ইউনিটিকে খুবই ভালভাবে চিকিৎসা করা হয়েছে। দ্রুত আরোগ্য লাভ করছে তরুণী।

এই বিবৃতিতে আত্মহত্যার গুজবটি নস্যাৎ হয়ে গেল। কেন না নিজের মাথায় দুবার গুলি করা সম্ভব নয় আত্মহত্যাকারীর পক্ষে। ১৯৪০-এর ৩রা ফেব্রুয়ারী সে হাসপাতাল ত্যাগ করে। এরপর বহু মাস ওর কোন সংবাদ নেই। কেউ বলে ওকে পশ্চিম স্কটল্যাণ্ডের কোন দ্বীপে রাখা হয়েছে। কেউ বলে তা নয় একজন সন্দেহ ভাজন ফিফথ কলমিষ্টকে মিলিটারী নিষিদ্ধ এলাকায় রাখা হয়নি, ওকে ডিটেকটিভ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমন্বিত দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডেই রাখা হয়েছে। ১৯৪০-এর ৫ই অক্টোবর আকাশ থেকে একটি বোমা পড়ে অক্সফোর্ড শায়ারের যে গ্রামে ইউনিটি বাস করত সেখানকার ওর কুটির চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল। ও অবশ্য অক্ষতই রইল। সবাই অবাক হল জার্মানরা তো অত ভেতরের এক গুরুত্বহীন গ্রামে কখনো বোমা ফেলে না। নতুন গুজব ছড়ালো যে জার্মানরা 'ইউনিটি'কে শেষ করে ওর মুখ বন্ধ করে দিতে চায়। সাধারণ মানুষ দাবী করল যে এখনো ইউনিটি কিছু স্বীকারোক্তি করুক। কিন্তু ইউনিটি-

একেবারেই মুখ খুললো না।

১৯৪১-এ বোনের বিয়েতে সে লণ্ডনে এক চার্চে আসে। এককালে যে পাবলিক এত পছন্দ করত সে কিনা স্কার্ফে মুখ ঢেকে ফটোগ্রাফারদের ফাঁকি দিল।

যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সিকিউরিটি পুলিশ পাহারায় ওকে জীবন কাটাতে হয়েছে। ১৯৪৮-এর ২৯শে মে অকস্মাৎ পত্রিকায় শিরোনামা 'ইউনিটি' মারা গেছে, স্কটল্যাণ্ডের ওবান নামক স্থানে। মেনিনজাইটিস রোগে নাকি মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য অনেকে এ কথায় সন্তুষ্ট নয়, বরং সন্দিহান।

প্রখ্যাত মেয়ে ইউনিটি, হিটলার প্রেমিকা ইউনিটি। সারা ইংল্যাণ্ডকে বেশ কিছুকাল কাঁপিয়ে, মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে, ভরন্ত যৌবনে এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেল।

বহুকাল ব্রিটিশ জাতি এর কথা মনে রাখবে।

—